বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্. এ., বি. এল্.

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা
১৩৪৬

প্রকাশক :
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
অভার্ণ বুক এজেন্সী
১০নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন
সখা প্রেস
৩৪নং মুসলমানপাড়া লেন
কলিকাতা

ভূমিক

এই গ্রন্থখানির একটু ইতিহাস আছে। এখন হইতে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক নিয়োজিত একটি কমিটি বাঙ্গালা বাণান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব-সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেই সব প্রস্তাবাবলী লইয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে বেশ একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঘটনাচক্রে এই আন্দোলনের সহিত আমি জড়িত হইয়া পড়ি; এবং বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে এবং তারপর সাধারণভাবে বাঙ্গালা বাণান, ধ্বনিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও আমি কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখি ও বক্তৃতাদি দিই। অতঃপর বাঙ্গালা বাণান ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার সুদীর্ঘ পত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই পত্রালোচনা বঙ্গভাষানুরাগী বহু সুধী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং তাহার ফলে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই পত্রালোচনায় যোগদান করিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন। এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গালা-বাণান-ঘটিত এই আন্দোলনে সাময়িক পত্রাদিতেও কিছু কিছু অভিমত ব্যক্ত হয়।

এই গ্রন্থখানিতে আমার সেই সমস্ত লেখা ও বক্তৃতা, এবং পত্রালোচনারও অধিকাংশ প্রকাশিত হইল *। তাছাড়া, পরিশিষ্টে পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণান-কমিটির পুস্তিকার বিবিধ সংস্করণের প্রস্তাবাবলীর কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, এবং তৎকালীন আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র দিবার অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধ, বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মিলিত প্রতিবাদ, এবং সাময়িক পত্রাদির কিছু কিছু মতামত সন্নিবেশিত হইল।

স্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই যে যদিও কতকটা ঘটনা-ক্রমেই এই বাণান-বিষয়ক আন্দোলনের ভিতরে আমার আসিয়া পড়িতে হইয়াছিল, তথাপি এই আন্দোলন আমাকে যথেষ্ট আনন্দ ও অভিজ্ঞতা দান করিয়াছে। বিশেষতঃ আনন্দিত হইয়াছি এই কারণে যে বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধি ও ঐতিহ্য রক্ষার্থ আমার যে সামান্য প্রচেষ্টা তাহাতে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালার বাহিরেরও নানা স্থান হইতে এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের নানা স্তর হইতে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে সমর্থন ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এত লোক যে এবিষয়ে চিন্তা করেন এবং বেশ গভীর ভাবেই চিন্তা করেন, তাহা জানিতে পারিয়া সত্য সত্যই বিস্মিত হইয়াছি—ইহা আমি পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই। বস্তুতঃ এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হইতে আমার সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে আমাদের দেশের জনচিত্তকে যতটা অসাড় ও নিঃস্পন্দ সচরাচর মনে করা হয় বাস্তবিক পক্ষে ততটা নহে—আঘাত ও বেদনা মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিলে অতি আশ্চর্য্য রকম সাড়াই পাওয়া যায়। আমার সন্তোষের আর একটা কারণ এই যে এই আন্দোলন বহুলপরিমাণে

* শুধু রাচি বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণটি সম্পূর্ণভাবে এই গ্রন্থে দেওয়া হয় নাই; যতটুকু বাঙ্গালাভাষা-বিষয়ক ততটুকু মাত্র দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র অভিভাষণটি মৎপ্রণীত "তরুণিমা" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুফলপ্রসূ হইয়াছে ; কারণ ইহার ফলে কতকগুলি বিকৃত ও অশুদ্ধ বাণান "স্রোতের জোরে" ভাষায় চালাইবার যে সঙ্কল্প কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন মহলে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যত চিঠিপত্র এবিষয়ে আমি পাইয়াছিলাম, তাহার সবগুলি কিংবা সেই সব চিঠির সমস্ত অংশ অনাবশ্যক বোধে এই গ্রন্থে দেওয়া হয় নাই। যাঁহাদিগের সহিত পত্রালোচনা এই গ্রন্থ মধ্যে দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদিগের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় বোধ করি দেওয়া উচিত—যদিও অনেকেই সুপরিচিত। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৌহাটি কটন কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, এবং বাঙ্গালা ভাষাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির যশস্বী লেখক। রায় বাহাদুর ৺যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক— "উড়িষ্যার চিত্র" ও "ধ্রুবতারা"-র রচয়িতা। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক। পণ্ডিত ৺কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ভট্টপল্লীর প্রথিতনামা পণ্ডিত। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বহুভাষাবিদ্, শিক্ষক ও সুপণ্ডিত, এবং "বাঙ্গালা বাগ্‌ধারা" গ্রন্থের রচয়িতা। আর ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা মহাশয় খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক। ইঁহাদিগের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম" প্রবন্ধটি প্রকাশ করিতে সানন্দে অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাছাড়া, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "বাঙ্গালা বাণান" শীর্ষক প্রবন্ধটি "প্রবাসী"-তে, বাণান-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত পত্রালোচনা "মাসিক বসুমতী"-তে, এবং আমার একখানি পত্র "শনিবারের চিঠি"-তে প্রকাশিত হইয়াছিল ; এই নিমিত্ত উক্ত তিনটি পত্রিকার সম্পাদকগণ আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র। আর সর্ব্বোপরি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন স্বয়ং

কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁহার বৃদ্ধ বয়স, ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং স্বল্প অবসর সত্ত্বেও আমার ন্যায় অপরিচিত লেখকের সহিত বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে সাতিশয় বাধিত ও সম্মানিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এবংবিধ পত্রালোচনা দ্বারা রবিবাবু আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে মহাকবি ভার্জ্জিলের—Ænéae magnae dextra—এই বিখ্যাত বাক্যটিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

মাতৃভাষানুরাগী দেশবাসিগণের হস্তে এই গ্রন্থখানি সমর্পণ করিলাম। ভরসা করি ইহা তাঁহাদের উপভোগ্য হইবে। ইতি

১লা শ্রাবণ, ১৩৪৬
কলিকাতা

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(যে কয়েকটি মুদ্রাকর-প্রমাদ এই গ্রন্থখানিতে লক্ষিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে একটি শুদ্ধিপত্র গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হইল। পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।)

সূচীপত্র

বাঙ্গালা বানান

বাঙ্গালা বাণান

মুখবন্ধ

আজকাল বাঙ্গালা ভাষার শব্দের নিয়ন্ত্রণ বা সংস্কার সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত বাণান সম্বন্ধে কিংবা তাহার সংস্কার সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই গোটা কয়েক মোটা কথা মনে রাখা দরকার। সকল ভাষার বাণান সম্বন্ধেই সেই কথাগুলি খাটে।

প্রত্যেক ভাষারই শব্দাবলীর বর্ত্তমান রূপের একটা ইতিহাস আছে। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে সেই ইতিহাস জানা অতি প্রয়োজনীয়। নানা প্রভাবের ভিতর দিয়া, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এক একটি শব্দ তাহার বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। হয়ত মূলতঃ প্রাচীন ভাষার একই প্রকার শব্দ হইতে বিভিন্ন প্রকার বাণানের শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; আবার হয়ত মূলতঃ বিভিন্ন শব্দ হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একই রকম বর্ত্তমান রূপের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞানের ইহা অতি

সুপরিচিত তথ্য। কিন্তু যে ভাবেই শব্দের বর্ত্তমান রূপ আসিয়া থাকুক না কেন, সেটা শুধু শাব্দিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসের কথা। যে রকমই হউক না কেন, যদি কোন শব্দের বর্ত্তমান রূপ সুস্থির ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়া থাকে, তবে তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে।

অবশ্য, এমন হইতে পারে যে এখন পর্য্যন্ত কোন কোন শব্দের রূপের বা বাণানের ঠিক স্থিরতা (stability) দাঁড়ায় নাই, কোন প্রয়োগই একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত (settled) হয় নাই, নানা জনে নানা প্রকার লেখেন, ঠিক শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া কোনটাকেই জোর করিয়া ধরা যায় না। বাঙ্গালা ভাষাতে এই প্রকারের অনেক অ-সংস্কৃত শব্দ আছে ; যথা : জিনিষ, জিনিস ; সাদা, শাদা ; সহর, শহর ; ইত্যাদি। এই সব অনিশ্চিতরূপ শব্দের রূপ সম্বন্ধে একটা কিছু নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করা সুফলপ্রদ। তবে এসম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে সব ভাষাতেই অল্পবিস্তর এই প্রকার রূপান্তর-বিশিষ্ট শব্দ থাকে ; সংস্কৃতেও ইহার অভাব নাই ; যেমন, শ্রেণী, শ্রেণি ; অবনী, অবনি ; কেশরী, কেসরী ; বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ ; ইত্যাদি। তাহাতে বিশেষ যে কোন অসুবিধা বা বিশৃঙ্খলা ঘটে এমন নহে।

কিন্তু প্রথম কথা মনে রাখিতে হইবে এই যে, যে সমস্ত শব্দের রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং এইরূপ শব্দের সংখ্যাই বেশী, তাহাদের রূপের বা বাণানের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চেষ্টা করা—তাহা যে কারণেই হউক, সরলতা-সম্পাদনের খাতিরেই হউক, অথবা ব্যুৎপত্তিগত বা ব্যাকরণগত বিশুদ্ধির খাতিরেই হউক—একেবারেই নিরর্থক ; শুধু নিরর্থক নহে পরন্তু বহুল-পরিমাণে অনিষ্টকর। কারণ এইরূপ চেষ্টায় শেষে দাঁড়ায় এই যে সুনির্দ্দিষ্ট সুপ্রচলিত বাণানের স্থলে আবার নানা প্রকার বাণান চলিতে আরম্ভ করে। ভাষাকে সুনির্দ্দিষ্ট ও সংরক্ষিত করিবার দিক্ হইতে দেখিলে ইহা অকল্যাণ-কর। সরলতা বা বিশুদ্ধি অপেক্ষা একরূপত্ব (uniformity) ভাষায় বেশী আবশ্যক। ভাষার রূপকে সুস্থির (stabilize) করিবার মূল মন্ত্রই

এই যে, সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ বা বাণানকে মানিয়া লইতে হইবে, ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; যদি ব্যাকরণ-দুষ্টও হয় তবে ইহাকে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। যেমন, উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, বাঙ্গালাতে সৃজন, সততা, সক্ষম, জাগ্রত, পাশ্চাত্য, একত্রিত, ভুজঙ্গিনী, প্রভৃতি শব্দ। সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন ব্যাকরণের নিগড়ে আবদ্ধ ভাষাতেও নিপাতনের অভাব নাই। ভাষার রূপ সম্বন্ধে বহুল-প্রয়োগ (usage) এবং প্রাচীনতা (antiquity)-ই বড় এবং সেরা প্রমাণ। বাণান সম্বন্ধে এইটাই প্রধান কথা।

দ্বিতীয় কথা, ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে। মোটের উপর একথা ঠিক যে ভাষার রূপের ও ধ্বনির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত। সব ভাষাতেই মোটামুটি একরকম সামঞ্জস্য আছে; নহিলে লোকে লিখিত ভাষা বুঝিতেই পারিত না। কিন্তু যে সব ভাষায় বর্ণমালা অপ্রচুর, যেমন রোমক-বর্ণমালাবলম্বী ভাষা সকল, তাহাদিগকে একই রূপের দ্বারা বিভিন্ন ধ্বনি প্রকাশ করিতে হয়, আবার হয়ত বিভিন্ন রূপের দ্বারা একই ধ্বনি প্রকাশ করা হয়; কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃত বর্ণমালা আদ্যোপান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধ্বনিতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত হওয়ায়, এবং সংস্কৃতে একটি ধ্বনির মাত্র একটি রূপ এবং একটি রূপের মাত্র একটি ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, এবং বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত-বর্ণমালাবলম্বী হওয়ায়, বাঙ্গালা ভাষাতে ধ্বনিতত্ত্বঘটিত অসামঞ্জস্য খুব বেশী নাই। অন্ততঃ ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, প্রভৃতি রোমক-বর্ণমালা-বলম্বী ভাষার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিলেই হয়। সংস্কৃত বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণের ধ্বনি বাঙ্গালাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বাঙ্গালা বাণানে যাকিছু গোলমাল হয়; যেমন, স্বরবর্ণে (ই, ঈ), (উ, ঊ), ব্যঞ্জন বর্ণে (জ, য), (ণ, ন), (বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব), (শ, ষ, স), ইহাদিগের উচ্চারণ প্রায় একই প্রকার হইয়া গিয়াছে; স্বরবর্ণ ঋ, ৠ, ঌ, ব্যঞ্জনবর্ণ রি, রী, লি-তে পরিণত হইয়াছে; যুক্তবর্ণ ক্ষ (ক্+ষ) কখ-এর সমতুল্য

হইয়াছে ; ইত্যাদি। কিন্তু সে গোলমাল এমন কিছু গুরুতর নহে যে তজ্জন্য সমস্ত বাঙ্গালা শব্দের প্রচলিত রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া বিশুদ্ধ ধ্বনিতত্ত্বের অনুযায়ী করিয়া গড়িতে হইবে।

তাছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে, কোন জীবন্ত ভাষা, যাহার উচ্চারণ-রীতি দেশে ও কালে সতত্ই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকে কোনও উচ্চারণ-মূলক (phonetic) কাঠামতেই বাঁধিয়া রাখা যায় না। এত বিশুদ্ধ-উচ্চারণমূলক যে সংস্কৃত ভাষা তাহাকেই রাখা যায় নাই, এবং সেই phonetic নিগড় ভাঙ্গিয়াই যত প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং বর্ত্তমান ভারতীয় ভাষার উৎপত্তি। অতএব phonetic আকারে বাঙ্গালা ভাষাকে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

প্রধান যে দুইটি কথা তাহা বলিলাম ; এখন বাঙ্গালা ভাষার বাণান সম্বন্ধে ছোট ছোট কয়েকটি কথা বলিয়া মুখবন্ধের বক্তব্য শেষ করিব।

বাঙ্গালাতে সাধু ভাষা ও কথ্য (বা চল্‌তি বা মৌখিক) ভাষা, দুই প্রকারের ভাষাই প্রচলিত আছে। সাধু ভাষার কাঠাম মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত। কথ্য ভাষা এই কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্যে কিছু বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। স্বভাবতঃই কথ্য ভাষার রূপ অনেকটা অনিশ্চিত অর্থাৎ বহুরূপ। বিভিন্ন জিলার, যথা ঢাকা, বরিশাল, যশোহর, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নদীয়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, ইত্যাদির কথ্য ভাষার মধ্যে শব্দগত (dialectical) পার্থক্য ও ধ্বনি-পার্থক্য ত গুরুতর! ইহাদিগের কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, তথাপি রাজধানী কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কথ্য ভাষাও ঠিক একরূপ (uniform) নহে—বিশেষতঃ ক্রিয়াবিভক্তিগুলি সম্বন্ধে। যেমন, সাধু ভাষার "বলিলাম" শব্দের অনেক রূপ প্রচলিত, বল্লাম, বল্লুম, বল্লেম, ইত্যাদি। এই সমস্ত রূপের মধ্যে যদি কোন একটি রূপকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়—অন্ততঃ লিখিবার সময়ে—তাহা হইলে কতকটা বিশৃঙ্খলা দূর হইতে পারে এবং কিছু উপকার সাধিত হইতে পারে। অন্যান্য জিলার ভাষা

সাহিত্যে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না ; নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের মুখে দুই-এক সময়ে হয় মাত্র, যেমন সংস্কৃত নাটকে নানা জাতীয় প্রাকৃতের ব্যবহার হয় ; তাই সে বিষয়ে কিছু করিবার তেমন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং আমার মনে হয় বাঙ্গালা বাণান-সংস্কার আজকাল সাহিত্যে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার রূপবাহুল্য নিয়ন্ত্রণের দিকেই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালাতে সব "য" "জ"তে, সব "ণ" "ন"তে পরিণত করা উচিত, ইত্যাদি—অন্ততঃ যে সব শব্দ খাঁটি (অর্থাৎ তৎসম) সংস্কৃত নহে তাহাতে করা উচিত—এবং তৎসমর্থনে প্রাকৃত, পালি, প্রভৃতির নজীর দেখান। সে সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য প্রথমেই আমি বলিয়াছি। যে শব্দের বাণান সু-প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিবর্ত্তন অবিধেয়, তা ভাষাতত্ত্বের খাতিরেই হউক অথবা ইতিহাসের খাতিরেই হউক। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষাতত্ত্বের পথ খুব সহজ পথ নহে পরন্তু বিষম গহন পথ ; ঐ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, "য" স্থানে "জ" লেখা সম্বন্ধে। কেহ কেহ ইহার সপক্ষে প্রাকৃত প্রয়োগ উল্লেখ করেন ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সব প্রাকৃতে এবিষয়ে একবিধ প্রয়োগ নহে। শৌরসেনী মাহারাষ্ট্রী পৈশাচী প্রাকৃতে "য" স্থানে "জ" হয় বটে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে "জ" স্থানে "য" হয় ; যেমন, "জায়া" স্থানে "যাআ", "জায়তে" স্থানে "যাঅদে" ["জো যঃ" বররুচি "প্রাকৃত-প্রকাশ" ১১।৪] ; এবং এই মাগধী প্রাকৃতের সহিতই বাঙ্গালা ভাষার নিকটতম সম্পর্ক। পরন্তু এই সব সংস্কারকগণ যখন আবার "ণ" বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বত্র "ন" আমদানী করিতে বলেন, তখন তাঁহারা প্রাকৃত ভুলিয়া যান ; ভুলিয়া যান যে এক পৈশাচী প্রাকৃত ভিন্ন সমস্ত প্রাকৃতেই একমাত্র "ণ" ই প্রচলিত, "ন" নাই ["নো ণঃ সর্ব্বত্র" প্রা.-প্র. ২।৪২]। তখন তাঁহাদের প্রাকৃত-নিষ্ঠা থাকে কোথায় ? এক এক স্থানে এক এক রকম যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী প্রচলিত বাঙ্গালা বাণান পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা একান্ত অযৌক্তিক ও অশ্রদ্ধেয়।

তাছাড়া, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে বাঙ্গালা শব্দের বিভক্তিগুলি সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতির মধ্য দিয়া নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে সত্য, এবং তাছাড়া নানা বিদেশী শব্দ ও অসংস্কৃত খাঁটি দেশজ শব্দ বাঙ্গালাতে আছে সত্য, কিন্তু সাধু বাঙ্গালা ভাষার যাহা শব্দ-ভাণ্ডার (vocabulary), তাহার খুব বেশী অংশই একেবারে সংস্কৃত হইতে আহৃত ; সেই সব শব্দের প্রাকৃত রূপ হইতে বাঙ্গালায় লওয়া হয় নাই। আবার অনেক একার্থক ও সদৃশ শব্দ আছে, যাহাদের একটি একেবারেই সংস্কৃত, অপরটি মূলতঃ সংস্কৃত হইলেও নানা অপভ্রংশের মধ্য দিয়া আসিয়াছে ; যেমন, পক্ষী, পাখী ; হস্তী, হাতী ; হস্ত, হাত ; ঘোটক, ঘোড়া ; ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার যে খুব বেশী পরিমাণেই সংস্কৃতবহুল এবং প্রাকৃত শব্দের রূপের সহিত বাঙ্গালা শব্দের রূপের যোগ যে অতি অকিঞ্চিৎকর তাহা যে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী একটি সংস্কৃত রচনা ও তাহার প্রাকৃত পাঠ পাশাপাশি রাখিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালাতে "আর্য্যপুত্র"ই চলে "অজ্জউত্ত" চলে না, "শকুন্তলা"ই চলে "সউন্দলা" চলে না, "শেফালিকা"ই চলে "সেভালিআ" চলে না, "তিষ্ঠ"ই চলে "চিঠ্‌ঠ" চলে না।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা—সাহিত্যের বাঙ্গালা ভাষা—প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক বলিয়াই দেখা যায় যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক সংস্কৃত নহে অথচ সংস্কৃত-মূলক (অর্থাৎ তদ্ভব) শব্দের প্রচলিত বাণানও যথাসম্ভব সংস্কৃতানুযায়ী ; অর্থাৎ সংস্কৃতের মূল শব্দে যেখানে যে "ন", যে "স", যে "ত্র", যে "ই"-কার, যে "উ"-কার আছে, বাঙ্গালাতে প্রচলিত শব্দের রূপও তদনুরূপ ; এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কারণ উচ্চারণের বৈষম্য ঘটিয়া থাকিলেও রূপসাদৃশ্য থাকাতে শব্দের ব্যুৎপত্তি সহজেই প্রতীত হয়। তাছাড়া, এই একই কারণে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক বিধি, যেমন স্ত্রীলিঙ্গ-বিধি, ষত্বণত্ব-বিধি, বাঙ্গালাতেও বহুল পরিমাণে অবলম্বিত হয়। তদ্ভব বাঙ্গালা

শব্দের গঠনে এই যে প্রচলিত রীতি এতদনুসারেই "কর্ণ" হইতে "কাণ", "স্বর্ণ" হইতে "সোণা" ইত্যাদি, স্ত্রীলিঙ্গাত্মক ঈ-প্রত্যয় প্রয়োগে "মামা" হইতে "মামী", "কাকা" হইতে "কাকী" ইত্যাদি, ণত্ববিধি প্রয়োগে "রাণী" ইত্যাদি শব্দের বাণান প্রচলিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যাইতে পারে। যে স্থলে বাঙ্গালাতে একই ধ্বনিবিশিষ্ট দুইটি শব্দ চলিত আছে, সে স্থলে একটির সংস্কৃত মূল শব্দ যদি "ণ" সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্ভব শব্দকে "ণ" দিয়া লিখিলে বুঝিবার গোলমাল অনেকটা দূর হয়—শব্দের পার্থক্য বুঝাইবার এই রীতি ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, "পর্ণ" শব্দজ "পাণ", "বর্ণন" শব্দজ "বাণান" মূর্দ্ধন্য ণ দিয়া লিখিলে "পা" ধাতুজ "পান" ও তৈয়ারী করা অর্থে "বানান" হইতে ইহাদের তফাৎ সহজেই ধরা পড়ে। সে যাহাই হউক বাঙ্গালা শব্দের গঠনে সংস্কৃত মূলের সাদৃশ্য যতটা রক্ষিত হয় ততই ভাল; এবং কার্য্যতঃ প্রচলিত সাধুভাষার বাঙ্গালাতে তাহাই মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে।

আর এক কথা লিপ্যন্তর (transliteration) বা অন্য ভাষার শব্দ বাঙ্গালাতে লেখা সম্বন্ধে। এই বিষয়ে প্রধান কথা এই যে এক ভাষার ধ্বনি অন্য ভাষার রূপের সাহায্যে যথাসম্ভব প্রকাশিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে; কারণ কোন ভাষার যাবতীয় ধ্বনি এবং ধ্বনিবিকার অপর ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হইতে পারে না। যেমন, ইংরাজীতে প্রকৃত দন্ত্যবর্ণ নাই—প্রকৃত দন্ত্য উচ্চারণ পাইতে হইলে ইউরোপ মহাদেশ (continent)-এর ভাষা অর্থাৎ ফরাসী, ইটালীয়, স্পানিশ, ইত্যাদি ভাষার উচ্চারণ শুনিতে হইবে। তাই ভারতীয় দন্ত্যবর্ণ অর্থাৎ ত-বর্গের বর্ণ ইংরাজেরা উচ্চারণই করিতে পারে না; "ত"এর স্থানে "t", "দ"এর স্থানে "d" দিয়াই কাজ চালাইয়া লয়। লৌকিক ভাষায় এইরূপই করিতে হয়, এবং তাহাতে অসুবিধাও বিশেষ কিছু হয় না। পণ্ডিতদিগের জন্য অবশ্য লিপ্যন্তরে অনেক

উচ্চারণ-বৈষম্যসূচক (diacritical) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়—সে স্বতন্ত্র কথা। কাজেই ইংরাজী কিংবা ফরাসী কিংবা জার্ম্মাণ শব্দের বাঙ্গালা প্রতিলিপি করিবার সময়ে উহাদিগের প্রতিটি উচ্চারণ হুবহু অনুকরণ করিবার নিমিত্ত নূতন অক্ষর রচনা বা চিহ্ন রচনার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

কেহ কেহ বলেন, ইংরাজী "z" ধ্বনি বুঝাইবার নিমিত্ত "জ়" প্রয়োগ করা উচিত; তাহা হইলে "f"-এর জন্য "ফ়", "v"-এর জন্য "ভ়", ইত্যাদি লাগিবে। তাহাতেও সমস্যার শেষ নাই; "zh" ধ্বনি, যথা, "pleasure", "azure", "provision", প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি কি প্রকারে বুঝান যাইবে? ফরাসী u কিংবা জার্ম্মাণ ö বা ch কি প্রকারে বুঝান যাইবে? এই সব বুঝাইবার জন্য নূতন নূতন চিহ্ন রচনা করাকে নিরর্থক পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু বলা যায় না। তদ্রূপ, আর একটি নূতন অক্ষর কেহ কেহ প্রস্তাব করেন ইংরাজী "st" বুঝাইতে। এযাবৎ বাঙ্গালাতে "ষ্ট" দিয়া ইহা বুঝান হইয়াছে; ইহা ঠিক প্রতিধ্বনি নহে বটে কিন্তু যথেষ্ট অনুরূপ প্রতিধ্বনি। প্রস্তাবিত হইয়াছে স ও ট-এর যুক্তাক্ষর "স্ট"। এবিষয়ে প্রথম মন্তব্য এই যে ইহা অনাবশ্যক; দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে যদি এই যুক্তবর্ণের "স" ও "ট"এর ধ্বনি সংস্কৃত ধ্বনি হয় তবে "দন্ত্য" স ও "মূর্দ্ধন্য" ট-এর সমাবেশ ধ্বনিসঙ্গতি (phonetic harmony)-বিরুদ্ধ—একেবারেই বর্ণ-সঙ্কর; আর যদি বাঙ্গালা ধ্বনি হয় তবে এই চেষ্টা বৃথা, কারণ বাঙ্গালাতে "স"এর উচ্চারণ সচরাচর দন্ত্য নহে—শুধু "সৃ" ও "স্র"তে এবং দন্ত্যবর্ণের যোগে দন্ত্য হয়, যেমন "স্ত" "স্থ" ও "স্ন"তে। পক্ষান্তরে, "তালব্য" শ-এর উচ্চারণও কোন কোন স্থলে দন্ত্য হয়, যেমন "শৃ"তে এবং যুক্তবর্ণ "শ্ন" ও "শ্র"তে। সুতরাং "ষ্ট" দ্বারা কাজ চলিবে না কেন বুঝা যাইতেছে না। মোট কথা এই যে, লৌকিক ব্যবহারে অর্থাৎ সাধারণের প্রচলিত ভাষায় অন্য ভাষার ধ্বনি প্রকাশের নিমিত্ত অপ্রচলিত নূতন চিহ্নের অবতারণা অনাবশ্যক ও অবিধেয়, এবং বর্ণ-সঙ্কর সৃষ্টি এস্থলেও অবাঞ্ছনীয়।

আলোচনা

(১) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব।

বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান প্রচলিত প্রয়োগে রেফের পর কয়েকটি ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব লক্ষিত হয়; যথা, র্চ্চ, র্চ্ছ, র্জ্জ, র্ত্ত, র্দ্দ, র্দ্ধ, র্ব্ব, র্ম্ম এবং র্য্য—মাত্র নয়টি; আর তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব ক্বচিৎ লক্ষিত হয়; যথা, র্ক্ক, র্ত্থ, র্ল্ল; অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণে মোটেই দ্বিত্ব প্রয়োগ লক্ষিত হয় না। কিন্তু যে নয় স্থলে বর্ণদ্বিত্ব হয়, সেখানে সর্ব্বদাই এইরূপ হইয়া থাকে, শিষ্টপ্রয়োগে ইহার কোনও ব্যত্যয় নাই; এবং এই সব স্থলে এই বর্ণদ্বিত্ব বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। চারি শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শিলালিপিতে এবং অতি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতেও এইরূপ দ্বিত্বই অবলম্বিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দ্বিত্ব অবলম্বনের আসল কারণ ধ্বনিতত্ত্বমূলক (phonetic); রেফের পর যে ব্যঞ্জনবর্ণ বসে তাহার উপর স্বতঃই একটু বেশী জোর পড়ে; যেমন, আমরা "দুর্দ্দম" শব্দ উচ্চারণ করিতে "দুর্‌+দম্‌" এ ভাবে বলি না; "দুর্‌+দ্দম্‌" এই ভাবেই উচ্চারণ করি। পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনধ্বনির উপর এই জোর পড়ে বলিয়াই চল্‌তি কথায় আমরা "ধর্ম্ম" "কর্ম্ম"কে "ধম্ম" "কম্ম" এই ভাবে বলি; এই একই কারণে এই সব স্থলে পালি ও প্রাকৃতে "ধম্ম" "কম্ম" লেখা হয়। এই ধ্বনিঘটিত (phonetic) কারণেই, সংস্কৃত ব্যাকরণে এইরূপ স্থলে (উষ্মবর্ণ ভিন্ন অন্য) ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বিকল্পে গৃহীত হইয়াছে, যদিও ব্যুৎপত্তিতে সব সময়ে দ্বিত্ব আসে না। পাণিনি ব্যাকরণে এবিষয়ে সূত্রই রহিয়াছে "অচো রহাভ্যাং দ্বে" [অষ্টাধ্যায়ী ৮।৪।৪৬]। সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে যে বাণান সঙ্গত, এবং বাঙ্গালা ব্যবহারে যে বাণান একেবারে প্রতিষ্ঠিত (settled), তাহার পরিবর্ত্তন করা অবিধেয়।

কেহ কেহ ছাপার কার্য্যে কতকটা সরলতা হইবে বলিয়া এই সব স্থলে বর্ণদ্বিত্ব বর্জ্জনের পক্ষপাতী। প্রথমতঃ, ছাপার কার্য্যে সুবিধা হইবে বিবেচনায় প্রচলিত ভাষার বাণান বদলানর যুক্তি অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়—কারণ ভাষার জন্য টাইপ, টাইপের জন্য ভাষা নহে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালাতে অজস্র যুক্তবর্ণ আছে, তিন বর্ণের যুক্তবর্ণের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে ; যেমন, সন্ধ্যা, বস্ত্র, বক্ত্র, মন্ত্র, রন্ধ্র, উজ্জ্বল, ইত্যাদি। সমস্ত যুক্তবর্ণের ব্যবহার বর্জ্জন করিবার কোন প্রস্তাব কেহ করিতেছেন না ; শুধু মাত্র এই নয়টি অক্ষরকে ত্র্যক্ষর যুক্তবর্ণ হইতে দ্ব্যক্ষর যুক্তবর্ণে পরিণত করিলেই বিশেষ কি যে সরলতা সম্পাদিত হইবে তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বাণান যখন একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। লাভের মধ্যে হইবে এই যে যেখানে একরূপত্ব (uniformity) ছিল, সেখানে আবার নানাবিধ বাণান চলিবে। তাহা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

আর এক কথা। রেফের পর যে কয়েকটি বর্ণদ্বিত্বের বিষয় উপরে বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে "র্য্য"এর সম্বন্ধে আরও কথা আছে। বাঙ্গালা উচ্চারণে "র্য্য" শুধু বর্ণদ্বিত্ব (reduplication) নহে, ইহার মধ্যে বাঙ্গালা "্য" (য-ফলা) রহিয়াছে, এবং তদনুযায়ীই ইহার উচ্চারণ হয় ; অর্থাৎ "আর্য্য"-এর উচ্চারণ "আর্জ্য"-এর অনুরূপ, "আর্জ্জ"-এর অনুরূপ নহে। "কার্য্য" ও "মার্জ্জনা," "পর্য্যস্ত" ও "গর্জ্জন", "সূর্য্য" ও "ধূর্জ্জটি," ইহাদের উচ্চারণ অনুরূপ নহে। বাঙ্গালা ভাষাতে "য"-এর উচ্চারণ "জ" হইতে অভিন্ন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু "য-ফলা"-র উচ্চারণ-স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। সে উচ্চারণ ঠিক সংস্কৃত য-ফলার অনুরূপ নহে, কিন্তু কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত। যেমন, "মদ্য" শব্দ সংস্কৃতে উচ্চারিত হয় "মদ্+য়" অথবা "মদ্+ই+অ", বাঙ্গালাতে উচ্চারিত হয় "মই+দ্দ" বা "মৈ+দ্দ"; অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ই-ধ্বনিটির স্থান-পরিবর্ত্তন (metathesis) হয় মাত্র, এবং তৎফলে ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে ও উত্তর বঙ্গে এই উচ্চারণ খুবই সুস্পষ্ট ; পশ্চিমবঙ্গেও "মদ্য"

শব্দের উচ্চারণ ঠিক "মন্দ" শব্দের ন্যায় নহে ; য-ফলার প্রভাবে প্রথম স্বরের ধ্বনি রূপান্তরিত হইয়া "মোদ্দো" উচ্চারণ হয়। সে যাহাই হউক, য-ফলার যে বিশিষ্ট উচ্চারণ আছে তাহা মানিতেই হইবে ; এবং সেই উচ্চারণটি "র্য্য"-তেও রহিয়াছে। শুধু "র্য" লিখিলে বাঙ্গালা রীতি অনুসারে উচ্চারণ হইবে "জ্‌র্‌," কদাপি "জ্‌র্‌য্‌" হইবে না ; সুতরাং এইরূপ লিখিলে ধ্বনিবিচারে একেবারে ভুল হইবে। কাজেই "র্য্য" রূপ—যাহা বাঙ্গালাতে একমাত্র প্রচলিত রূপ—তাহা রাখিতেই হইবে ; এখানে বিকল্পও চলিবে না। অন্ত বর্ণদ্বিত্বের স্থলে, প্রচলিত বাণানের পরিবর্ত্তে রেফের পর এক-বর্ণাত্মক বাণান বিকল্পে ব্যবহার suggestion হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে মাত্র ; ইহার অধিক জোর (stress) এবিষয়ে দেওয়া অসঙ্গত। যাঁহারা এবিষয়ে প্রচলিত বাণান একেবারে বর্জ্জন করিয়া একবর্ণাত্মক বাণানই কেবল বিধান করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা একান্তই অশ্রদ্ধেয় ; কারণ সুপ্রচলিত এবং ব্যাকরণসম্মত বাণান চলিবে না অর্থাৎ অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা হইতেই পারে না।

(২) পদমধ্যে পঞ্চমবর্ণ স্থানে অনুস্বার।

বাঙ্গালাতে প্রচলিত রীতি মোটামুটি এইরূপ :

যদি "ম্"এর পর কবর্গের যুক্তবর্ণ থাকে, তবে "ং"এর ব্যবহারই সচরাচর করা হয় ; যেমন, সংক্রামক, সংখ্যা, সংগ্রহ, ইত্যাদি। যদি ক-বর্গের একবর্ণ থাকে, অথবা অন্য কোন বর্গীয় বর্ণ থাকে (একবর্ণই হউক, কিংবা যুক্তবর্ণই হউক), তবে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ ব্যবহার হইয়া যুক্তাক্ষরে পরিণত হয় ; যেমন, শঙ্কর, অঙ্ক, শঙ্খ, অঙ্গ, বঙ্গ, সঙ্ঘ, সঞ্চয়, বাঞ্ছা, ধনঞ্জয়, ঝঞ্ঝা, বণ্টন, কণ্ঠ, অণ্ড, সন্তান, সন্দেশ, সম্পন্ন, সম্বোধন, সম্ভব, সম্মান, সন্ত্রাস, তন্দ্রা, রন্ধ্র, সন্ন্যাসী, সম্প্রদান, সম্ভ্রম, ইত্যাদি। অন্তঃস্থ বর্ণ বা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে অবশ্য শুধু "ং"ই হয় (সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়মানুসারে) ; যেমন, কিংবা, কিংবদন্তী, সংবাদ, অবিসংবাদিত, বারংবার, সংবরণ, স্বয়ংবর, প্রিয়ংবদা, সংশয়, সংসার, সংহার, ইত্যাদি। এই রীতির কোন পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক।

ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে পদের অন্তস্থিত "ম্"-এর বিকল্পে "ং" অথবা পঞ্চমবর্ণ ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ করিলে, সাধারণ প্রয়োগে প্রায়ই ভুল হইবার সম্ভাবনা; কারণ কোন্‌টা পদের অন্ত এবং কোন্‌টা অন্ত নহে, ইহা বাঙ্গালাতে সহজে বুঝা যায় না। যেমন, "শংকর" লিখিলে "অংক", "অংগ", ইত্যাদি অশুদ্ধ বাণান প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং প্রচলিত প্রণালীই সুবিধাজনক।

(৩) বিসর্গান্ত শব্দ।

সংস্কৃতে যে সকল শব্দ বিসর্গান্ত, তাহারা বাঙ্গালাতে দুই আকার ধারণ করিয়াছে। কোন কোনটিতে বিসর্গ উচ্চারণ ত নাই-ই, এমন কি তৎপূর্ব্বস্থ অকারান্ত ব্যঞ্জনও হসন্ত ভাবে উচ্চারিত হয়; যেমন, মনঃ (উচ্চারণ হয়, মন্), তেজঃ (তেজ্), যশঃ (যশ্), আয়ুঃ (আয়ু), ধনুঃ (ধনু), চক্ষুঃ (চক্ষু), জ্যোতিঃ (জ্যোতি), ইত্যাদি। বাঙ্গালা প্রয়োগে তাই ইহাদের বিসর্গ বর্জ্জিত হইয়াছে। শুধু সমাসবদ্ধ পদের অন্তর্ভুক্ত হইলে ইহাদিগকে বিসর্গান্ত ধরা হয়; যেমন, মনোযোগ (মনঃ+যোগ), তেজস্কর, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্দ্ধর, জ্যোতিরিন্দ্র, চক্ষুর্দ্বয়, ইত্যাদি। এই জাতীয় শব্দ অধিকাংশই বিশেষ্য। আর এক প্রকার সংস্কৃত বিসর্গান্ত শব্দ আছে; ইহারা প্রধানতঃ অব্যয় শব্দ এবং "তৃ"-ভাগান্ত শব্দের সম্বোধন পদ। বাঙ্গালাতে ইহারা প্রায় বিসর্গান্ত ভাবেই উচ্চারিত হয়, এবং যেস্থলে তাহা না-ও হয়, সেস্থলেও অ-কার পূর্ব্বে থাকিলে অ-কারান্ত ভাবেই উচ্চারিত হয়, হসন্ত ভাবে হয় না। যেমন, ক্রমশঃ, বস্তুতঃ, প্রায়শঃ, প্রাতঃ, পুনঃপুনঃ, পিতঃ, মাতঃ, ইত্যাদি। এই সব শব্দে—এবং ইহার খাঁটি সংস্কৃত শব্দ—বিসর্গ থাকাই উচিত; বিকল্পেও বিসর্গ-বর্জ্জন উচিত নহে; কারণ বিসর্গ-বর্জ্জন একে ত এসব স্থলে অশুদ্ধ, তায় ধ্বনিবিরুদ্ধ। অপরন্তু, বিসর্গ বর্জ্জন করিলে বাঙ্গালাতে অকারান্ত শব্দে হসন্ত উচ্চারণের ঝোঁক থাকাতে, কালক্রমে "ক্রমশ" এর উচ্চারণ "লোমশ", "বস্তুত" এর উচ্চারণ "প্রস্তুত," "পিত" এর উচ্চারণ "শীত", "প্রায়শ" এর উচ্চারণ "পায়স", ইত্যাদির মত হইয়া দাঁড়াইবে।

(৪) হসন্ত শব্দ।

যে সমস্ত হসন্ত সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয় তাহা হসন্তই থাকা উচিত ; প্রচলিত ব্যবহারও মোটামুটি এইরূপ। যেমন, দিক্, ত্বক্, বাক্, বণিক্, সম্রাট্, ইত্যাদি।

অসংস্কৃত শব্দে হসন্তের ব্যবহার সাধারণতঃ অনাবশ্যক ; কারণ অকারান্ত লিখিলেই বাঙ্গালার উচ্চারণের সাধারণ রীতি অনুসারে হসন্ত উচ্চারণ হয়।

(৫) ই ঈ।

বাঙ্গালা উচ্চারণে "ই" "ঈ"এর বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক হওয়ায়, ঈ-এর ব্যবহার মোটামুটি সংস্কৃতানুযায়ী হইয়াছে ; অর্থাৎ যে সব স্থলে সংস্কৃতে ঈ-কার ব্যবহৃত হয়, যেমন, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় স্থলে, ও ইন্ কিংবা ণিন্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের প্রথমার একবচনে, সেই সব স্থলে, এবং তদনুরূপ স্থলে অসংস্কৃত শব্দেও, ঈ-কারের ব্যবহারই বাঙ্গালার প্রচলিত রীতি। দুই-এক স্থলে ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। প্রচলিত এই যে ঈ-কার প্রয়োগের সাধারণ রীতি, ইহাই থাকা উচিত এবং থাকিলেই একরূপতা (uniformity) সহজে আসিবে।

যেমন, স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃতানুযায়ী ঈ-প্রত্যয় দ্বারা যে শব্দ নিষ্পন্ন, তাহা খাঁটি সংস্কৃত শব্দই হউক কিংবা অসংস্কৃত হউক, ঈ-কারান্ত হওয়া উচিত। যথা, বাঘিনী, ধোপানী, রাণী, মামী, কাকী, জ্যেঠী, খুকী, খুড়ী, মাসী ("মাউসা" বা "মেসো"-র স্ত্রীলিঙ্গ), পিসী ("পিসা"-র স্ত্রীলিঙ্গ), ইত্যাদি। তবে যেখানে অন্য প্রয়োগ সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে তাহাই থাকিবে ; যথা, ঝি, ঠান্‌দি, দিদি, বিবি। "মাসী", "পিসী" মূলতঃ "মাতৃস্বসা" "পিতৃস্বসা" শব্দ হইতে উদ্ভূত—ঈ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন নহে—বলিয়া, কেহ কেহ "মাসি", "পিসি" বাণানের পক্ষপাতী ; এই দুই শব্দে এই কারণে বিকল্পে ই-কার চলিতে পারে।

তার পর, ইন্ বা ণিন্-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ (বা দেখাদেখি) শব্দ। ইহাদিগকে মোটামুটি বলা যায় জাতিবাচক,

ভাষাবাচক, ব্যবসায়বাচক,দেশ-বাচক, স্বত্ব (possession)-বাচক শব্দ ; এই সব শব্দও ঈ-কারান্ত হওয়া উচিত ; যেমন, "পাখা" আছে যাহার সে "পাখী" (সংস্কৃত অনুরূপ শব্দ, "পক্ষী") ; তেমনই, হাতী, ঢাকী, ঢুলী, ইত্যাদি। বাঙ্গালা যাহার দেশ সে "বাঙ্গালী" ; তেমনই, ইংরাজী, ফরাসী, জাপানী, বিহারী, মান্দ্রাজী, ইত্যাদি। ব্যবসায়-বাচক শব্দ ; যেমন, কেরাণী, ব্যাপারী (বা বেপারী,) দোকানদারী, ওকালতী, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী, ইত্যাদি। এই সব শব্দ যখন বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হয় তখনও এই বাণানই বিধেয়; যেমন, ওকালতী বুদ্ধি, গুজরাটী ভাষা, ইংরাজী কায়দা, ইত্যাদি। কারণ একই শব্দের বাণান-ভেদ অবিধেয়।

অন্ত্য ঈ-কার ছাড়া অন্যত্রও যে শব্দ সংস্কৃতমূলক (বা তদ্ভব) তাহাতে সংস্কৃতে যে ব্যবহার তদনুসারেই বাণান করা উচিত ; যেমন, কুমীর ("কুম্ভীর" হইতে), শাড়ী ("শাটী" হইতে), শীষ ("শীর্ষ" হইতে) ইত্যাদি। সাধারণতঃ প্রয়োগও এই প্রকার ; এবং এই প্রয়োগই সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে বিশৃঙ্খলা কম হইবে।

"কি" শব্দের বাণানে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। কোন কোন লেখক স্থানবিশেষে "কি" শব্দের উপর জোর (stress) বুঝাইবার নিমিত্ত ইহাকে "কী" আকারে লেখেন ; যেমন, "তুমি কী সুন্দর !" (How handsome you are !) ; কিন্তু "তুমি কি সুন্দর ?" (Are you handsome ?)। কিন্তু বাঙ্গালাতে প্রচলিত বাণান এপ্রকার ছিল না—এক রূপই ছিল, "কি" ; এবং এই নূতন বাণানটি যে কারণে অবলম্বিত হইয়াছে সে কারণটিও বিচারসহ নহে। কারণ, এই দুই স্থলে "কি" শব্দের উচ্চারণের যে তফাৎ তাহা প্রধানতঃ জোর (stress), এবং স্বরভঙ্গী (intonation)-র তফাৎ, মাত্রা (quantity) অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘের তফাৎ নহে। Quantity, intonation এবং stress, এই স্বতন্ত্র জিনিষগুলিকে গুলাইয়া ফেলা ঠিক নহে। এবং যদি stress-এর তফাৎকে

quantity-র তফাৎ দ্বারা বুঝাইতে হয়—যাহা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক—তবে "কে রে হৃদয়ে জাগে" এই বাক্যটির "কে" (stressed) এবং "রে" (unstressed), ইহাদের তফাৎ কি করিয়া বুঝান যাইবে? বস্তুতঃ বাণান বদলাইয়া intonation কিংবা stress-এর পরিবর্ত্তন করা যায় না, এবং কোন ভাষাতেই তাহা করা হয় না; context ও punctuation হইতে উহা বুঝিয়া লইতে হয়। ধরুন, ইংরাজীর একটা দৃষ্টান্ত, "John, who is here, is now upstairs", ইহার উচ্চারণ এক প্রকার; "John! who is here?" ইহার উচ্চারণ অন্য প্রকার। এ বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য। সুতরাং বাঙ্গালা বাণানে "কী" রূপ বর্জ্জনীয়।

(৬) উ ঊ।

বাঙ্গালাতে ঊ-সমন্বিত শব্দ খুব বেশী নাই; যাহা আছে তাহা প্রায়ই সংস্কৃতমূলক; সেই সব শব্দে প্রচলিত বাণান সংস্কৃতানুযায়ী এবং তাহাই থাকা উচিত; একরূপত্ব (uniformity) সহজ হইবে। যেমন, পূব ("পূর্ব্ব" হইতে), চূণ ("চূর্ণ" হইতে), পূরা ("পূর্ণ" হইতে), পুরাণো ("পুরাণ" হইতে), ইত্যাদি।

(৭) জ, য।

সংস্কৃতমূলক (তদ্ভব) শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে জ কিংবা য হওয়া উচিত; এবং সাধারণতঃ প্রয়োগও সেই প্রকারই প্রচলিত। যেমন, "যদ্" শব্দ-মূলক সমস্ত শব্দেই "য" হইয়া থাকে। কোন কোন শব্দে উভয়বিধ প্রয়োগই আছে; যেমন "কার্য্য" শব্দ হইতে কাজ, কায; "পূয়" শব্দ হইতে পুঁজ, পুঁয; "যুগ্ম" শব্দ হইতে "জোড়া," "যোড়া"; এই সব স্থলে বিকল্প রাখা যাইতে পারে। অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে "জ"ই সাধারণতঃ প্রচলিত।

(৮) ন ণ।

সংস্কৃতমূলক (তদ্ভব) শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে ণ কিংবা ন হওয়া উচিত; এবং সাধারণতঃ প্রয়োগও সেই প্রকারই প্রচলিত। যেমন,

"কর্ণ" হইতে "কাণ", "স্বর্ণ" হইতে "সোণা", ইত্যাদি। অবশ্য সংস্কৃতমূলক শব্দেও যেখানে অন্যবিধরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যেমন, শোনা ("শ্রবণ" হইতে), গিন্নী ("গৃহিণী" হইতে), ইত্যাদি, সেখানে প্রচলিত রূপই চলা উচিত ; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুপ্রতিষ্ঠিত রূপের পরিবর্ত্তন বিধেয় নহে।

কোন কোন লেখক "ন" দিয়া আজকাল এই প্রকার শব্দ লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা সমীচীন নহে ; কারণ শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহার রূপ হইতে সহজেই বোধগম্য হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া "ণ" ত বাঙ্গালাতে প্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দে থাকিবেই ; কাজেই কয়েকটি মাত্র শব্দে "ণ" বর্জ্জন করার কোন অর্থই হয় না।

আরও একটি কথা এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। মুখবন্ধেই এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। কথাটা এই যে, বাঙ্গালাতে একই উচ্চারণের দুইটি শব্দ থাকিলে যদি তাহাদের বর্ণভেদ করা যায় তাহা হইলে সুবিধা হয়। এই হেতু পাণ ("পর্ণ"-শব্দজ), বাণান ("বর্ণন"-শব্দজ), ইত্যাদি শব্দকে "ণ" দিয়া লিখিলে ব্যুৎপত্তিও পরিষ্কার হয়, এবং পান (পা+অনট্), বানান (তৈয়ারী করা), ইত্যাদি শব্দ হইতে পৃথক্ করিবার সুবিধা হয়। এ বিষয়ে প্রয়োগ উভয়বিধই আছে, তবে "ণ" প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। তদ্রূপ, মণ (ওজন-বাচক) এবং মন (চিত্ত), এই দুই শব্দেও পৃথক্ বাণান রাখা উচিত এবং প্রচলিত প্রয়োগে পৃথক্ বাণানই আছে। ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত "লীলাবতী"তেও ওজনবাচক "মণ" বাণানই আছে ; যথা, "মণাভিধানং খযুগৈশ্চ সেরৈঃ"।

তাছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে বাঙ্গালাতে বহুল পরিমাণে ণত্ববিধান পালিত হয় ; বাঙ্গালাতে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দে ত পালিত হয়ই, অ-সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দেও হয় ; ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং বাণানের রীতির ধারা (uniformity) বজায় রাখিবার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। তাই "র" এর পরে, "রেফ"এর পরে, "ণ" দিয়াই বাঙ্গালায় সাধারণতঃ লেখা হয় ; যেমন,

ইরাণী, তুরাণী, রিপণ, গ্রেণ, ট্রেণ, গভর্ণমেণ্ট, কর্ণোয়ালিস, ইত্যাদি। এই প্রয়োগের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। তবে এবিষয়ে প্রচলিত প্রয়োগই সর্ব্বাগ্রে মানিতে হইবে ; যেমন, ক্রিয়াবিভক্তিতে "ণ" ব্যবহার হয় না ; যথা, করুন, ধরুন, করেন, করিবেন, সাঁতরান, ইত্যাদি।

"রাণী" শব্দেও প্রচলিত প্রয়োগ "ণ" ; ণত্ববিধানানুসারে ইহাই স্বাভাবিক। আর প্রাকৃত প্রয়োগও তাই—"রণ্ণী"। বস্তুতঃ এক পৈশাচী প্রকৃত ভিন্ন আর কোন প্রাকৃতেই "ন" নাই, সবই "ণ" ["নো ণঃ সর্ব্বত্র" প্রাকৃত-প্রকাশ ২।৪২]। সম্ভবতঃ "রাণী" শব্দের "ণ" প্রাকৃত হইতে আসিয়া থাকিবে। আর তাহা হউক বা না হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ "রাণী" শব্দের "ণ" বাণান একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত—ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

(৯) শ, ষ, স।

সংস্কৃতমূলক (তদ্ভব) শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে শ, ষ, কিংবা স হওয়া উচিত ; যেমন, বাঁশ ("বংশ" হইতে), কাঁসা ("কাংস্য" হইতে), ষাঁড় ("ষণ্ড" হইতে), ইত্যাদি। খুব সুপ্রচলিত বাণান পরিবর্ত্তনের দরকার নাই ; যেমন, সিঁড়ি ("শ্রেণী" হইতে)।

অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে এই বিষয়ে প্রয়োগের বিভিন্নতা আছে। যেমন, সহর, শহর ; সাদা, শাদা ; জিনিষ, জিনিস ; খুসি, খুশি ; ইত্যাদি। এই জাতীয় শব্দের মধ্যে যেগুলির বাণান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যেমন, রেশম, পশম, সর্ত্ত, পোষাক, খোসা, চাষা, সখ, সৌখীন, সরম, আপোষ, ইত্যাদি, তাহাদের পরিবর্ত্তন অনুচিত। তবে অন্যান্য অনিশ্চিত-রূপ শব্দের একটা বাণান নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলে ভাল হয়। বাঙ্গালাতে যখন "শ" "ষ" "স" এর কার্য্যতঃ একই উচ্চারণ, তখন এই সব স্থলে কেবল "স" প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ বাঙ্গালাতে "স" এর প্রয়োগই বেশী। পালিতে ও মাগধী ভিন্ন অন্য প্রাকৃতে ইহাই করা হইয়াছে, ["শষোঃ সঃ"

প্রা.-প্র. ২।৪৩] ; মাগধীতে সব স্থলেই "শ" করা হইয়াছে ["ষসোঃ শঃ" প্রা.-প্র. ১১।৩]।

অনেকের মত এই যে মূল আরবী, ফারসী, ইংরাজী, ফরাসী, ইত্যাদি যে সব ভাষা হইতে এই সব শব্দ আমদানী হইয়াছে, সেই সব ভাষার উচ্চারণানুযায়ী "স" অথবা "শ" হওয়া উচিত। কিন্তু তাহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা বেশী, কারণ সাধারণতঃ বলিতে গেলে, ঐ সব ভাষায় শব্দের কি উচ্চারণ ছিল তাহা অনেকেরই জানিবার কথা নহে, মতভেদও যথেষ্ট আছে. সুতরাং গোলমালই থাকিয়া যাইবে। আর তাছাড়া, "স" কিংবা "শ" যাহাই লেখা যাউক, বাঙ্গালাতে উচ্চারণ একই প্রকার হইবে ; কাজেই অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে এই ব্যুৎপত্তিমূলক গবেষণা এবং পৃথক্‌করণের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

(১০) খ, ক্ষ।

"খ" ও "ক্ষ" এর উচ্চারণ এক প্রকার নহে ; তবে শব্দের আদিতে অনেকটা অনুরূপ বটে। এস্থলে, সংস্কৃতমূলক (তদ্ভব) শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দানুসারেই "খ" অথবা "ক্ষ" হওয়া উচিত। যেমন, খোঁড়া (খনন), খোঁড়া (খঞ্জ), ক্ষেত (ক্ষেত্র), ক্ষ্যাপা (ক্ষিপ্ত), লক্ষ্মৌ ("লক্ষ্মণ" শব্দজ), ইত্যাদি। প্রচলিত প্রয়োগও মোটামুটি এই রকম।

(১১) ঐ, ঔ।

ঐকার, ঔকার সমন্বিত বাঙ্গালা শব্দ কোন কোন স্থলে অই, অউ, ভাবেও লেখা হয়। যেমন, বৌ (বউ), দৈ (দই), সৈ (সই), ইত্যাদি। সর্ব্বত্র হয় না ; যেমন, মৌ, দৌড়াদৌড়ি, কুকুর ভৌ ভৌ করে, হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড, ইত্যাদি।

যে যে স্থলে দুই প্রকার বাণানই প্রচলিত, সেখানে উভয়ই চলিতে পারে, যদিও ঐকার ও ঔকারই বেশী ধ্বনিসঙ্গত, কারণ ঐ সব ধ্বনি diphthongal অর্থাৎ monosyllabic — dissyllabic নহে। অন্যত্র ঐকার ও ঔকারই হওয়া উচিত।

(১২) ং, ঙ, ঙ্গ।

সংস্কৃতে যে সব শব্দে "ঙ্গ" আছে তদ্ভব বাঙ্গালা শব্দে অনেকে আজকাল "ং" কিংবা "ঙ" লিখিতেছেন। যেমন, "বঙ্গ" হইতে উৎপন্ন "বাঙ্গালা", "বাঙ্গালী" কে তাঁহারা লেখেন বাংলা, বাঙালী, ইত্যাদি।

এই বিষয়ে দুইটি কথা বলা যায়। "ঙ" এর ধ্বনি বিষয়ে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে, সংস্কৃতে সংযুক্ত বর্ণে ভিন্ন স্বতন্ত্র "ঙ"-এর প্রয়োগ বড় একটা পাওয়া যায় না; "ঞ"এরও তদ্রূপ। প্রাচীন বাঙ্গালাতে "ঞ" দিয়া "গোসাঞি" লেখা হইত, তাহা এখন একপ্রকার লোপ পাইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে "গোসাঁই" লেখা হয়। এমত অবস্থায় "ঙ" কে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা একটু আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হয়; এবং "বাঙ্গালী" ও "বাঙালী"তে উচ্চারণের এমন কোন গুরুতর পার্থক্য হয় না, যাহার দরুণ স্পষ্ট ব্যুৎপত্তিমূলক "বাঙ্গালী" রূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এত সূক্ষ্ম ধ্বনিবিচার ত রেফের পর বর্ণদ্বিত্বের বর্জ্জনপ্রচেষ্টার সময়ে সংস্কারকদিগের দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রকার শব্দে "ঙ" এর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নহে, তবে নেহাৎ বিকল্পে চলিতে পারে।

তার পর "ং"এর কথা। কথ্যভাষায় "বাঙ্গালা" শব্দের যাহা উচ্চারণ, তাহা "ং"-এর অনুযায়ী বটে। বলিবার সময়ে "বা-ঙ্গা-লা" এই ভাবে বলা হয় না, "বাংলা" বা "বাঙ্‌লা" এই ভাবে বলা হয়। কিন্তু সাধু ভাষায় "বাঙ্গালা" রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত; তবে বিকল্পে "বাঙ্‌লা" বা "বাংলা" চলিতে পারে। কিন্তু পদান্তস্থিত "ঙ্‌" উচ্চারণ বাঙ্গালাতে "ং" ভাবে লেখাই সুপ্রচলিত; যেমন, রং, সং, ইত্যাদি। তাই পদান্তে "ং"ই বিধেয়।

(১৩) মত মতো, ইত্যাদি।

বাঙ্গালাতে সাধারণতঃ পদান্তে যদি অসংযুক্ত অকারান্ত বর্ণ থাকে, তবে তাহা হসন্তের ন্যায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র হয় না, অনেক ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করিয়া হয় ত এক বা একাধিক

নিয়ম এবিষয়ে বাহির করা যাইতে পারে ; যেমন, দেখিতে পাওয়া যায় যে এরূপ স্থলে স্বরান্ত উচ্চারণ সচরাচর বিশেষণেই হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ততঃ বাঙ্গালা-ভাষাভাষীদিগের পক্ষে এই নিয়ম প্রণয়নের বিশেষ আবশ্যকতা নাই ; মোটামুটি ব্যতিক্রমগুলি প্রায় জানাই আছে—অন্ততঃ context হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু কতক অ-কারান্ত শব্দ আছে যাহাদের একই রূপ, কিন্তু বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন উচ্চারণ, কোনটা হসন্ত, কোনটা স্বরান্ত ; যেমন, মত, মত (সদৃশ) ; ভাল (কপাল), ভাল (উত্তম) ; পালিত (পদবী), পালিত (পা+ণিচ্+ক্ত) ; রক্ষিত (পদবী), রক্ষিত (রক্ষ্+ক্ত) ; বার, বার (দ্বাদশ) ; কাল (সময়), কাল (কৃষ্ণবর্ণ) ; ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে কেহ কেহ স্বরান্ত উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অন্ত্যবর্ণ ওকার দিয়া লেখেন ; যেমন, মতো, ভালো, ইত্যাদি। কিন্তু সব শব্দে এই স্বরান্ত উচ্চারণ ওকারের ন্যায় নহে ; যেমন, "পালিত", "রক্ষিত," প্রভৃতি শব্দে ; এবং বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র ত ওকারান্ত উচ্চারণ নহেই। আর তাছাড়া, context হইতেই এই সব শব্দ বুঝিতে পারা যায় ; বিশেষ চিহ্ন অনাবশ্যক। আর এক কথা, অনেক স্থলে উচ্চারণও প্রায় একরূপ ; যেমন, কাল (সময়), কাল (কল্য) ; চাল (রীতি), চাল (ছাদ) ; ডাল (শাখা), ডাল (ডাইল) ; ইত্যাদি। সে সব স্থলে যদি একই বাণান দিয়া চলিতে পারে, অপর স্থলে পারিবে না কেন ? সুতরাং ও-কার প্রয়োগ বিশেষ আবশ্যক বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এস্থলে যাঁহারা ভেদ প্রকাশ করিতে চাহেন তাঁহারাই আবার "মণ" ও "মন", "পাণ" ও "পান," "বাণান" ও "বানান", এই সব স্থলে একাকার করিতে উৎসাহী।

(১৪) কথ্য (বা চল্‌তি বা মৌখিক) ভাষা (colloquial language) ।

বাস্তবিক পক্ষে বাণানবৈষম্য বাঙ্গালার সাধু ভাষাতে তেমন বেশী নাই ; অন্ততঃ অন্যান্য জীবন্ত প্রচলিত ভাষা, যথা ইংরাজী, ফরাসী, প্রভৃতি

ভাষার তুলনায় যৎসামান্য; কিন্তু কথ্য (বা চল্‌তি বা মৌখিক) ভাষায় যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের বিভিন্ন বিভক্তিতে।

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জিলায় প্রচলিত কথ্য ভাষা ধরিলে ত বিভিন্নতার অন্তই নাই—শুধু বাণানে ও রূপে নহে, উচ্চারণেও; তবে সে সকলের ব্যবহার লিখিত সাহিত্যে বড় একটা নাই বলিয়া সেগুলির কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, তথাপি কলিকাতা ও তদুপকণ্ঠের প্রচলিত যে কথ্য ভাষা—যাহা সাহিত্যে লেখার ভিতরে আজকাল অনেকটা ব্যবহৃত হইতেছে—তাহার মধ্যেও প্রয়োগের যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন, "করিলাম", এই সাধুরূপ হইতে করলাম, কর্ল্লাম, কোরলাম, কোল্লাম, কল্লেম, করলেম, কোরলেম, কল্লুম, করলুম, ইত্যাদি।

"করিতেছি", এই সাধুরূপ হইতে করছি, কর্চ্ছি, কচ্ছি, কচ্চি, কর্চ্চি, কোরছি, কোচ্চি, কোচ্ছি, কোর্চ্ছি, কোর্চ্চি, ইত্যাদি।

সেইরূপ, "করিয়াছিলাম," "করিতেছিলাম," "করিত," "করিবার," "করিতে," "করিয়া," "করিতাম," ইত্যাদি সাধুরূপ হইতে permutation-combination-এর সাহায্যে প্রায় প্রত্যেকটিরই ১৫।১৬টি রূপ কথ্যভাষার লেখাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব স্থলে যদি কোন একটা বাণান নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তবে সে চেষ্টা সুফলপ্রদ ও সার্থক হয়। বাঙ্গালার প্রচলিত সাধুভাষার সুপ্রতিষ্ঠিত বাণান-প্রণালীকে সূক্ষ্মধ্বনিতত্ত্বের বিচারে কিংবা সরলতা-সম্পাদনের খাতিরে পরিবর্ত্তনের প্রয়াসে সময় ও শক্তি ব্যয় করা ততটা আবশ্যক নহে।

(১৫) লিপ্যন্তর (transliteration)।

এই বিষয়ে মুখবন্ধেই বলা হইয়াছে যে বিদেশী ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিধ্বনি কোন ভাষাতেই প্রকাশ করা যায় না, এবং করা অনাবশ্যক; মোটামুটি অনুরূপ ধ্বনি প্রকাশ করিতে পারিলেই যথেষ্ট। পণ্ডিতজনের আলোচ্য লিপ্যন্তর (transliteration)-এ অবশ্য অনেক উচ্চারণ-বৈষম্য-

সূচক (diacritical) চিহ্নের সাহায্যে ধ্বনিপ্রকাশের চেষ্টা হয়; কিন্তু সাধারণ্যে প্রচলিত লৌকিক ভাষায় তাহা করা হয় না, এবং এই নিমিত্ত নূতন বর্ণ-যোজনা করা কিংবা নূতন চিহ্ন আমদানী করা উচিত নহে।

আমাদের দেশে ইংরাজী শব্দের লিপ্যন্তরই বেশী আবশ্যক হয়। তাই সেই বিষয়েই মোটামুটি কিছু বলিতেছি।

ইংরাজীর অনেক স্বর-উচ্চারণই বাঙ্গালাতে সহজে প্রকাশ করা যায়; যথা, far (দীর্ঘ আ), fall (অ), fate (এ) fin (ই), feet (ঈ), put (উ), fool (ঊ), mow (ও), bough (আউ), boy (অয়্); ইত্যাদি। কয়েকটিতে মাত্র একটু গোলমাল হয়; যেমন, but (হ্রস্ব আ); এস্থলে আ-কার দিয়াই ধ্বনি প্রকাশ করা উচিত; যেমন, বাট্। পূর্ব্বে এস্থলে "বট্" অর্থাৎ অ-কার দিয়াই প্রকাশ করা হইত কিন্তু তাহাতে বুঝিবার অসুবিধা এই যে বাঙ্গালা অ-এর উচ্চারণ হ্রস্ব "আ" নহে (যদিও অবশ্য সংস্কৃতে "অ"এর উচ্চারণ হ্রস্ব "আ"ই বটে)। তার পর, pat-এর ধ্বনি; সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি নাই, তাই তদনুযায়ী symbol বা রূপও নাই। বাঙ্গালায় ধ্বনিটি আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র রূপ নাই; যেমন, এক (উচ্চারণ "ak"); এখানে "এ" বর্ণটি দ্বারাই এই ধ্বনি প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কাজেই, বাঙ্গালা উচ্চারণ-আলোচনায় মানিয়া লইতে হইবে যে বাঙ্গালাতে "এ" বর্ণের দুই প্রকার উচ্চারণ আছে, pet এবং pat-এর ধ্বনি। তবে বাঙ্গালাতে ব্যঞ্জনবর্ণের পরে য-ফলা আকার দিলে প্রায় এতদনুরূপ উচ্চারণ হয় বলিয়া, সাধারণতঃ ইংরাজীর এই ধ্বনির লিপ্যন্তরে "্যা" ব্যবহার করা হয়, যেমন, pant (প্যাণ্ট)। সেই নিয়মই চলিতে পারে। তবে আদ্যক্ষরে এই স্বরধ্বনি বুঝাইতে হইলে, "এ" কিংবা "য়্যা" এই দুই রীতিই চলিতে পারে। যেমন, acid (এসিড্ বা য়্যাসিড্)। "অ্যা" কিংবা "এ্যা" অর্থাৎ স্বরবর্ণের সহিত "্যা" প্রয়োগ অসমীচীন ও অনাবশ্যক।

অর্দ্ধস্বর ধ্বনি (semi-vowel sound) w, y, বাঙ্গালাতে সহজেই বুঝান যায় ; যেমন, work (ওয়ার্ক), yard (ইয়ার্ড), ইত্যাদি। কেহ কেহ ওআর্ড, ইআর্ড লিখিতে চাহেন। কিন্তু তাহা সাধারণ বাঙ্গালা রীতিবিরুদ্ধ ; কারণ সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও দুইটি স্বরবর্ণের সমাবেশ সচরাচর হয় না ; প্রাকৃতেই স্বরবর্ণের সমাবেশের ছড়াছড়ি পাওয়া যায়। এবিষয়ে বাঙ্গালাতে প্রাকৃত রীতি অনুসৃত হয় নাই, সংস্কৃত রীতিই হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে "ওয়ার্ক" লিখিলে "য়"এর ঈষৎ "ই"ধ্বনি আসিয়া পড়ে, তাই তাঁহারা "ওআর্ক" লিখিতে চান। কিন্তু সে কথার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ বাঙ্গালা প্রয়োগে "য়" বর্ণের দুই রকম উচ্চারণই প্রচলিত, "ইয়" সুতরাং ধ্বনি এবং "অ" ধ্বনি ; যেমন, পাওয়া, খাওয়া, ইত্যাদি ; ইহাদের উচ্চারণে কোন "ই" ধ্বনি নাই, একেবারেই পাওআ, খাওআ। বাঙ্গালাতে "য়" এর এই দ্বিবিধ উচ্চারণ স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই বাঙ্গালাতে "ওয়ার্ক" লেখায় কোনই দোষ নাই। তাই, Edward হইবে "এডোয়ার্ড," war-bond হইবে "ওয়র-বণ্ড", ইত্যাদি। Will-কে "উইল" লেখাই রীতি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি রীতির কথা মনে পড়িল। ইংরাজীতে w এবং y-এর অনুরূপ বর্ণ সংস্কৃতে অন্তঃস্থ "ব" এবং "য"। হিন্দীতে এই দুই বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃতের মতই রহিয়াছে। এই কারণে হিন্দীতে এই দুই বর্ণ দ্বারাই w এবং y-এর লিপ্যন্তর করা হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালাতেও এতদনুযায়ী w-কে অন্তঃস্থ "ব" দ্বারা প্রকাশ করা হইত ; যেমন, William Words-worth কে লেখা হইত "বিলিয়ম বার্দ্স্বার্থ", Weber-কে লেখা হইত "বেবর" ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কালের লেখাতে ইহার বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এরীতি এখন উঠিয়া গিয়াছে, এবং উঠিয়া যাওয়া উচিতই হইয়াছে ; কারণ বাঙ্গালাতে অন্তঃস্থ "ব" এর উচ্চারণ এবং আকৃতি একেবারেই বর্গীয় "ব" এর মত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং উক্ত প্রকার লিপ্যন্তরে মূলশব্দের উচ্চারণ মোটেই বজায় থাকে না। ইংরাজী

y-এর লিপ্যন্তর অবশ্য পূর্ব্বেও "য়" (যাহার উচ্চারণ সংস্কৃত "য" এর অনুরূপ) দ্বারাই করা হইত ; তবে পদের আদিতে y-ধ্বনি থাকিলে, কোন কোন স্থলে "য়" এর পূর্ব্বে "ই" দেওয়া হইত, কারণ পদের আদিতে "য়" প্রয়োগ বাঙ্গালা রীতিবিরুদ্ধ ; যেমন, Europe লেখা হইত "ইয়ুরোপ" ; আবার কেহ কেহ "য়ুরোপ" লিখিতেন ; "ইউরোপ" লেখাও চলিত।

তার পর ব্যঞ্জনধ্বনি। কয়েকটি ইংরাজী ব্যঞ্জনবর্ণের ঠিক বাঙ্গালা প্রতিধ্বনি নাই। যেমন, f, v, z ; ইহাদিগকে নিকটতম ধ্বনি-সংযুক্ত বর্ণ ফ, ভ, জ দ্বারা প্রকাশিত করিলেই যথেষ্ট। এজন্য ফ়, ভ়, জ়, ইত্যাদির অবতারণা অনাবশ্যক।

তাছাড়া কয়েকটি যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনি ইংরাজীতে আছে, যেমন, zh, st ; ইহাদিগকেও নিকটতম ধ্বনিসংযুক্ত বর্ণ "ঝ" এবং "ষ্ট" দ্বারা প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট। "zh" ধ্বনিসংযুক্ত ইংরাজী শব্দ খুব বেশী প্রচলিত নাই ; কয়েকটি আছে ; যেমন, pleasure, measure, azure, vision, ইত্যাদি ; তাই এ বিষয়ে বাঙ্গালায় কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি অবলম্বিত হয় নাই। কেহ "জ" দিয়া, কেহ "ঝ" দিয়া লেখেন—বোধ হয় "ঝ" দিয়া লেখাই ভাল। কিন্তু "st"-যুক্ত ইংরাজী শব্দ ঢের প্রচলিত আছে ; যেমন, station, street, steamer ইত্যাদি ; বাঙ্গালাতে "ষ্ট" দিয়া প্রকাশ করাই প্রচলিত রীতি, এবং এই রীতি-পরিবর্ত্তনের কোনই আবশ্যকতা নাই। কেহ কেহ স ও ট এর এক যুক্তাক্ষর "স্ট" অথবা "স্‌ট" এইরূপ পৃথক্ ভাবে লিখিয়া এই ধ্বনিটি বুঝাইতে চাহেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই মুখবন্ধে বলিয়াছি যে তাহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই ; কারণ "স" এবং "ট"এর ধ্বনি যদি সংস্কৃতের ধ্বনি হয়, তবে "দন্ত্য" স এবং "মূর্দ্ধন্য" ট-এর সমাবেশ ধ্বনি-সঙ্গতি-বিরোধী (এই কারণেই জার্ম্মাণ ভাষায় "stein" প্রভৃতি শব্দে "st"-এর উচ্চারণ "ষ্ট") ; আর যদি বাঙ্গালার ধ্বনি হয়, তবে ইহা পণ্ডশ্রম মাত্র, কারণ বাঙ্গালাতে "দন্ত্য স" এর উচ্চারণ মোটেই "দন্ত্য" নহে, সুতরাং "ষ"এর

পরিবর্ত্তে "স" আমদানী করিয়া কোনই উন্নতি হয় না। বস্তুতঃ এত সূক্ষ্ম ধ্বনিবিচার করিবার জন্য নূতন বর্ণ-যোজনা কোন ভাষাতেই করা হয় না; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে ইংরাজেরা "লক্ষ্ণৌ"কে Lucknow, "দিল্লী"কে Delhi লেখে, তাহাতে এমন কিছু অসুবিধা হয় না।

উপসংহার

বাঙ্গালা বাণানের সংস্কার-বিষয়ক এই যে সামান্য কিছু আলোচনা করা হইল তাহার প্রধান কারণ এই যে সম্প্রতি কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়োজিত একটি কমিটি এই বিষয়ে আলোচনায় নিযুক্ত আছেন; এবং ইতিমধ্যে সেই কমিটি এসম্বন্ধে কতগুলি প্রস্তাব আনিয়াছেন। সেই প্রস্তাবগুলি প্রথমতঃ বিগত মে মাসে একখানি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়; এবং কিছুদিন পরে উক্ত পুস্তিকার একখানি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দুই সংস্করণের প্রস্তাবাবলীর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সম্ভবতঃ প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত প্রস্তাবাবলীর সমালোচনার ফলেই দ্বিতীয় সংস্করণে কতক কতক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে, কি প্রথম কি দ্বিতীয় সংস্করণে কোনটিতেই ভাষার রূপ-নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত পথ অনুসৃত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাষার রূপ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা মোটা কথা ও গোড়ার কথা এই যে, যে রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা মানিয়া লইতে হইবে। ইংরাজীতে এবং অন্যান্য ভাষায় ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, an ewt হইতে a newt, a nadder হইতে an adder, for then once হইতে for the nonce হইয়াছে—আজ যদি কেহ ewt বা nadder বা for then once লেখে তবে তাহাই ভুল হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক হওয়াতে সাধুভাষার রূপে বড় একটা অনিশ্চয়তা নাই; প্রায়ই একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনাতেও দেখা গেল যে সাধু বাঙ্গালা শব্দের রূপ-গঠনে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতিই

অনুসৃত হইয়াছে, খামখেয়ালী ভাবে হয় নাই। সুতরাং সাধুভাষার বাণান সংস্কার বা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই বলিলেই হয়। অথচ এই সাধুভাষার প্রচলিত রূপ পরিবর্ত্তনের দিকেই বাণান-কমিটির উৎসাহ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

শুধু একেবারে অ-সংস্কৃতমূলক দেশজ শব্দ ও বিদেশী ভাষা হইতে আহৃত বাঙ্গালা শব্দ—যাহাতে নানা প্রকার বাণান প্রচলিত আছে (উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে)—সেইগুলিকে নিয়মিত (standardize) করিবার চেষ্টা করিলে কিছু উপকার হইতে পারে।

আর সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক তথাকথিত চল্‌তি বা কলিকাতা অঞ্চলের কথিত ভাষা—যাহা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেকে আজকাল কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন—সেই ভাষার রূপের, বিশেষতঃ তাহার ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত রূপের, নিয়ন্ত্রণ করা। এই বিষয়ে বিশৃঙ্খলা খুবই বেশী, সুতরাং তাহা দূরীকরণের প্রচেষ্টা আবশ্যক।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিশ্ববিদ্যালয়-বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলীর মধ্যে চল্‌তি ভাষার সম্বন্ধে মাত্র দুই-একটি প্রস্তাব আছে, আর সমস্তই সাধুভাষার প্রচলিত রূপের পরিবর্ত্তন ও নিয়ন্ত্রণবিষয়ক। বস্তুতঃ কমিটির অভিযান প্রধানতঃই নিয়োজিত হইয়াছে প্রচলিত সাধুভাষার রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব, বিসর্গ, ঈ, ণ ও ঙ-এর বিরুদ্ধে; সর্ব, আর্য, পর্যন্ত, কার্তিক, পুনঃপুন, রানি, মামি, বাঙালি, প্রভৃতি রূপের অবতারণাই ইহার নিদর্শন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে প্রথম সংস্করণে চল্‌তি ভাষা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তবু যেটুকু চেষ্টা করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সেটুকুও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

ক্রিয়াবিভক্তি "লাম"-এর স্থলে কথ্য ভাষায় "লাম," "লুম," "লেম" এই নানাপ্রকার রূপই ব্যবহৃত হয়। প্রথম সংস্করণে বলা হইয়াছিল "লাম"

রূপটিই বিধেয় এবং অপরগুলি বর্জ্জনীয়; অথচ দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হইয়াছে যে "লাম" বিভক্তি স্থলে "লুম" বা "লেম" বিকল্পে লেখা যাইতে পারে। আবার প্রথম সংস্করণে ছিল যে মত, মত (সদৃশ); ভাল (কপাল), ভাল (উত্তম); ইত্যাদির মধ্যে বাণান ভেদ অনাবশ্যক, দ্বিতীয় সংস্করণে আছে যে শেষোক্ত শব্দগুলির বাণান মত, মতো; ভাল, ভালো; ইত্যাদি বিকল্পে বিধেয়। তদ্রূপ, দ্বিতীয় সংস্করণে "কি" শব্দের "কী" রূপও বিকল্পে বিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সংস্করণের এই সব পরিবর্ত্তন কোন কোন বিশিষ্ট লেখকের খাতিরে হইয়াছে; কিন্তু খাতিরে বিকল্প সৃষ্টি ও বাণান বিধান করা ভাষা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃষ্ট পথ নহে।

মোটের উপর দাঁড়াইয়াছে এই যে, যেদিকে (অর্থাৎ চল্‌তি ভাষা সম্পর্কে) সংস্কার চেষ্টা দ্বারা কতকটা উপকার সাধিত হইতে পারিত সেদিক্‌টা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত কমিটি ছাড়িয়া দিয়াছেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে যে দিক্‌টাতে (অর্থাৎ সাধুভাষা সম্পর্কে) বিশেষ কিছুই করিবার নাই, সেই দিকেই কমিটি সমূহ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, এবং সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতেছেন। এই প্রণালীতেই যদি বাণান-সংস্কার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, তবে লাভের মধ্যে হইবে এই যে যেখানে আছে শৃঙ্খলা সেখানে আসিবে বিশৃঙ্খলা, যেখানে আছে সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ সেখানে আসিবে বিকল্প, যেখানে আছে স্থিরতা সেখানে আসিবে অনিশ্চয়তা; সংস্কারের নামে ঘটিবে বিকার—অর্থাৎ মোটের উপর ফল হইবে বাণান-বিভ্রাট। ভাষা-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অত্যন্ত ধীরতা ও সুবিবেচনার সহিত যুক্তিসঙ্গত ভাবে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক—শুধু খেয়াল বা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া নহে—নচেৎ এই বিষয়ে অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ভাষার উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই সঙ্ঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ফাল্গুন, ১৩৪৩।

বাঁচির অধিকার

রাঁচির অধিকার

[রাঁচি বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে
সভাপতির অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত]

সাহিত্যের বর্ত্তমান ধারার বিষয়ে ত কিছু আলোচনা করা গেল, কিন্তু এখন আবার আর এক উৎপাত দাঁড়াইয়াছে, সে উৎপাত ভাষার উপর।

শত শত বর্ষ ধরিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার ভিতর দিয়া বঙ্গভাষা আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আমাদের আধুনিকদের পছন্দ হইতেছে না। তাঁহারা ভাষা-জননীর পুরাতনরূপে আর সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহাকে ঘষিয়া মাজিয়া নবীনারূপে না সাজাইতে পারিলে আর তাঁহাদের মন উঠিতেছে না। তাই আজ বিরাট্ উদ্যমে ভাষা-সংস্কার, বর্ণমালা-সংস্কার, বাণান-সংস্কার, ইত্যাকার নানাবিধ সংস্কারের দাপটে বঙ্গ-সরস্বতীর জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

কোন পণ্ডিত বলেন, অ আ ক খ প্রভৃতি ভারতীয় বর্ণমালা বর্জ্জন করিতে হইবে—অর্থাৎ যে বর্ণমালা মানব-সভ্যতার আদি যুগ হইতে বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্তের মধ্য দিয়া, সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি-শৌরসেনী-মাহারাষ্ট্রী-মাগধী-অর্দ্ধমাগধীর মধ্য দিয়া আর্য্য-মঙ্গল-দ্রাবিড়ের মধ্যে বিস্তার, সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিস্তার করিয়াছে—যে বর্ণমালা ধ্বনিবিচারের দিক্ হইতে দেখিলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্বদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুবিন্যস্ত বর্ণমালা—সে বর্ণমালা দ্বারা আর চলিবে না; তৎপরিবর্ত্তে Roman Script অর্থাৎ রোমক বর্ণমালার a, b, c, d, বা হ, য ব, র, ল আমদানী না করিতে পারিলে আর সভ্যসমাজে মুখ দেখান যায় না।

কোন পণ্ডিত বলেন, বাঙ্গালা গণিত চিহ্নগুলি—অর্থাৎ ১, ২, ৩ প্রভৃতি—এগুলিকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে 1, 2, 3, প্রভৃতি ইংরাজী চিহ্ন গুলি না প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে আর ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ব-পণ্ডিত (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়-চিহ্নিত পণ্ডিত, সমাস—মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়) স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গ-সরস্বতী বর্ণ-দ্বিত্বের চাপে, বিসর্গের দাপটে এবং দীর্ঘ ঈ-এর উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন; সুতরাং "কার্য্য" কে "কার্য," "পর্য্যন্ত" কে "পর্যন্ত," "পুনঃপুনঃ" কে "পুনঃপুন," "ধর্ম্ম" কে "ধর্ম," "রাণী" কে "রানি," "পাখী" কে "পাখি," ইত্যাদি লিখিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে হইবে। আমাদের মাসী-পিসী-মামী প্রভৃতি এতকাল স্ত্রীত্ব-সূচক ঈ-কারের অবগুণ্ঠনের আওতায় তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে অভিব্যক্ত করিতে পারেন নাই—এতকাল পরে ঈ-এর অপসারণে পর্দ্দা ফাঁক হওয়াতে মুক্তবায়ুর আস্বাদান পাইলেন—Feminism-এর জয়জয়কার!

ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এইরূপ যে বাঙ্গালা ভাষাটা যেন একতাল কাদা, ইহাকে লইয়া ইহা হইতে শিব হইতে বানর পর্য্যন্ত যাহা কিছু গড়িয়া তুলিবার পরোয়ানা যেন আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হইয়াছে।

ভাষার একটা ইতিহাস আছে, ইহা একটা organic growth, ইহার বর্ত্তমান রূপ একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে, প্রত্যেকটি শব্দের বর্ত্তমান রূপের পশ্চাতে বিচিত্র কাহিনী রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষার সম্পর্কে আপনারা অনেকেই Trench's Study of Words বইখানির কথা জানেন—ভাষার রূপের মধ্যে কত যে ইতিহাস কত যে পুরাতত্ত্ব কত যে উপন্যাস লুক্কায়িত থাকে, অতি সুনিপুণ তূলিকায় সেই চিত্র তিনি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এসব আমাদিগের অর্ব্বাচীন যুগের সংস্কারকদিগের চিন্তার পরিধির মধ্যেই আসে না—কারণ তাঁহারা যে নেহাৎই সংস্কারক, কোন সম্ভ্রম বা দরদ বা সঙ্কোচের বাধা ত তাঁহাদের থাকিবার কথা নহে। খুব বেশী ভাবিবার বিষয় হইলে হয়ত ভাবিতে পারেন যে লাইনোটাইপে ছাপিতে হইলে কি রকম বাণান হইলে সুবিধা—কারণ তাঁহাদের মতে ভাষার জন্য টাইপ নহে, টাইপের জন্য ভাষা—এমন না হইলে সংস্কারক!

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা হঠাৎ অত্যন্ত দুরূহ প্রতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া এই সব পণ্ডিতগণের নিকট কোন শিশু-ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই, অথবা "আর্য্য" জাতির টিকি কাটিতে কিংবা "ধর্ম্ম" "কর্ম্ম"-এর ভিত্তিমূল শিথিল করিতে কেহ তাঁহাদিগকে আম্‌মোক্তারনামা দিয়াছে বলিয়াও শুনা যায় নাই। কিন্তু সেজন্য ত এই সব সংস্কারকগণ তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত কর্ত্তব্য হইতে বিরত থাকিতে পারেন না; সুতরাং শাণিত-কুঠার হস্তে ধারণ করিয়া এই নবীন পরশুরামগণ, এবার আর পিতৃ-আজ্ঞায় নহে, স্বয়ংসিদ্ধ হইয়াই ভাষা-জননীর বধসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

আমি এই অভিভাষণের গোড়াতে আপনাদিগকে রঁাচির অধিবাসী বলিয়া কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সে ব্যঙ্গ দ্বারা আপনাদের প্রতি আমি অবিচারই করিয়াছি। বস্তুতঃ রঁাচির অধিকার সুদূর-প্রসারিত, অন্ততঃ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সমতটে রঁাচির অধিকার যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্রং নাস্তি।

কার্ত্তিক, ১৩৪৩।

ফনেটিক যৎকিঞ্চিৎ

ফনেটিক যৎকিঞ্চিৎ

[চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে যে বাঙ্গালা বাণান আলোচনাবিষয়ে একটি বৈঠক বসিয়াছে ইহা অতি সময়োচিতই হইয়াছে ; কারণ এই কিছু দিন ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত বাণান-কমিটির কতগুলি প্রস্তাব লইয়া খুবই আন্দোলন চলিতেছে, সুতরাং এবিষয়ে বেশ ভাল করিয়া আলোচনা হওয়াই উচিত।

আমাদের এই বৈঠকের সভাপতি মহাশয়ের সুদীর্ঘ অভিভাষণ এই মাত্র আমরা সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিলাম। তাঁহার কোন কোন মন্তব্য সম্বন্ধে আমার নিজের কি কি বক্তব্য আছে তাহা অবিলম্বেই আপনাদের সমক্ষে পেশ করিতেছি। তবে প্রথমেই একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। আমাদের সভাপতি ডাঃ শহীদুল্লা সাহেব একজন professional অর্থাৎ পেশাদার ভাষাতত্ত্ববিদ্—এবিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। পরন্তু আমি শুধু নিজের খেয়ালবশতঃই কিছু কিছু ভাষাচর্চ্চা

করিয়া থাকি, একেবারেই amateur অর্থাৎ সৌখীন ভাষাতত্ত্ববিদ্; সুতরাং আমাকে যদি আপনারা এবিষয়ে বিশেষ-অজ্ঞ ঠাওরান, তাহা হইলেও আমার প্রতি কোন অবিচার করা হয় না।

তবে আজকাল কিনা শুনি বিজ্ঞাপনের যুগ, তাই ভাষালোচনা সম্বন্ধে আমার গুণপনার বিষয়ে কিছু বিজ্ঞাপন বোধ করি আবশ্যক; নচেৎ হয়ত আপনারা আমাকে মোটে আমলেই আনিবেন না। অতএব আপনাদিগের অবগতির নিমিত্ত ভাষাসম্বন্ধে আমার বিদ্যার পরিধির কিঞ্চিৎ পরিচয় নিবেদন করিতেছি। আমি বাঙ্গালীর বাচ্চা, সুতরাং মাতৃদুগ্ধপানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা ভাষাতে অশিক্ষিতপটুত্ব জন্মিয়াছে; সংস্কৃতের বিদ্যা যেটুকু, সেটুকু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী হইতে আহৃত; ছেলেবেলা হইতেই রীতিমত *wander-lust* বা বিভ্রমিষা থাকাতে ভারত-ভ্রমণের জন্য যেটুকু হিন্দীর আবশ্যাক হয় ততটুকু শিখিয়া রখিয়াছি; কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়িবার সময়ে ফারসী আলেফ-বে-পে-তে-টে-ছে-সমন্বিত বাক্যাবলী জের-জবর-পেশ-সহযোগে রীতিমত ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে লিখিতে শিখিয়াছিলাম, কিন্তু এতদিনে শ্রেফ ভুলিয়া গিয়াছি; উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করার দরুণ ইংরাজী ভাষাতে নিশ্চিত কিঞ্চিৎ উচ্চাঙ্গের বুৎপত্তিই জন্মিয়াছে; অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে মোটামুটি জানি ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইটালিয়ান; জেনারাল ফ্রাঙ্কোর প্রতি মমতার আতিশয্য বশতঃ স্পানিশ শিখিতেছি; রুশ ভাষার ছত্রিশটি হরফের সহিত পরিচয় আছে; আর লাটিন ও গ্রীক মাঝে মাঝেই পড়িতে আরম্ভ করি এবং কিছুদিন পরেই ভুলিয়া যাই। আমি আপনাদের সমক্ষে আজ কবুল করিতেছি যে ভাষা বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত বিদ্যা আমার পেটে নাই। এই অল্পবিদ্যা লইয়া যে ভয়ঙ্করী চর্চ্চা আজ আপনাদের সামনে করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি, তাহা একেবারেই অনধিকার-চর্চ্চা। তজ্জন্য পূর্ব্বাহ্নেই আপনাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লইতেছি।

যাক্, এখন ভণিতা শেষ করিয়া আমার বক্তব্য সুরু করা যাউক। এতক্ষণ চুপ করিয়া শহীদুল্লা সাহেবের বক্তৃতা শুনিতেছিলাম। তিনি যে ভাবে ব্ল্যাকবোর্ডের উপরে খড়ি পাতিয়া আমাদিগকে ভাষাবিজ্ঞানের *umlaut*, *ablaut*, প্রভৃতি গহনতত্ত্বের সহিত পরিচিত করিতেছিলেন, তাহাতে মনে হইতেছিল যে ওয়েল্‌স্ সাহেবের Time-machine বা কালচক্রের উপর চড়িয়া উল্টাপাক দিয়াই হউক কিংবা বিরিঞ্চি বাবার আশীর্ব্বাদেই হউক, বছর পঁচিশেক বয়স কমাইয়া ফেলিয়াছি, এবং এম্. এ. ক্লাসের Philology section-এ বসিয়া লেক্‌চার শুনিতেছি। *L'Association Phonétique Internationale*-এর ধ্বন্যাত্মক চিহ্নাবলী, এবং phonetic ভাষার মাধুর্য্য সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের বিবৃতি শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। এখন উঁহার বক্তৃতা থামিতে হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল। মনে একটা সংশয় জাগিল, আমাদের সামনে আজ বাঙ্গালা বাণান-সংস্কারের যে সমস্যা হঠাৎ উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সেটা কি সত্য সত্যই একটা phonetic সমস্যা? বাঙ্গালা ভাষাকে ও তাহার শব্দাবলীকে কি বেবাক্ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া phonetic ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে? আমার যেন একটু খট্‌কা লাগিতেছে।

আপনারা ইমানুয়েল কাণ্ট নামক বিশ্ববিশ্রুত জার্ম্মাণ দার্শনিকের কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে দুইখানা মোটামোটা পুঁথি ছিল; একখানির নাম *Kritik der reinen Vernunft* (*Critique of Pure Reason*), এবং অপর খানির নাম *Kritik der praktischen Vernunft* (*Critique of Practical Reason*)। আমাদের সভাপতি মহাশয়—এবং শুধু সভাপতি মহাশয়ের কথাই বা বলি কেন—আমাদের বাণান-সংস্কারকদিগের ধরণ-ধারণ দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহারা সকলেই যেন Pure Reason-এর চর্চ্চায় আদাজল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধ্বনিতত্ত্বের সূত্রানুসারে ভাষাকে পুনর্গঠিত

করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আমাদের ভাষার অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবী স্বয়ং যেন তাঁহাদিগকে একখানা প্রাচ্যদেশীয় Esperanto কিংবা Volapük ভাষা গড়িয়া তুলিবার পরোয়ানা দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাপারটি ত ঠিক তাহা নহে।

আমাদের নবীন ভগীরথগণ যে দেবলোক হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটি নবীনা ভাষা-মন্দাকিনী বঙ্গের মর্ত্ত্যভূমিতে আনয়ন করিতে পারিবেন এমনটা ত মনে হয় না। বহু সনাতন জঞ্জাল বক্ষে করিয়া আমাদের এই ভাষাস্রোত বহুকাল ধরিয়া পিতৃলোক হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সেই ধূলিধূসর পঙ্কিল জলপ্রবাহ আজ গঙ্গাসাগরের মোহানায় আসিয়া উপস্থিত, সেই স্রোত গঙ্গোত্রীতে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা যে একেবারেই পণ্ডশ্রম। একটা জীবন্ত জাতির প্রচলিত ব্যবহৃত ভাষার সংস্কার, clean slate-এর উপরে হইতে পারে না। দশজন পণ্ডিতে বসিয়া অনেক গবেষণা করিয়া ঘোষণা করিলেন, Let there be light, অমনি there was light,—ভাষাক্ষেত্রে এমনটা হয় না। যদি এই অসম্ভব চেষ্টা সম্ভবও হইত তাহা হইলেও অবিলম্বেই দেশভেদে কালভেদে ব্যক্তিভেদে উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িত; এবং অচিরেই অতি যত্নে রচিত phonetic spelling আবার একেবারেই unphonetic হইয়া দাঁড়াইত। বিশুদ্ধ ধ্বনিতত্ত্বমূলক এবং সুবিন্যস্ত বর্ণমালার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে সংস্কৃত ভাষা, তাহারও কত অপভ্রংশ কত ধ্বনি-তারতম্য হইয়া নানাবিধ প্রাকৃত, নানাবিধ প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ইউরোপ অঞ্চলেও লাটিন বর্ণমালার ধ্বনি বর্ত্তমান ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সত্য কথা বলিতে, ভাষা জিনিষটা পণ্ডিতদের জিনিষই নহে; ইহা একেবারেই প্রাকৃত জনসাধারণের জিনিষ; ইহার প্রকৃতি একেবারেই গণতান্ত্রিক—একেবারেই Vox populi vox dei! এক্ষেত্রে শুধু যে

দশচক্রে ভগবান্ ভূত হয় তাহা নহে, অনেক ভূতও ভগবান্ হইয়া উঠে—অনেক অশুদ্ধ রূপও শুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তারপর পণ্ডিতদের আবির্ভাব হয়; তাঁহারা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন; নিপাতন-রূপ মন্ত্রদ্বারা পূত করিয়া শুদ্ধি-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন। সংস্কারকদিগের এই সহজ কথাটা মনে রাখা দরকার। বাঙ্গালা শব্দের বাণান নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহারা যেন নেহাৎই phonetic চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া না বসেন—Phonetics ভাষাবিজ্ঞানের class-lecture-এ আবদ্ধ থাকিলেই সুশোভন হয়, প্রাকৃত জনের কলকোলাহলমুখর ভাষার আসরে ইহাকে টানিয়া আনা বিড়ম্বনা মাত্র। ভাষা-সংস্কার বাস্তবিক পক্ষে Pure Reason-এর ব্যাপার নহে; ইহা একেবারেই Practical Reason-এর ব্যাপার; এবং ইহার পরিধিও খুবই সীমাবদ্ধ।

যাহা হউক, এই Phonetics বা ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা যখন উঠিয়াই পড়িল, তখন ডাঃ শহীদুল্লা সাহেব বাঙ্গালা ধ্বনি সম্বন্ধে দুই একটা যে আশ্চর্য্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা উচিত মনে করি।

তিনি বলিয়াছেন যে বাঙ্গালাতে ম-ফলা ও ব-ফলাতে ম ও ব-এর ধ্বনি কিছুমাত্র নাই, যে বর্ণের উপরে ঐ ফলা-দ্বয় বসে তাহার দ্বিত্ব হয় মাত্র। এই মন্তব্যটি তিনি অতি general বা ব্যাপক ভাবে করিয়াছেন। আমি ত তাঁহার ন্যায় ভাষাতত্ত্ব-পণ্ডিতের মুখে এরকম loose statement শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। তিনি দুই একটি উদাহরণ দিয়াছেন; যেমন, "পদ্ম" সচরাচর উচ্চারিত হয় "পদ্দ", "পক্ব" উচ্চারিত হয় "পক্ক", ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল, One swallow does not make a summer— গোটা কয়েক দৃষ্টান্ত হইতেই সাধারণ সূত্র রচনা করা বিপজ্জনক। ম-ফলা ও ব-ফলা সম্বন্ধে তিনি generalize করিতেছেন; অথচ তাঁহার এটুকু খেয়াল

নাই যে ঐ দুই ফলা-বিশিষ্ট অসংখ্য শব্দ আছে যেখানে ঐ ফলা-দ্বয়ের ধ্বনি অতি সুস্পষ্টভাবেই বর্ত্তমান ; যেমন, (ম-ফলার) বাঙ্ময়, হিরণ্ময়, তন্ময়, মৃন্ময়, জন্ম, গুল্ম, বাল্মীকি, শাল্মলী, ব্রহ্ম, ইত্যাদি ; আর (ব-ফলার) ঋগ্বেদ, দিগ্বলয়, বাগ্বাদিনী, তদ্বৎ, সুহৃদ্বর, উদ্বাহ, উদ্বন্ধন, অম্বা, আচম্বিত, আহ্বান, বিহ্বল, ইত্যাদি। তাছাড়া, যে সব স্থলে ঐ দুই ফলার দরুণ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণ কতকটা দ্বিত্বভাবাপন্ন হয়, সে সব স্থলেও ঐ দ্বিত্বটুকুই সম্পূর্ণ উচ্চারণ নহে, তৎসঙ্গে ম ও অন্তঃস্থ ব-ধ্বনির রেশটুকুও থাকে। "পদ্ম" শব্দের উচ্চারণ ঠিক "পদ্দ" নহে, কিন্তু "পদ্দঁ" ; "আত্মা" শব্দের উচ্চারণ ঠিক "আত্তা" নহে, কিন্তু "আত্তাঁ" ; "বাগ্মী" শব্দের উচ্চারণ ঠিক "বাগ্‌গী" নহে, কিন্তু "বাগ্‌গীঁ"। অনেকে ত "আত্‌মা" "বাগ্‌মী" ভাবেই উচ্চারণ করেন। তেমনি "স্বামী" "স্বাদ"-এর উচ্চারণ অনেকটা "সোয়ামী" "সোয়াদ"-এর মত। অবশ্য একেবারে vulgar উচ্চারণে হয়ত এই সূক্ষ্ম রেশটুকু ততটা থাকেনা, যেমন, "হদ্দ কল্লি পদ্ম (পদ্দ) পিসী"। কিন্তু তজ্জন্য বাঙ্গালা উচ্চারণ আলোচনাতে একথা বলা মোটেই চলে না যে এসব স্থলেও ম ও ব-ফলাতে শুধু বর্ণদ্বিত্বই বুঝায়। আর যে যে স্থলে পূরাপূরি মাত্রাতে ম ও ব ধ্বনি প্রকাশমান, তাহার কতগুলি উদাহরণ ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। ব-ফলা সম্বন্ধে আর একটা কথা এই যে, কোন কোন ব-ফলা বর্গীয় ব-ফলা, যেমন, বাগ্বাহুল্য, সম্বন্ধ, সম্বুদ্ধি, অম্বা, অম্বর, অম্বরীষ, সম্বন্ধ, সম্বোধন ; আবার কোন কোন ব-ফলা অন্তঃস্থ ব-ফলা, যেমন, ঋগ্বেদ, উদ্বাহ। বাঙ্গালাতে উভয় "ব"-ই উচ্চারণে ও আকৃতিতে একই রকম হওয়াতে, একসঙ্গেই উভয়ের আলোচনা করিলাম। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত—তাহাও খুব accurate নহে—দেখিয়া হঠাৎ generalize করিবার এই যে প্রবৃত্তি ইহা কোন ভাষা-বিজ্ঞান-বিদের শোভা পায় না। ইহা একেবারেই false induction।

ডাঃ শহীদুল্লা সাহেব য-ফলা সম্পর্কেও এই বর্ণদ্বিত্বের অভিযোগ আনিয়াছেন। এই অভিযোগ ত আরও কম টেঁকসই। কারণ "অদ্য" শব্দের উচ্চারণ "অদ্দ" নহে। সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ "অদ্+য়"—"অদ্+ই+অ"। বাঙ্গালাতে "য়" কারের ই-ধ্বনি স্থানচ্যুত হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণটির আগে গিয়া বসে, এবং তৎফলে ব্যঞ্জনবর্ণটি দ্বিত্বভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, যেমন, "অ+ই+দ্দ" বা "ঐদ্দ"। এই উচ্চারণ আমাদের বাঙ্গাল-দেশে ত অতি সুপরিস্ফুট—শহীদুল্লা সাহেবের তাহা না জানিবার কথা নহে। পশ্চিমবঙ্গ কিঞ্চিৎ ও-কারগ্রস্ত হওয়াতে, তথায় ইহার উচ্চারণ দাঁড়ায় "ওদ্দো"—ভাষাতত্ত্বের *umlaut*-এর ফলে। কিন্তু য-ফলাতে কদাপি শুধু বর্ণদ্বিত্ব বুঝায় না। বাঙ্গালা-ফলার এই যে ধ্বনিবিশ্লেষণ, ইহা অতীব সহজ ও সুস্পষ্ট; কিন্তু দেখিতেছি পণ্ডিতবর্গ এই সহজ বিষয়টা মালুম করিতে পারেন না। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

আবার, লোকমুখে শুনিতে পাই যে শহীদুল্লা সাহেবের নাকি আরও কিছু কিছু radical ধারণা আছে; যথা, তিনি নাকি "হরিণ" শব্দের "হৃণ" রূপ পছন্দ করেন। জানিনা এই জনশ্রুতি সত্য কিনা; তবে যদি বাস্তবিকই ভাষা-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এতাদৃশ মৌলিক-ভাবাপন্ন হয়, তবে ত আমার ন্যায় অপণ্ডিতদের "শত হস্তেন বাজিনম্" নীতি অনুসরণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছিনা। যাহা হউক, সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্যাদি সম্বন্ধে আর অধিক কালক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় কিংবা আবশ্যক মনে করিনা। এখন বিশ্বপণ্ডিতদিগের বাণান-কমিটির প্রস্তাবগুলি একটু পরখ করিয়া দেখা যাউক।

জার্ম্মেণীতে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন; তাঁর নাম য়োহান্ হাইন্‌রিষ্ ফস্ (Johann Heinrich Voss)। তাঁর সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। জনৈক বন্ধু তাঁহাকে নিজের একখানি গ্রন্থ পড়িবার জন্য উপহার দিলে, ফস্ বইখানি পড়িয়া বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,

"Dein redseliges Buch lehrt mancherlei Neues and Wahres,
Wäre das Wahre nur neu, wäre das Neue nur wahr !"
অর্থাৎ, তোমার চমৎকার বইখানাতে অনেক কিছু নূতন কথা এবং অনেক কিছু সত্য কথা আছে, কিন্তু সত্য কথাগুলি যদি নূতন হইত, আর নূতন কথাগুলি যদি সত্য হইত, তাঁহা হইলেই আরও চমৎকার হইত। বাণান-কমিটির পুস্তিকাখানির মধ্যে যে সব মূল্যবান্ প্রস্তাবাদি দেখা যায়, তদ্দৃষ্টে আমারও কেবল এই মন্তব্যটিই মনে পড়ে। অর্থাৎ ঐ পুস্তিকাখানির পৃষ্ঠা কয়টির মধ্যে অনেক ভাল কথা আছে, এবং অনেক নূতন কথা আছে; তবে দুঃখের বিষয় এই যে ভাল কথাগুলি বিশেষ নূতন নহে, এবং নূতন কথাগুলি মোটেই ভাল নহে।

বাণান-কমিটি কয়েকটি যে বিশেষ নয়া নয়া মূল্যবান্ প্রস্তাব আমদানী করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু আপনাদিগকে উপঢৌকন দিতেছি।

পয়লা নম্বরই হইল বর্ণদ্বিত্ব-বর্জ্জন। উঁহারা বলেন যে রেফের পর সাধারণতঃ বাঙ্গালাতে যে কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়, তাহা একদম বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। প্রথম সংস্করণে তবু একটু loop-hole রাখিয়াছিলেন যে, যেস্থলে বর্ণদ্বিত্ব না হইলে বাণান অশুদ্ধ হয়, যেমন, বার্ত্তা, কার্ত্তিক, বার্দ্ধক্য, ইত্যাদি শব্দে, তথায় থাকিবে, অন্যত্র বাতিল হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে দেখি যে কর্ত্তাদের সাহস বাড়িয়াছে; তাঁহারা ফতোয়া দিয়াছেন যে বর্ণদ্বিত্ব একদম চলিবেনা—শুদ্ধ অশুদ্ধ আবার কি? গোলদীঘীর গোলামখানা হইতে পাতি দিবা মাত্রই ত বর্ণ-শুদ্ধি হইয়া যায়—ইহাই ত আধুনিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। আর কথাটা মিথ্যাই বা কি? নাচিতে নামিয়া ঘোমটার বাড়াবাড়ি করা একেবারেই অশোভন। সুতরাং হুকুম হইল, শুদ্ধ অশুদ্ধ দেখিবার দরকার নাই; মোট কথা, রেফের পরে বাঙ্গালাতে বর্ণদ্বিত্ব চলিবেনা। কাজেই, বাঙ্গালা মুল্লুকে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব বন্ধ, কর্ত্তব্য কার্য্যও আর কেহ করিতে

পারিবেনা, আর্য্য অনার্য্যের উভয়েরই টিকি ত কাটাই গিয়াছে, এমন কি এমন যে সূর্য্যদেব, তাঁহাকেও কিরণচ্ছটা কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া "সূর্য" রূপে তুষ্ট থাকিতে হইবে। যদি কেহ সভয়ে তর্ক উত্থাপন করেন যে, কাজটা কি ঠিক হইল, ব্যাকরণসম্মত বাণান তায় সুপ্রচলিত বাণান, ইহা কি প্রকারে বাতিল হয়? নেহাৎ বিকল্পে একবর্ণাত্মক বাণান চলিতে পারে; —তবে সংস্কারক তরফ হইতে তাহার উত্তর এই যে, সর্ব্বনাশ, বিকল্প করিলে কেহ নয়া বাণান মানিবেই না, সুতরাং সংস্কারও অচল হইবে। সুতরাং কেমাল-পাশা tactics আবশ্যক—একেবারে নির্ব্বিকল্পম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্!

শুনিতেছি নাকি সরলতা-সম্পাদনই এই প্রকাণ্ড সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য—আমাদের সবুজ বাঙ্গালাদেশের তরুণ বালকবালিকাবৃন্দ নাকি রেফের পরে বর্ণদ্বিত্বের চাপে নিষ্পেষিত হইয়া উঠিয়াছে—সুতরাং ইহার একটা বিহিত অবিলম্বে না করিলেই নয়। এখানেও আমার একটু খট্‌কা লাগিতেছে; কারণ ব্যাপারটা একেবারেই যেন মশা মারিতে কামান দাগিবার মত হইয়াছে। হ্যাঁ, বুঝিতাম যে একটা কেমাল-পাশা গোছ প্রস্তাব হইত—আমাদের ব্রাহ্মণ-কেমাল সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের Roman Script-ই হউক, কিংবা অন্ততঃ সমস্ত যুক্তবর্ণের দঙ্গলকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দিবার প্রস্তাবই হউক—তাহা হইলে এই বীররসটা তারিফ করা যাইত।

আজ সভাতে সুনীতি বাবুই উপস্থিত নাই; Roman Script লইয়া কাহার সঙ্গেই বা লড়াই করি? কিন্তু যুক্তবর্ণ বিলোপের প্রস্তাবটাও শুনিতে মন্দ শুনায় না। একটা বর্ণের ঘাড়ে আর একটা চড়িয়া বসিবে, একটা বর্ণের চাপে আর একটা আধমরা হইয়া থাকিবে, কিংবা গোটা তিন চারেক বর্ণ জড়াজড়ি করিয়া একটা যৌথ-পরিবার রচনা করিবে—এই গণতন্ত্রের এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে ইহা মোটেই বরদাস্ত করিতে প্রবৃত্তি হয় না—এইরূপ বর্ণবৈষম্যের ফলেই ত

class-war অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইহার পরিবর্ত্তে যদি সবগুলি বর্ণ সমতলক্ষেত্রে কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হইয়া হসন্তরূপ সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া quick march করিতে পারিত, তবে কি খরতর বেগেই না আমাদের ভাষার উন্নতি সাধিত হইতে পারিত? দেখিতেও কি রকম সুন্দর দেখাইত ভাবুন ত'? স্বর্গত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই নবকলেবরে কি অপরূপ রূপ ধারণ করিতেন, একবার অবলোকন করুন,—ব্ অ ঙ্ ক্ ই ম্ অ চ্ অ ন্ দ্ র্ অ চ্ অ ট্ ট্ ও প্ আ ধ্ য্ আ য়্ অ। সুতরাং এই মহতী প্রচেষ্টা যদি বাণান-কমিটি করিতেন, তবে আর কিছু না হউক, তাঁহাদের বীরত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতাম। কিন্তু তাহার ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না—সমুদায় যুক্ত-বর্ণ বিতাড়নের প্রস্তাব ত কেহই করিতেছেন না—শুধু মাত্র যে নয়টি স্থানে অর্থাৎ র্চ্চ র্চ্ছ র্জ্জ র্ত্ত র্দ্দ র্দ্ধ র্ব্ব র্ম্ম র্য্য যুক্তবর্ণে রেফের পরে দ্বিত্ব হয়, তথায় ত্র্যক্ষর যুক্তবর্ণ হইতে দ্ব্যক্ষর যুক্তবর্ণে পরিণত করিলেই যে আমাদের শিশুপাল স্বস্তির নিঃশ্বাস কেন ফেলিবেন তাহার ত কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

তাছাড়া, "র্য্য" সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে। ইহার যে দুইটি "য", তাহার একটি "য", অপরটি য-ফলা। বাঙ্গালা উচ্চারণে "য" "জ"-এর মতই হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু য-ফলার উচ্চারণ-স্বাতন্ত্র্য রহিয়া গিয়াছে। য-ফলা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই ইহা দেখাইয়াছি। সুতরাং "র্য্য"তে ঠিক শুধু বর্ণদ্বিত্ব হইয়াছে বলা যায় না, যেমন, "র্জ্য"-তে বলা যায় না; এবং "র্য্য"-এর উচ্চারণ "র্জ্য", "র্জ্জ" নহে। দেওয়ানী আদালতে ইস্যু "ধার্য্য" করা হয়, এবং ফৌজদারী আদালতে আসামীর উপরে "চার্জ্জ" করা হয়—এই দুই শব্দের উচ্চারণ এক রকম নহে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের phonetist-দিগের নিকট অন্ততঃ এইটুকু ধ্বনি-বিশ্লেষণ-শক্তি আশা করিতে পারি। সুতরাং "র্য্য"-এর স্থলে বিকল্পেও "র্য" রূপ চলা উচিত নহে।

আর অন্যান্য স্থলেও এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, রেফের পরে যে বর্ণদ্বিত্ব পাণিনি বিকল্পে বিধান করিয়া গিয়াছেন, এবং বাঙ্গালাতে একেবারেই সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহারও প্রকৃত কারণ phonetic-ই। কারণ, "ধর্ম্ম" "কর্ম্ম", এই সব শব্দ উচ্চারণের সময় রেফের উচ্চারণ খুব সংক্ষিপ্ত হয় এবং ম-এর উপরই জোর পরে—"র্ম্ম"—তাই চল্‌তি কথায় বলা হয় "ধম্ম", "কম্ম"। সুতরাং প্রচলিত, ব্যাকরণসম্মত ও ধ্বনিতত্ত্বানুমোদিত বাণান পরিবর্ত্তন করার কোনই কারণ দেখিতে পাই না। তবে নেহাৎ যদি তদীয় সংস্কার-প্রচেষ্টার বিফলতায় সংস্কারকদের মনঃকষ্ট হয়, তবে না হয় তাঁহারা বিকল্পে ব্যবহার করুন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল যে বাঙ্গালাতে রেফের পরে বর্ণদ্বিত্বের প্রচলন অতি প্রাচীন। হস্তলিখিত অতি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতেও এইরূপ বাণানই পাওয়া যায়—হয়ত লেখাতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে অনেক রূপান্তর আছে, কিন্তু বর্ণদ্বিত্বটি অব্যাহতই রহিয়াছে—যেমন, "সূর্য্য", "সুর্জ্জ", "সূর্জ্জ", ইত্যাদি। এই মাত্র কিছুদিন হইল রাজসাহী কলেজের একটি সম্মিলনী উপলক্ষ্যে আমি তথায় যাই; এবং একদিন বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়ম দেখিতে যাই। তত্রত্য অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া নানা দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখান; তন্মধ্যে একখানি শিলালিপি দেখান এবং বলেন যে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শিলালিপির সেখানা খুব প্রাচীন নিদর্শন। দেখিতে গিয়া হঠাৎ আমার নজর পড়িল বাণানের দিকে—"মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি" কিনা—দেখিতে পাইলাম যে সেই প্রাচীন লিপিতে "চতুর্দ্দশ" এবং "বিনির্ম্মিত" এই বাক্যদ্বয় বর্ণদ্বিত্ব-সহযোগেই লিখিত হইয়াছে। সে লেখাটি এই :

"শ্রীরস্তু

শাকে পঞ্চপঞ্চাশধিকচতুর্দ্দশশতাব্দিতে মধ্যৌ শ্রীশ্রীমন্মহামুদ সাহ নৃপতেঃ সময়ে নূরবাজ খাঁনপুত্র মহাপাত্রাধিপাত্র শ্রীমৎ ফরাস খাঁনেন সংক্রমোয়ং বিনির্ম্মিত ইতি।"

এই শিলালিপির তারিখ ১৪৫৫ শকাব্দ বা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ চৈতন্য-দেবের তিরোভাবের বৎসর। চারিশত বৎসরেরও বেশী প্রাচীন। এই ত গেল বাঙ্গালার কথা। হিন্দীতেও দেখিয়াছি দুই রূপই পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিষয়ে বাণান-কমিটির crusading zeal একেবারেই misplaced মনে হয়।

শুধু রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব নহে, বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত কয়েকটি নিরীহ বর্ণের উপরও বাণান-কমিটি খড়্গাহস্ত হইয়াছেন; যথা, বিসর্গ, দীর্ঘ ঈ, মূর্দ্ধন্য ণ।

আপনারা সকলেই জানেন যে বিসর্গ একটি আশ্রয়স্থান-ভাগী বর্ণ; এই বেচারীকে যে পণ্ডিতেরা নিরাশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন এই দৃশ্যে সত্যই করুণার উদ্রেক হয়। এই নিরীহ বর্ণটি অতি সন্তর্পণে শব্দের এক কোণে ক্বচিৎ কদাচিৎ পড়িয়া থাকে, তাহাকেও ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া বহিষ্কার করিয়া দেওয়া কি উচিত? বোধ করি পণ্ডিতবর্গের চক্ষে বিসর্গটি একেবারেই নিরর্থক nuisance, সুতরাং তাঁহারা ভাষার স্বাস্থ্যবিধানকল্পে এই conser-vancy treatment-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই?

বাঙ্গালাতে দুই জাতীয় সংস্কৃত বিসর্গান্ত-শব্দ আসিয়াছে। একপ্রকার শব্দ প্রধানতঃ substantive বা বিশেষ্য, যেমন, চক্ষুঃ, মনঃ, তেজঃ, ইত্যাদি; এইগুলির বিসর্গ-উচ্চারণ এবং বিসর্গ-রূপও বাঙ্গালাতে লোপ পাইয়া গিয়াছে, এমনকি অ-কার পূর্ব্বে থাকিলে অ-কারেরও হসন্ত উচ্চারণ হইয়া গিয়াছে (বাঙ্গালা উচ্চারণ-পদ্ধতির ঝোঁক অনুসারে); যেমন, আমরা বলি চক্ষু, মন্, তেজ্, ইত্যাদি; শুধু সমাসের অন্তর্ভুক্ত হইলে ইহাদিগকে বিসর্গান্ত ধরা হয়; যেমন মনোযোগ (মনঃ+যোগ)। কিন্তু আর একপ্রকার বিসর্গান্ত শব্দ আছে যাহা প্রধানতঃ অব্যয় এবং তৃ-ভাগান্ত শব্দের সম্বোধন পদ, যেমন পুনঃপুনঃ, ক্রমশঃ, বস্তুতঃ, প্রাতঃ, পিতঃ, মাতঃ, ইত্যাদি; এই সব শব্দে বাঙ্গালাতে মোটামুটি বিসর্গান্ত উচ্চারণই

আছে, অন্ততঃ অ-কারান্ত উচ্চারণ ত আছেই ; এবং চিরকাল বাঙ্গালাতে এই সব শব্দে বিসর্গের ব্যবহার প্রচলিত আছে। হঠাৎ সংস্কারকগণ এই বিসর্গের মূলোৎপাটনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—অথচ এই সব স্থানে বিসর্গ মোটেই নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন নহে ; তাছাড়া বিসর্গহীন বাণান এসব স্থলে অশুদ্ধ। সুনীতি বাবু ত একেবারেই radical, তিনি "প্রথমতঃ"-কে "প্রথমতো" লিখিতে চাহেন, বোধ করি তিনি দিন কয়েক পরে "পিতঃ"-কেও "পিতো"-তে পরিণত করিবেন। বাণান-কমিটি অতদূর যাইতে সাহসী নহেন ; তাঁহারা বিসর্গ তাড়াইয়াই খালাস, অর্থাৎ ক্রমশ, বস্তুত, পিত, ইত্যাদিতে দাঁড় করাইয়াছেন।

কিন্তু একটা কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। বাঙ্গালা অ-কারান্ত অযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ যে হসন্ত হইয়া দাঁড়ায় সেটা কি তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন ? এই হসন্তের ঝোঁকের ফলে দুদিন বাদেই যে "ক্রমশ" লোমশ মুনি হইয়া উঠিবে ; "বস্তুত" প্রস্তুত হইয়া যাইবে ; "পিত" ঠাণ্ডা শীত হইয়া যাইবে। বিসর্গটির অস্তিত্ব অন্ততঃ এই দুর্ব্বিপাকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কথঞ্চিৎ সহায়তা করে। আর একটি মজার কাণ্ড উঁহারা করিয়াছেন ; "পুনঃপুনঃ"-কে করিয়াছেন "পুনঃপুন" ; আমি বুঝিতেছি না যে মাঝের বিসর্গটির উপর উঁহাদের হঠাৎ এতটা মমতা উপজিল কি কারণে ; ওটিকেও বিদায় দিয়া সোজাসুজি "পুনপুন" করিলেই ত বঙ্গভাষার গয়াযাত্রার পথ সুগম হইত।

তারপর দীর্ঘ ঈ। কর্ত্তারা বলেন যে সংস্কৃত ভাষার নিগড় হইতে বাঙ্গালা ভাষার স্বাধীনতা-ঘোষণার নিদর্শনস্বরূপ পদান্তস্থিত ঈ-কারকে উৎখাত করিতে হইবে ; অর্থাৎ খুড়ী, জ্যেঠী, মামী, পাখী, হাতী, ইত্যাদিকে ই-কার দিয়া লিখিতে হইবে।

চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ঈ-কার, অর্থাৎ কি না "স্ত্রীত্বাদীপ্" ; সেই অবরোধসূচক চিহ্ন নাকি বর্জ্জন করিতে হইবে। আমি তাই রাঁচির বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে এই ব্যবস্থাটি খুবই

সময়োচিত হইয়াছে—ঈ-কারের অবগুণ্ঠন-মোচনে Feminism-এর জয়জয়কারই প্রকটিত হইয়াছে।

আবার, গুণবাচক, স্বত্ববাচক, ইত্যাদি শব্দ—সংস্কৃতে যাহা "ইন্" বা "ণিন্" প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়—তাহার প্রথমার একবচনে ঈ-কার হয়; যেমন, পক্ষী, হস্তী, ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠী, ইত্যাদি। বাঙ্গালাতেও তাহারই দেখাদেখি এই জাতীয় শব্দের ঈ-কার দিয়াই বাণান হইয়া আসিতেছে; যেমন, পাখী, হাতী, ইত্যাদি।

কিন্তু স্বাধীনতার ফতোয়া অনুসারে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে তাহা নাকি আর হইবে না; অর্থাৎ দাঁড়াইবে "পক্ষী"-র পাশে "পাখি", "হস্তী"-র পাশে "হাতি", "ব্যবসায়ী"-র পাশে "বেপারি", "হস্তিনী"-র পাশে "হাতিনি", "সিংহী"-র পাশে "বাঘিনি", "নারী"-র পাশে "মাগি", ইত্যাদি। "পাপিনী" বোধ হয় ঠিক থাকিবে, "সাপিনি" হ্রস্ব হইয়া যাইবে; "রজকিনী রামী" ঠিক থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু "নেতা ধোপানি"-র দুর্গতি অনিবার্য্য; "বারবিলাসিনী"-গণ স্বচ্ছন্দভাবেই বিরাজ করিবে আশা করি, কিন্তু "হতভাগিনি"-দের যে কি গতি হইবে তাহা আমি ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সরলতা ও uniformity সম্পাদনই নাকি সংস্কারকদিগের একমাত্র কাম্য। এই ঈ-উৎখাত দ্বারা তাঁহারা কি আশ্চর্য্য রূপ সরলতা ও uniformity সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই আপনারা পুলকিত হইবেন।

এখন কিন্তু শুনিতেছি যে পণ্ডিতগণ নাকি আবার একটু একটু করিয়া ঈ-এর দিকে হেলিয়া পড়িতেছেন; এমন কি ই-কারের অত বড় champion যে রবীন্দ্রনাথ (শুধু "কী" সম্বন্ধেই তাঁহার যা এক একটু দুর্ব্বলতা আছে), তাঁহার নিকটেও নাকি বাণান-কমিটির কয়েকজন ধনুর্দ্ধর ব্যক্তি ঈ-এর সপক্ষে কিঞ্চিৎ ওকালতী করিতে সম্প্রতি গিয়াছিলেন। শুনিলাম তাহাতে নাকি কবিবর বলিয়াছেন, "আবার কী ফ্যাসাদ বাধালেন,

আবার ঈ এনে জোটালেন ; যাহোক একটা বিকল্প টিকল্প করে দেবেন"। ঠিকই বলিয়াছেন। Back-sliding কদাপি মার্জ্জনীয় নহে। তাছাড়া বিপদ্ও আছে ; একবার সম্ভ সম্ভ মুক্তির আস্বাদ পাইয়া আমাদের অঙ্গনাকুল কি সহজে পুনরায় অবরোধের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবেন ? তাঁহারা যে সত্য সত্যই ফ্যাসাদ বাধাইবেন—ফেমিনিজ্‌ম্ জিন্দাবাদ্ !

তারপর মূর্দ্ধন্য ণ। মূর্দ্ধন্য ণ যে সঙ্গীনটি উচাইয়া রাখিয়াছে তদ্দৃষ্টেই পণ্ডিতগণ বোধ করি ভড়কাইয়া গিয়াছেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, ইঁহারা সব গান্ধীযুগের লোক ও অকপট গান্ধীভক্ত, স্মৃতরাং হিংস্র আকৃতির ঐ বর্ণটিকে সহ্য করিতে পারেন না। কারণ যাহাই হউক, কার্য্য সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা বা অনিশ্চয়তা নাই। সোজা হুকুম বাহির হইয়া গিয়াছে যে, নেহাৎ সংস্কৃত শব্দে "ণ" থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা শব্দ হইতে "ণ"-কে নির্ব্বাসন দিতে হইবে।

শ-ষ-স সম্বন্ধে ইঁহারা ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিতে রাজী—অর্থৎ মূল সংস্কৃত শব্দে যেরূপ হইবে তদনুযায়ী বাঙ্গালাতেও হইবে। কিন্তু ণ-ন সম্বন্ধে কোন কথাই শুনিতে ইঁহারা প্রস্তুত নহেন—সব "ন" হো জায়েগা। "স্বর্ণ" হইতে "সোণা", "কর্ণ" হইতে "কাণ", প্রভৃতি স্মৃস্পষ্ট ব্যুৎপত্তি সত্ত্বেও চলিবে না। সব "ন" দিয়া লিখিতে হইবে। শুধু কি তাই ? এমনকি "রাণী" পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি—তাহাকে লিখিতে হইবে নাকি "রানি", নিদানপক্ষে ঈ-কার বহাল হইলে "রানী", কিন্তু "রাণী" অচল। বলিলে হইবে কি যে "রাণী" শব্দের প্রয়োগে কোন রূপান্তর নাই ; চিরকাল বাঙ্গালাতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে ; প্রাকৃতেও এইরূপ—"রণ্ণী"? কার কথা কে শোনে ? পণ্ডিতদের দাপটে "রাণী"-র আজ এই হাল হইয়াছে। কি আর বলিব ? আজ ডেমক্রেসীর যুগ আসিয়াছে—রাণীদের আর বড় একটা কেহ গ্রাহ্য করে না। নচেৎ থাকিত মহারাণীর রাজত্ব—দেখিতাম কি প্রকারে গোলদীঘীর পাণ্ডারা রানী ময়রানী মেথরানী

ধোপানী নাপিতানীকে একাকার করিয়া ফেলেন? দয়াধর্ম্ম না থাকুক, সংস্কারক পাণ্ডাদের একটু loyalty, একটু gallantry, একটু chivalry-ও ত থাকিতে পারিত!

বস্তুতঃ সংস্কৃত ণত্ববিধানানুযায়ী বাঙ্গালাতে "ণ"-এর প্রয়োগ বহুল প্রচলিত। শুধু দেশজ শব্দে কেন, বিদেশী ভাষা হইতে আহৃত শব্দেও প্রায়শঃ এতদনুসারেই বাণান অবলম্বিত হয়; যথা, ট্রেণ, কর্ণোয়ালিস, গভর্ণমেণ্ট, ইরাণ, তুরাণ, কোরাণ, ইত্যাদি। এই সেদিন দেখিলাম রবিবাবু একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে কর্ণওয়ালিসের কর্ণে মূর্দ্ধন্য-এর-খোঁচা নিষিদ্ধ*—সম্ভবতঃ কর্ণ-পীড়া উৎপাদনের ভয়ে—কিন্তু দন্ত্য ন-এর দন্তক্ষতে বোধ করি কাহারও আপত্তি নাই। রবীন্দ্রনাথ নমস্য ব্যক্তি; তাঁহার কথার উপর কথা কওয়া মাদৃশজনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তাই সভয়ে বলি যে আমরা কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমল হইতে উক্ত লাটসাহেবের উক্ত প্রকার বাণানই দেখিয়া আসিতেছি, এবং বিনীত রাজভক্ত প্রজারূপে মহামান্য গভর্ণমেণ্টের সমস্ত আইন-কানুনই মানিয়া আসিতেছি, কিন্তু তজ্জন্য কৈ কাহারও কোন কর্ণপীড়া বা শিরঃপীড়া হইয়াছে এমনটা ত শুনি নাই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল যে বাণান-কমিটির কর্ত্তারা তাঁহাদের প্রস্তাবাবলীতে ভাষাজ্ঞানের যে রকমই পরিচয় দিয়া থাকুন না কেন, tactics-জ্ঞান এবং বিষয়বুদ্ধি যে তাঁহাদের খুবই টনটনে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহাদের দ্বিতীয় সংস্করণের গোড়াতেই দেখিতেছি যে তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই উভয়েরই একখানি রাজী-নামা যোগাড় করিয়াছেন।† বঙ্গসাহিত্যাকাশের রবিচন্দ্র উভয়কেই যখন তাঁহার পাকড়াই-

---

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বাংলা বানান" (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৩)।

† "বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ — ১লা আশ্বিন, ১৩৪৩

য়াছেন, তখন যে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" তাঁহাদের হুকুমগুলি তামিল হইবে সেবিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাক্ সে কথা।

আর এক কথা। একটি যুক্ত বর্ণ আছে তাহার প্রতিও পণ্ডিতেরা কিছু বাম—সেটি হইতেছে "ঙ্গ"। বঙ্গদেশীয় বলিয়াই কি তাহাদের ঙ্গ-এর উপরে এতটা বিতৃষ্ণা? হইতেও পারে; কারণ আমাদের intellectual-দিগের মধ্যে একটা anti-patriotic bias-এর বেশ রেওয়াজ আছে। কাজেই বঙ্গমাতার সন্তান কিনা, তাই তাঁহারা আপনাদিগকে "বাঙ্গালী" বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না। রবি বাবু ত পূর্ব্বেই গাহিয়া গিয়াছেন,

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ কর নি";

—সুতরাং "বাঙ্গালী" বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করা ত স্বাভাবিক; "বাঙ্গাল"-দের কথা ত বলাই নিষ্প্রয়োজন—কথাই আছে "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু"। সুতরাং আসুন আমরা সকলে পণ্ডিতবর্গের অনুজ্ঞাক্রমে সমস্বরে নির্দ্ধারণ করি, আমরা আর "বাঙ্গালী" নহি, আমরা "বাঙালী" —থুড়ি, "বাঙালি"; আমরা "বাঙ্গালা" ভাষা জানিনা, আমরা জানি "বাঙ্লা"—থুড়ি, "বাংলা" ভাষা। মাথায় পাগড়ী ঙ-এর জয়জয়কার; আর ং-এরও পোয়া বার! এমার্সনে পড়িয়াছিলাম যে প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্রেই নাকি একটা Law of compensation আছে। কথাটা খুবই ঠিক। তাই দেখুন পণ্ডিতেরা এক অনুনাসিক "ণ" বিতাড়ন করিতেছেন, তৎস্থলে আর এক অনুনাসিক "ঙ" আসিয়া আড্ডা গাড়িতেছে; এক অযোগবাহ বর্ণ বিসর্গকে তাড়াইতেছেন, অমনি অপর অযোগবাহ বর্ণ অনুস্বার আসিয়া হাজির। এ প্রকার ত হইবেই—কারণ, Nature abhors vacuum!

বাণান-পর্ব্বের অমৃতসমান পুণ্যকথা আপনাদিগকে কিছু কিছু শুনাইলাম। পুঁথি আর বেশী বাড়াইতে চাহি না; সময় সঙ্কীর্ণ এবং আপনাদের ধৈর্য্যও নিরবধি নহে। আর কিছু কীর্ত্তন করিয়াই আমি নিরস্ত হইতে চাই। বাণান-

কমিটি কি কি অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছেন—অর্থাৎ acts of commission গুলি—তাহার কতটা আঁচ এতক্ষণে আপনারা করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কি কি করেন নাই—অর্থাৎ acts of omission গুলি—তাহা একটু জানিবার আপনাদের কৌতূহল হইতে পারে। এবং সে কাহিনী সত্য সত্যই অতি বিচিত্র। শুনিতে পাই—আর শুধু শুনিতে পাই-ই বা বলি কেন, তাঁহাদের পুস্তিকাতে ছাপার অক্ষরে লিখিতই আছে—যে, আজকাল সাহিত্যে যে চল্‌তি ভাষার খুব রেওয়াজ হইয়াছে, সেই কথ্যভাষার রূপ বড়ই fluid, নানা জনে নানাপ্রকার লেখেন, বিশেষতঃ ক্রিয়াবিভক্তির রূপগুলি; এইগুলিকে standardize করিবার চেষ্টা করা উচিত, এবং সেই চেষ্টা করিতেই বাণান-কমিটির উদ্ভব—ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য নহে। কথাটা খাঁটি এবং উদ্দেশ্যও মহৎ। কিন্তু সেবিষয়ে কমিটি কাজ কতটা করিয়াছেন?

ধরুন দুই একটি উদাহরণ। কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় "বলিলাম" শব্দের মোটামুটি তিন রূপ দেখা যায়, "বল্লাম," "বল্লুম", "বল্লেম"। বাণান-কমিটির পুস্তিকার প্রথম সংস্করণে অনেক গবেষণার পর স্থির হইল যে "বল্লাম" পদটাই রাখা উচিত। বোধ করি কেহ কেহ ইহাতে বিচলিত হইয়া থাকিবেন। সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণে স্থির হইল তিনটাই চলিবে। তেম্‌নি, "মত—মতো", "খাটান—খাটানো", "কি—কী" দ্বন্দ্বেও প্রথম সংস্করণে ঠিক হইল যে প্রথমোক্ত পদগুলিই চলা উচিত। বোধ হয় কোন কোন নমস্য ব্যক্তি ইহাতে উচাটন হইয়া পড়িলেন; অম্‌নি দ্বিতীয় সংস্করণে স্থির হইল দুই-ই চলিবে। Standardization-এর কি দাপট! ফলে, কথ্যভাষার অবস্থা "যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্" হইয়াই রহিল। বাণান-কমিটির যত দাপট যত সঙ্কিকীর্ষা গিয়া পড়িল—to fresh fields and pastures new—অর্থাৎ বাঙ্গালা সাধুভাষার উপর—আর্য্যের উপর সূর্য্যের উপর, ধর্ম্মের উপর কর্ম্মের উপর, রাণীর উপর

কাণের উপর—কারণ বোধ হয় সাধুভাষার আজকাল আর কোন মা-বাপ বা মুরুব্বি বা champion নাই। আর যে জন্য কমিটির উৎপত্তি এবং যে বিষয়ে কিছু করিলে সত্যই উপকার হইত, সে সম্বন্ধে কমিটি কিছুই করিতে ভরসা বা ফুরসৎ পাইলেন না। ইহাই বাণান-কমিটির বিচিত্র ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত চুম্বক।

আর একটি ছোট্ট বিষয় উল্লেখ করিয়াই আমার বক্তব্য সারা করি। সেটা ঠিক বাঙ্গালা ভাষা সম্পর্কে নহে; অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালাতে লিপ্যন্তর বা transliteration সম্পর্কে। বিশ্বতশ্চক্ষু বাণান-কমিটির দৃষ্টি হইতে এই সামান্য বিষয়টুকুও এড়ায় নাই, এবং এসম্বন্ধেও তাঁহারা দুই চারিটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা সকলেই জানি যে এক ভাষার সকল ধ্বনি অপর ভাষাতে প্রায়ই ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না। যে স্থলে যায় না, সে স্থলে কাছাকাছি কোন ধ্বনি দিয়া প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট। যেমন ধরুন, বিলাতী সাহেবরা আমাদের ত-বর্গ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না; তাহারা "পরিত্রাণ"-কে "পরিট্রাণ" বলেন, "তুমি"-কে "টুমি" বলেন, ইংরাজীতে লিখিবার সময়ে "শাস্ত্র"-কে Shastra লেখেন, "বেদ"-কে Veda লেখেন, ইত্যাদি। লৌকিক ব্যবহারে ইহাতেই চলিয়া যায়—পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত diacritical চিহ্নাদির আবশ্যক করে না। কিন্তু আমাদের বাণান-কমিটি ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার ঠিক ঠিক ইংরাজী ধ্বনি বাঙ্গালাতে না প্রকাশ করিয়া ছাড়িবেন না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

ইংরাজীর "st" বর্ণসমাবেশ এপর্য্যন্ত আমার "ষ্ট" দিয়া চালাইতেছিলাম; হঠাৎ শুনি যে তাহাতে হইবে না, উহা একেবারে অশুদ্ধ; হইবে "স্‌ট" অথবা "স্ট"; অর্থাৎ আমাদের চিরপরিচিত "ষ্টেশন" কথাটি হইবে "স্‌টেশন" (যাহাকে সহসা "সটেশন" বলিয়াই মনে হয়) অথবা "স্টেশন"। মাদৃশ প্রাকৃত জনের মনে প্রশ্ন উদয় হয়, কি ফল হইল ইথে? বাঙ্গালায় "স"-এর ত দন্ত্য

উচ্চারণ নাই, শুধু দন্ত্যবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলেই দন্ত্য উচ্চারণ হয়, যেমন স্ত, স্থ; সুতরাং যে গলদ সেই গলদই ত রহিল। বাঙ্গালাতে পুরস্কার, স্খলন, স্পষ্ট, প্রভৃতিতেও ত দন্ত্য উচ্চারণ নাই, তবে "স্টেশন"-এ কি উপকার হইল? আর যদি দন্ত্য উচ্চারণই ধরিতে হয়, তবে "দন্ত্য" স ও "মূর্দ্ধন্য" ট-এর মিশ্রণ যে একেবারেই phonetic *mésalliance*! দেখিতেছি বাণানের সরলতা-সম্পাদনের ধান্দায় নূতন যুক্তবর্ণ সৃষ্টি করিতেও সংস্কারকদিগের কিছুমাত্র বাধে না।

তারপর আর একটি বর্ণ-বিকৃতি ইহারা আমদানী করিতে চাহেন, ইংরাজী z ধ্বনি বুঝাইবার জন্য। সচরাচর "জ" দ্বারাই বাঙ্গালাতে z বুঝান হইয়া থাকে। ইহা ঠিক প্রতিধ্বনি নহে বটে, কিন্তু যথেষ্ট অনুরূপ ধ্বনি—আমাদের বাঙ্গাল-দেশের জ-এর উচ্চারণ ধরিলে ত একেবারেই ঠিক ধ্বনি। ইঁহারা বলেন যে জ-এর নীচে একটা ফুট্‌কি দিয়া অর্থাৎ জ় দিয়া z বুঝাইতে হইবে। যদি আপনারা এই ফুট্‌কি-তত্ত্ব মানিয়া লয়েন তবে ইহার শেষ কোথায় তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। বাঙ্গালার জ যেমন ঠিক z নহে, বাঙ্গালার ফ-ও তেমনি f নহে, বাঙ্গালার ভ-ও তেমনি v নহে। বাঙ্গালার ফ ও ভ হইল explosive—আপনারা ভয় পাইবেন না, আমি কোন রাজদ্রোহাত্মক explosive-এর আমদানী করিতেছি না, ইহারা হইল phonetic explosive—অর্থাৎ ইহাদিগকে উচ্চারণ করিবার সময়ে ওষ্ঠদ্বয় আটকান থাকে, আর মুখের বায়ু হঠাৎ ঠোঁটদ্বয়কে ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে—তাই ইহারা বিস্ফোরক ধ্বনি বা explosive; কিন্তু f ও v উচ্চারণ করিয়া সময়ে ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে ঈষৎ ফাঁক থাকে, তাহার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু নিঃসৃত হয় এবং ঘর্ষণ জনিত ধ্বনি হয়, তাই ইহারা fricative। সুতরাং যদি z কে জ-এর নীচে ফুট্‌কি দ্বারা বুঝাইতে হয়, তবে f-কে ফ-এ ফুট্‌কি দ্বারা এবং v কে ভ-এ ফুট্‌কি দ্বারা বুঝাইতে হইবে। ইহাতেও সমস্যার শেষ নাই। এ সব যেন হইল—

কিন্তু zh-এর ধ্বনি, অর্থাৎ pleasure, vision, azure, ইত্যাদির ধ্বনি কি রকমে বুঝান যাইবে? এই সব phonetic অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা বিশ্ব-পণ্ডিতদিগেরই সম্ভবে।

সত্য সত্যই এই phonetics লইয়া কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকম বাড়াবাড়ি হইতেছে। আমি seriously একটা কথা বলি। এখানে আজকার এই সভাতে ত আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা ব্যক্তি উপস্থিত আছেন দেখিতেছি। আমি বলি কি, তাঁহারা একটা কাজ করুন। আমার প্রীতিভাজন বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ বাবু এখন ভাইস্‌-চ্যান্সেলর আছেন; তাঁহাকে তাঁহার নামটির আদ্যংশ বাঙ্গালা উচ্চারণানুযায়ী phonetic বাণান "শামা" ভাবে লিখিতে পরামর্শ দিউন; আর Calcutta University-র Calcutta শব্দটিকে Kalkutta ভাবে লিখুন—যেমন জার্ম্মাণরা লিখিয়া থাকে। তারপর বিশ্বপণ্ডিতদিগের সহিত phonetics চর্চ্চা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।

আপনারা আমায় মাপ করিবেন; হয়ত রহস্য করিয়া আপনাদের মূল্যবান্‌ সময়ের অনেকটা আমি অপব্যয় করিয়াছি। কিন্তু রহস্য না করিয়াই বা করি কি? এমন সব আজগুবি প্রস্তাব এমন গম্ভীর ভাবে পণ্ডিতম্মন্য ভঙ্গীতে ইহারা আনয়ন করিয়াছেন যে সত্যই হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু গম্ভীর ভাবে দেখিতে গেলে ইহা ঠিক রহস্যের বিষয় নহে; পরন্তু পরিতাপের বিষয়। কারণ ভাষায় প্রচলিত যে সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ—যে রূপের পশ্চাতে কত ইতিহাস, কত কাহিনী, কত বিবর্ত্তন রহিয়াছে—সেই রূপের উপর এত লঘুচিত্ততার সহিত হস্তক্ষেপের ধৃষ্টতা দর্শনে বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই বেদনা উপস্থিত হয়। একেই ত চারিদিকে লেখাপড়ার প্রতি একটা অবহেলা, বিদ্যার্জ্জনের প্রতি একটা শৈথিল্য দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় ভাষার দিক্‌ দিয়াও যদি বিশুদ্ধির প্রতি, accuracy-র প্রতি একটা নিষ্ঠা একটা শ্রদ্ধা না থাকে,

এবং যেখানে ভাষার রূপ সুসম্বদ্ধ সুদৃঢ়, সেখানেও যদি অনিশ্চয়তা ও বিকল্প ও বিশৃঙ্খলা খামখেয়ালীভাবে আনয়ন করা হয়, এবং সেই বিশৃঙ্খলা আনয়নের প্রধান উদ্‌যোক্তা যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ই হইয়া উঠেন, তবে ত সত্যই গভীর পরিতাপের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সব কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনেক সময়ে মনে হয়, বুঝিবা বাঙ্গালা ভাষা যে এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার ভিতরে আসিয়া পড়িল, ইহা তাহার পক্ষে অমঙ্গলেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইল; পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে স্বাধীন ভাবে থাকিলে ইহার স্বাভাবিক গতি ও বিবর্ত্তন অব্যাহত ভাবে চলিতে পারিত। সে যাহাই হউক, আমার বিনীত নিবেদন এই যে এই ভাষাসংস্কার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে চলিতে থাকুন, শ্রদ্ধার সহিত সম্ভ্রমের সহিত অগ্রসর হউন, এবং দাম্ভিকতা ও হঠকারিতা পরিহার করুন। তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সুফলপ্রদ হইবে।

ফাল্গুন, ১৩৪৩।

বানান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক

বাণান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক

তখন সবে চন্দননগরের সাহিত্য সম্মিলন সারা হইয়াছে। খবর পাইলাম যে তথাকার বাঙ্গালা বাণান আলোচনার বৈঠকের বক্তৃতাদির ফলেই বোধ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণান-কমিটি তিনজন ভদ্রলোককে কমিটিতে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন—ডাঃ শহীদুল্লা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এবং আমি। অবিলম্বেই কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যথারীতি একখানি আমন্ত্রণ-লিপি হস্তগত হইল। আমিও যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম, এবং বাণান-কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশনেই যোগদান করিব বলিয়া স্থির করিলাম।

অধিবেশনের দিন পৌছিতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল—সচরাচরই আমার সভাসমিতিতে পৌছিতে আধ-ঘণ্টা খানেক বিলম্ব হয়। আর্য্যমতে আমি উহার কৈফিয়ৎ দিই—"কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ" এই শাস্ত্র-বাক্য আওড়াইয়া; অবশ্য আধুনিক মতে standard time বা আদর্শ

কালপরিমাণের দোহাই দিয়াও আমি রেহাই পাইতে অধিকারী। সে যাহাই হউক, সেদিন আমি বিশেষ সযত্নভাবে তাড়াতাড়ি করাতে বোধ করি মিনিট দশেকের বেশী late হই নাই। কলুটোলার পাশে গোলামখানার আশুতোষ বিল্ডিংএর দোতলায় ছোট্ট একটি কামরা; তন্মধ্যে প্রায় ঘরজোড়া লম্বা টেবিল; তাহারই চারিপাশে সভ্যগণের বসিবার স্থান। আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখন দেখি যে আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; সব সভ্য উপস্থিত নাই, তবে অনেকেই আসিয়াছেন।

সভ্যাদিগের বর্ণনা দিবার পূর্ব্বে বোধ করি বাণান-কমিটির উৎপত্তির একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতা বিশ্ব-বিষ্ঠালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন স্থির করিলেন যে অতঃপর বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত অধ্যেতব্য বিষয়ের পঠন-পাঠন-পরীক্ষা ইত্যাদি হইবে, তখন স্বভাবতঃই তাঁহাদের খেয়াল হইল যে গণিত, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বাঙ্গালাতে পড়াইতে হইলে এই সব বিষয়ের পরিভাষা বাঙ্গালাতে প্রণয়ন করা আবশ্যক। সুতরাং একটি পরিভাষা-কমিটি গঠিত হইল। তাহাতে কতক কতক ভাষাবিদ্ লোক রহিলেন, এবং কতক কতক বিজ্ঞানবিদ্‌ও রহিলেন, এবং তাঁহাদের কাজ হইল পরিভাষা গঠনে সাহায্য করা। এমন সময়ে কবিবর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আর্‌জি পেশ করিলেন যে বাঙ্গালা ভাষায় যে চল্‌তি ভাষার মৌখিক রূপ আজকাল কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রাতেই সাহিত্যে চালু হইয়াছে, সেই রূপগুলির বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া standardize করিবার চেষ্টা করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই পরিভাষা-কমিটিরই উপরে বাঙ্গালা বাণান নিয়ন্ত্রণের ভারও চাপাইয়া দিলেন। তাঁহারাও বোধ করি নিজেদের jurisdiction-এর এই হঠাৎ প্রসারে পুলকিত হইয়া অতি খোস মেজাজে কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন যে যখন একবার ক্ষমতাই পাওয়া গিয়াছে, তখন কি মৌখিক, কি লৈখিক, কি সাধু কি অসাধু, সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালার বাণানই এবার

সায়েস্তা করিতে হইবে; সুতরাং নানাবিধ অভিনব প্রস্তাব পেশ এবং পাস করিতে লাগিলেন; এবং সেই সব প্রস্তাবাবলী-সমন্বিত একখানি পুস্তিকা বাহির করিলেন ১৯৩৬-এর মে মাসে। কিছুদিন পরে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। ইহাতে নূতন একটি জিনিষ লক্ষিত হইল—কবি রবীন্দ্রনাথ এবং ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এই সব প্রস্তাবে অনুমোদন স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইজন সাহিত্যরথীর স্বাক্ষরিত অনুমোদন সত্ত্বেও বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে বাণান-কমিটির অদ্ভুত অদ্ভুত প্রস্তাবে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার ফলে পুনরায় প্রস্তাবাবলী শোধন ও পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বাণান-কমিটির অধিবেশন হইতে লাগিল। এই প্রকার যখন অবস্থা তখন আমি অধিবেশনে যোগদান করিতে আহূত হইলাম।

উপস্থিত হইয়া দেখি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় আসিয়াছেন; ইনি রসায়নের এম্. এ., খ্যাতনামা রস-সাহিত্যিক "পরশুরাম", বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌সের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার, "চলন্তিকা"-নামক বাঙ্গালা অভিধানের সম্পাদক, এবং বর্ত্তমানে পরিভাষা-কমিটি তথা বাণান-কমিটির সভাপতি। আর উপস্থিতের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ইনি পদার্থ-বিজ্ঞানের এম্. এ., প্রেসিডেন্সী কলেজে উক্ত বিষয়ে ডেমন্‌ষ্ট্রেটর, বোলপুর বিশ্বভারতীর সেক্রেটারী ও গোলদীঘী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণান-কমিটিরও সেক্রেটারী, এবং এই উভয় বিশ্বের ভার যুগপৎ তাঁহার স্কন্ধে আপতিত হওয়াতে স্বভাবতঃই চাল কিছু গুরুগম্ভীর; আর ছিলেন ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শহীদুল্লা, উভয়েই পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিক, একজন কলিকাতায় এবং অপরজন ঢাকায় অধ্যাপনা করেন। এই চারিজনকেই বিশেষ কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত দেখিলাম, যেন সভার মুরুব্বি মতন। আরও অনেকে ছিলেন; সকলের নাম মনে নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুখব্যাদান-পূর্ব্বক বিশেষ

উচ্চবাচ্য করিতে দেখিলাম না ; বোধ করি সভাশোভন করাই উঁহারা যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকিবেন।

আমি যখন পৌঁছিয়া আসন গ্রহণ করিলাম, তখন শুনি আলোচনা চলিতেছে "বৌ" সম্বন্ধে ; অর্থাৎ ডাঃ শহীদুল্লা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা শব্দে ঐ-কার ঔ-কার আর থাকিবেনা, তৎস্থলে অই, অউ, এই প্রকার লিখিতে হইবে, যেমন,"বৌ"-এর স্থলে "বউ," "দৈ"-এর স্থলে "দই", ইত্যাদি। আমি চুপ করিয়া আলোচনা শুনিতে লাগিলাম ; ভাবিলাম যে ইদানীং বড় বেশী বক্ বক্ করিয়া বক্‌তিয়ার খিলিজী দুর্নামটি অর্জ্জন করিয়াছি, তাই কিয়ৎকাল বাক্‌সংযম পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের গবেষণাই শোনা যাক। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর শুনিলাম শহীদুল্লা সাহেব বলিলেন, "কি বলেন সুনীতি বাবু, তাহলে এবিষয়ে general agreement হল ত ?"

সুনীতি বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

সভাশোভনকারী যাঁহারা বসিয়া ছিলেন তাঁহারাও "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" জ্ঞাপন করিলেন। আমি ত মনে মনে প্রমাদ গণিলাম, "বৌ" যে যায় যায় ! তাই অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিষয়ে আপনাদের general agreement হল ?"

সুনীতি বাবু আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। আমি বলিলাম, "সর্ব্বনাশ ! এমন কাজও করবেন না। শেষকালে আপনারা বৌ-বর্জ্জন আরম্ভ করলেন ? এ অতি dangerous ! কেন, 'বৌ' চল্‌বে না কেন শুন্‌তে পাই কি ?"

সুনীতি বাবু বলিলেন, "দেখুন বৌ-এর চাইতে বউ-ই দেখতে ভাল"।

আমি নাছোড়বান্দা হইয়া বলিলাম, "মশাই, দেখতে ভাল হলেই ত চলবেনা, তালাক দেবার আগে বৌ-এর দোষটি কি তা ত বুঝিয়ে বলতে হবে। হ্যাঁ, স্বীকার করি বাংলাতে বৌ-বউ দুপ্রকারই চলছে। কিন্তু আপনারা না phonetics-বাদী ? Phonetics-ই যদি দেখতে যান,

তাহলে কিন্তু বৌ-ই ঠিক, কারণ ওর উচ্চারণ diphthongal —ওটা monosyllabic—এক নিঃশ্বাসে 'বৌ' বলে আমরা উচ্চারণ করি, 'ব-উ' বলে dissyllabic ভাবে আলাদা আলাদা উচ্চারণ করিনে।"

সুনীতি বাবু বলিলেন, "দেব বাবু, ও কথা বল্লে চলবে কেন? ওরকম diphthong বাংলা ভাষায় ঢের আছে, খাই, যাই, নেই, যেই, শুই, থুই, কেউ, ফেউ, ঘেউ ঘেউ, হাঁউ মাঁউ খাঁউ, ইত্যাদি। আমি গুণে দেখেছি যে ওরকম ছাব্বিশটা diphthong বাংলায় পাওয়া যায়।"

আমি বলিলাম, "দেখুন, আপনারা পণ্ডিত লোক, philologist; আপনারা পারেন ত সেই ছাব্বিশটা diphthong-এর ছাব্বিশটা phonetic symbol বার করুন না। তা বলে যে দুটো আমাদের রয়েছে সে দুটো মাঠে মারা যাবে, এর মানে কি?"

সুনীতি বাবু তখন বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে বিকল্প হোক্।"

আমি বলিলাম, "তা বেশ, আপনাদের যা ইচ্ছে—বিকল্পই করুন। সঙ্কল্প ত কোন বিষয়েই বিশেষ দেখতে পাচ্ছিনে আপনাদের। কিন্তু একটা কথা বলি। দুটো একটা উদাহরণের ওপরই যেন কোন বিষয়ে generalize করে বসবেন না। হ্যাঁ, 'বৌ' 'দৈ' এই দুটি শব্দের 'বউ' 'দই' রূপও চল্‌তি আছে বটে; কিন্তু আপনারা general agreement করে যে ফতোয়া দিতে যাচ্ছিলেন যে, অসংস্কৃত সব বাংলা শব্দেই ঐ-কার ঔ-কার বর্জ্জন করতে হবে, তার শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় তা একবার ভেবে দেখেছেন? এই ফতোয়া মানতে গেলে যে, অতঃপর ফুলের ওপর শুধু 'মউমাছিরা' গুঞ্জন করবে, কুকুরগুলো শুধু 'ভউ ভউ' করে ডাক্‌বে, ছেলেরা শুধু 'দউড়া দউড়ি' করবে, আর রাস্তার 'চউমাথায়' 'হই হই রই রই' শুনে পুলিশ 'ফউজ' তাড়া করে আসবে! দেখুন, ভাষাগত কোন rule জারী করতে গেলে একটু ভেবেচিন্তে করা দরকার—implication গুলো একটু বিবেচনা করা দরকার—দুটো একটা instance-এর ওপরে induction চলেনা।"

এই সজোর ওকালতীর ফলে যাহোক "বৌ" ত কোনমতে টিঁকিয়া গেল।

তখন শহীদুল্লা সাহেব আর এক দফা প্রস্তাব ঝাড়িলেন। তিনি বলিলেন যে, যে সব অসংস্কৃত বাঙ্গালা শব্দের আত্মক্ষরে "ক্ষ" আছে, তৎস্থলে "খ" হউক; এবং নিজেই দৃষ্টান্ত দিলেন, যেমন ক্ষ্যাপা, ক্ষেত, ক্ষুর, ইত্যাদিকে অতঃপর লেখা হউক খ্যাপা, খেত, খুর, ইত্যাদি। সুনীতি বাবু আবার ইহার উপর amendment আনিলেন যে "লক্ষ্ণৌ"-কেও "লখ্নৌ" ভাবে লেখা হউক। কেহ কেহ আপত্তি করিলেন, কারণ ঐ নগরের নামটি রামায়ণের লক্ষ্মণের নামের সহিত জড়িত। ভাষাতাত্ত্বিকগণ সে কথা মোটে আমলের মধ্যেই আনিলেন না। রামায়ণ! সে আবার একটা ঐতিহাসিক authority নাকি! কৈ, মহেঞ্জোদড়োর কোন ভাঙ্গা বাসনের গায়ে কি লক্ষ্মণের কোন ফটো পাওয়া গিয়াছে? অতএব লক্ষ্মণ বাতিল; সুতরাং "লখ্নৌ"।

আমি আবার সভয়ে বলিলাম, "আচ্ছা, শহীদুল্লা সাহেব, 'ক্ষ' কে তাড়িয়ে আপনি 'খ' আমদানী করতে চান কেন বলুন ত? প্রথমতঃ ত ক্ষ-এর ধ্বনি ঠিক খ-এর ধ্বনি নয়, ওর উচ্চারণ অনেকটা কৃখ-এর মত। দ্বিতীয়তঃ, যে শব্দগুলো আপনি উল্লেখ করলেন, তাতে যদি 'ক্ষ' থাকে তাহলে শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি সহজেই বোঝা যায়; যেমন 'ক্ষ্যাপা'—'ক্ষিপ্' ধাতুর থেকে এসেছে; 'ক্ষেত'—'ক্ষেত্র'-এর থেকে এসেছে। বেশ সহজ এবং সুন্দর। 'ক্ষেত'-এর বদলে 'খেত' লিখলে, কথাটা যে কোত্থেকে এসেছে তাই মালুম করা শক্ত হবে। আর দেখুন শহীদুল্লা সাহেব, আপনি বল্লেন 'ক্ষুর'। হ্যাঁ, 'খ' দিয়ে এক রকম 'খুর' আছে বটে; কিন্তু তা গরুর পায়ে থাকে, তা দিয়ে দাড়ি কামান চলেনা।"

এই কথা বলাতে শহীদুল্লা সাহেব যেন একটু impressed হইলেন মনে হইল, কারণ তিনি তাঁহার নিবিড় শ্মশ্রুদামের মধ্যে ঘন ঘন করসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আমি একটু উৎসাহিত হইয়া বলিলাম,

"আর দেখুন, আপনি বল্লেন না, অসংস্কৃত শব্দে এই রকম সংস্কার করতে হবে? এবং বল্লেন 'ক্ষুর'। 'ক্ষুর' কিন্তু একেবারেই সংস্কৃত শব্দ—উপনিষদে এর প্রয়োগ আছে—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।"

তখন ডাক্তার সাহেব "তাই ত, তাই ত, ওটা সংস্কৃত?" বলিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "দেখুন ডাক্তার সাহেব, আর যাই করুন, ক্ষুর নিয়ে আর নাড়াচাড়া করবেন না।"

এবার সুনীতি বাবু এক প্রস্তাব তুলিলেন—বোধ করি শহীদুল্লা সাহেবকে একটু অপ্রতিভ দেখিয়া। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, "যদ্"-শব্দজ যাবতীয় শব্দ বাঙ্গালাতে "জ" দিয়া লেখা উচিত; অথাৎ যে, যাহা, যিনি, যেমন, ইত্যাদিকে লিখিতে হইবে জে, জাহা, জিনি, জেমন, ইত্যাদি। প্রস্তাব শুনিয়া ত আমার চক্ষু চড়ক-গাছ! সুনীতি বাবু বলেন কি? প্রথমটা ত প্রত্যয়ই হইল না। শেষে মনে পড়িল যে উঁহার পক্ষে এপ্রকার মৌলিক প্রস্তাব আনয়ন করা অসম্ভব নহে; কারণ ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং হিন্দু-সভার বিশিষ্ট সভ্য হইলেও উনি কেমালিষ্ট অর্থাৎ Roman script-এর পাণ্ডা, সুতরাং অবশ্যই এবংবিধ রোমাঞ্চকর প্রস্তাব উঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করিতে পারি। আমি তবুও সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন 'জ' দিয়ে লেখা হবে?"

উত্তর হইল, "প্রাকৃতে তাই হয়।"

এবার আমি একটু উত্তেজিতই হইয়া গেলাম; বলিলাম, "প্রাকৃতে কি হয় তা নিয়ে ত কথা হচ্ছে না—এটা ত philology ক্লাস নয়। কথা হচ্ছে বাংলা নিয়ে। বাংলা ভাষাও ত দুশ' পাঁচশ' বছর ধরে চলে আসছে—বাংলার শিষ্টপ্রয়োগে কি ব্যবহার সেইটেই ত দেখতে হবে। আর তাছাড়া, ওশব্দগুলো যে সংস্কৃত 'যদ্' শব্দ থেকে এসেছে তার ত সন্দেহ নেই। যদি

প্রাকৃতে সংস্কৃত form-টাকে vulgarize করেই থাকে, এবং বাংলাতে যদি মূলের শুদ্ধ form-টাই অবলম্বিত হয়ে থাকে, তবে কি জন্যে আমরা সেই মূলানুগত শুদ্ধ form ত্যাগ করে vulgar form-টাই লুফে নেব?"

সুনীতি বাবু বলিলেন, "তা বাংলার কথা বলছেন? বাংলার পুরোণো পুঁথিতেও আপনি এন্তার জ-ওয়ালা যে, যাহা, ইত্যাদি পাবেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "বটে! এই কথা? আপনিও বহু অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের চিঠিতে দেখতে পাবেন যে 'অশেষপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন' লিখতে 'অশেষ' কথাটি 'অসেস' ভাবে লেখা রয়েছে। আর আদালতের নথীপত্তর দেখেছেন কোন দিন? তাতে দেখবেন যে 'পিতা' কথাটি ভ্রমক্রমেও তাতে ওভাবে লেখা হয় না, বরাবর 'পীতা' লেখা থাকে। দেখুন, ভাষা ত fool-proof করা সহজ নয়। কতগুলো fool যদি না জেনে শুনে কতগুলো blunder করে, তাদ্বারা ভাষার বাণান regulated হয় না। হ্যাঁ, আর এক কথা। প্রাকৃতের কথা বলছিলেন। তা প্রাকৃত ত আর এক রকম নয়—বিভিন্ন প্রাকৃতে বিভিন্ন রকম প্রয়োগ। সত্যি বটে যে মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রাকৃতে 'য' স্থানে 'জ' হয়; কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে—যে প্রাকৃতের সঙ্গেই বাংলা ভাষার নিকটতম সম্বন্ধে—তাতে 'জ' স্থানে 'য' হয়। সুতরাং পুরোণো পুঁথিতে যে এসব স্থলে কোথাও কোথাও 'জ' দেখা যায়, তা প্রাকৃত প্রয়োগের অনুসরণে হয় নি, নেহাৎ অজ্ঞতা বা অসাবধানতার জন্যেই হয়েছে, এবং সেগুলো ভুলই। তারপর, প্রাকৃত ত খুব বলছেন। যখন 'ণ' বাতিল করে 'রাণী' 'কাণ' 'সোণা' তে 'ন' বসাতে যান, তখন ত কৈ প্রাকৃতের কথা আপনাদের স্মরণ থাকে না? শুধু এক পৈশাচী প্রাকৃতে ছাড়া, আর কোন প্রাকৃতেই যে 'ন' একদম নেই, একেবারেই যে 'ণ'-এর রাজত্ব।"

এই কথাতে রাজশেখরবাবু ছোট্ট একটু প্রশ্ন করিলেন, "দেব বাবু, প্রাকৃত কি অনেক রকম আছে নাকি?"

বাণান-কমিটির সভাপতির মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি ত অবাক্। আমিও সংক্ষেপে বলিলাম, "হ্যাঁ, সাহিত্যে ব্যবহৃতই ত চার রকম প্রাকৃত পাওয়া যায়, তাছাড়া মৌখিক ব্যবহারে ত কতই আছে।"

এই তুমুল আপত্তিতে বিচলিত হইয়া সুনীতি বাবু বলিলেন, "যাক্‌গে। আপনারা আমার প্রস্তাব না নিন না-ই নিলেন। আমি নিজে কিন্তু এই ভাবে লিখব।"

আমি বলিলাম, "আপনি নিজে স্বচ্ছন্দে যা-ইচ্ছে করতে পারেন। ভাষার ওপর outrage ত Penal Code-এর কোন ধারার মধ্যে পড়ে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় বোধকরি এইসব আজগুবি প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে পারেন না—unless it chooses to become a Lunatic Asylum।"

এই সময়ে রাজশেখর বাবু আর এক কথা তুলিলেন; বলিলেন, "দেখুন দেব বাবু, বিসর্গ নিয়ে কি করা যায় বলুন ত? আপনি চন্দননগরে বলেছেন যে পদান্তের বিসর্গ তুলে দিলে 'ক্রমশঃ' শেষটা 'লোমশ' মুনিতে পরিণত হবে বাংলা উচ্চারণে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। এবিষয়ে কোন একটা রুল টুল করা যায়?"

আমি বলিলাম, "হঠাৎ off-hand একটা rule ঠিক বার করতে পারব কিনা জানিনে। তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে বাংলায় সংস্কৃতের থেকে আহৃত বিসর্গান্ত শব্দগুলোকে মোটামুটি দুটো পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে—কতগুলো বিশেষ্য এবং বাকীগুলো অব্যয়। দেখা যায় যে বিশেষ্য শব্দ-গুলোতে বাংলায় বিসর্গ একেবারেই লোপ পেয়েছে—ব্যবহারেতে এবং উচ্চারণেতে—যেমন, তেজঃ (তেজ), মনঃ (মন), চক্ষুঃ (চক্ষু), আয়ুঃ (আয়ু), ইত্যাদি। এদের বিসর্গ revive করবার কোন দরকার নেই। কিন্তু অপর পর্য্যায়ের শব্দগুলো, যেমন, পুনঃপুনঃ, ক্রমশঃ, বস্তুতঃ, ইত্যাদি, এরা অব্যয় শব্দ, এদের বিসর্গ থাকাই উচিত—প্রয়োগও রয়েছে তাই এবং উচ্চারণেও বিসর্গের রেশ বেশ টের পাওয়া যায়। এই সহজ distinction করলেই চলতে পারে।"

রাজশেখর বাবু বলিলেন, "তা কি করে হয় দেব বাবু? 'পুনঃপুনঃ', 'ক্রমশঃ', 'বস্তুতঃ', না হয় অব্যয় হল, কিন্তু 'প্রাতঃ' ত আর অব্যয় নয়! সেখানে ত আপনার এ নিয়ম চলবে না।"

আমি ত একেবারে স্তম্ভিত। "চলন্তিকা"-নামক অভিধান যিনি সম্পাদন করিয়াছেন, বাণান-কমিটিতে দেড় বৎসর ধরিয়া যিনি সভাপতিত্ব করিতেছেন, ভাষার বাণানের নয়া নয়া রুল যাঁহারা জারী করিতেছেন তাঁহাদের যিনি কর্ত্তা, তিনি বলেন কিনা, "'প্রাতঃ' ত আর অব্যয় নয়!" আমি বলিলাম, "বলেন কি রাজশেখর বাবু? 'প্রাতঃ' ত অব্যয়ই।"

উত্তর হইল, "'প্রাতঃ' কি করে অব্যয় হল দেব বাবু? 'প্রাতঃ' মানে ত morning!"

আমি আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "মানে ত morning ঠিকই বলেছেন; কিন্তু সংস্কৃতে ত শুধু মানে দিয়ে অব্যয় ঠিক হয় না। সংস্কৃতে 'প্রাতঃ' 'সায়ং' 'নক্তং' 'দিবা' এসব বেবাকই যে অব্যয় —ব্যাকরণকৌমুদীতে লেখা আছে।"

ইহার পর কথা উঠিল রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বিষয়ে। এই বিষয়েই বাণান-কমিটি একেবারে adamant—"ধর্ম্ম" "কর্ম্ম" ইহারা কিছুতেই মানিবেন না। অন্য সব প্রস্তাব উঠিয়া যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু বর্ণদ্বিত্বের ক্ষেত্রে একেবারে not নড়ন, not চড়ন, not কিচ্ছু। কারণ, এইটুকু সংস্কারও যদি তাঁহারা না করিতে পারিলেন, তবে এতদিন বাসয়া তাঁহারা করিলেন কি? বাণান-কমিটির *raison d'être*-ই যে তবে বিপন্ন হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও compromise চলিবে না, বিকল্প চলিবে না—একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা।

আমি পূর্ব্বে চন্দননগরে যেমন বলিয়াছিলাম এখনও তাই বলিলাম যে, বর্ণদ্বিত্বের আসল কারণ ধ্বনিতত্ত্বমূলক অর্থাৎ phonetic, তাই সংস্কৃতে এস্থলে বিকল্পে বর্ণদ্বিত্ব গৃহীত হইয়াছে, এবং বাঙ্গালাতে একেবারেই

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যদি কমিটি সরলতা-প্রয়াসে একবর্ণাত্মক বাণান recommend করিতে চাহেন, তবে অবশ্যই করিতে পারেন; কিন্তু বিকল্প ত রাখিতেই হইবে। চারুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, চারু বাবু, আমি আপনাদের কথা ভাল বুঝতে পারছিনে। আপনারা বলছেন যে রেফের পরে দ্বিত্ব বাণান চলবে না। চলবে না কথাটার মানে কি? ধরুন আমি একখানা বই University-র কাছে পেশ করি approval-এর জন্যে, এবং তাতে লেখা থাকে 'পূর্ব্ব, 'সর্ব্ব', ইত্যাদি। তাহলে সে বাণান আপনারা কাটবেন?"

চারু বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, কাটব।"

এবার অতি অপ্রত্যাশিত দিক্ হইতে আমার সমর্থন আসিল; হঠাৎ শহীদুল্লা সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "চারু বাবু, এ কথাটা আপনি কি বল্লেন? শব্দটা হল সংস্কৃত, পাণিনি allow করে গেছেন, আপনি কি করে কাটেন?"

চারুবাবু যেন একটু মুষড়িয়া গেলেন। আমি বলিলাম, "দেখুন চারু বাবু, বিলিতী একটা কথা আছে শুনেছি—The Parliament can do everything but make a woman a man and a man a woman; আমারও তেম্নি মনে হয়, The University can do everything but make a right form wrong and a wrong form right। কি বলেন? ভাষার ব্যাপারে একটু ধীরে সুস্থেই চলতে হয়। জোর জবরদস্তির এ সব ক্ষেত্র নয়।"

তারপর উঠিল ঈ-কারের কথা। শহীদুল্লা সাহেব বলিলেন, "দেব বাবু, আপনি রাঁচির বক্তৃতায় ঈ-কারকে অবগুণ্ঠন বলেছেন?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ। আপনি সে বক্তৃতা পড়েছেন দেখছি।"

রাজশেখর বাবু বলিলেন, "আমাদেরও মনে হচ্ছে যে ঈ-রূপটাই বাংলাতে বেশী চল্তি। ঐটাকে চালু করলেই কাজ সহজ হয়। সংস্কৃতে

ওরকম আছে বলে একথা বলছিনে। সংস্কৃত ত আমরা মানিই নে। এবিষয়ে কি করা উচিত আপনার মনে হয়?"

আমি বলিলাম, "এর আর করাকরি কি? সংস্কৃতে 'স্ত্রীত্বাদীপ্' হয়, তার দেখাদেখি বাংলাতেও সেই প্রয়োগই অধিকমাত্রায় প্রচলিত; মামী, খুড়ী, মাসী, পিসী, ইত্যাদি। সেইটেই সোজাসুজি adopt করবেন। আর 'ইন্' ও 'ণিন্'-প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের প্রথমার এক বচনের গুণী, জ্ঞানী, দায়ী, বাদী, প্রতিবাদী, উপকারী, প্রভৃতি শব্দের দেখাদেখি বাংলাতেও ঐ জাতীয় শব্দ—পাখী, হাতী, বাঙ্গালী, জাপানী, ডাক্তারী, ওকালতী, প্রভৃতি ঈ-কার করে দেবেন। বাংলা ব্যবহারেও আছে প্রায় সেই রকম। খুব সহজে uniformity হবে।"

চারু বাবু এবার বলিয়া উঠিলেন, "মাসী-পিসীর কি হবে?"

আমি বলিলাম, "কেন, ঈ-কার হবে।"

চারু বাবু বলিলেন, "দেব বাবু, তা কি করে হয়? মামী কাকী খুড়ী জ্যেঠী না হয় 'স্ত্রীত্বাদীপ্'-এর নজীরে ঈ হল, কিন্তু মাসী পিসী ত আর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্-প্রত্যয় করে হয়নি?"

আমি বলিলাম, "দেখুন চারু বাবু, সেটুকু ব্যাকরণ-জ্ঞান আমার আছে। 'মাসী' 'পিসী' যে 'মাতৃস্বসা' 'পিতৃস্বসা' থেকে এসেছে এ সংবাদ আমার জানা আছে। তবে কিনা বাংলাতে 'মাউসা' বা 'মেসো'র স্ত্রীলিঙ্গ 'মাসী' এবং 'পিসা'র স্ত্রীলিঙ্গ 'পিসী' ভাবেই কথা দুটোর ব্যবহার হয়। সংস্কৃতে মেসোপিসে নেই। কাজেই এসব স্থলেও ঈ-কার চালানতে কোন আপত্তির কারণ নেই—বাণানটাও বেশ uniform মত হবে।"

এবার চারু বাবু মরীয়া হইয়া বলিলেন, "কিন্তু রবি বাবু যে হ্রস্বই-কার দিয়ে 'মাসি' 'পিসি' লেখেন। কোন ছেলে যদি রবিবাবুর বাণান লেখে তা হলে সেটা কাটি কি করে?"

আমি আর প্রতিশোধ লইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না ; বলিয়া ফেলিলাম, "এ কি কথা বল্লেন চারুবাবু, আপনি পাণিনি কাটতে সাহস পান, আর রবিঠাকুর কাটতে পারবেন না ? ঘ্যাঁচ্ করে কেটে দেবেন।"

চারুবাবু নির্ব্বাক্ হইলেন, কিন্তু সুনীতি বাবু বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, তা যেন হল। কিন্তু ঝি, দিদি, এ সবের কি হবে ?"

আমি বলিলাম, "কেন, যা আছে তাই থাকবে। এদের যখন হ্রস্ব-ই-কারই প্রচলিত প্রয়োগ, তাই চলবে। একথা ত আমি বলিনে যে মেরে কেটে সবই ঈ-কার করতে হবে। সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গে 'নদী' শব্দ যেমন আছে, তেম্‌নি আবার 'মতি' শব্দও আছে। স্ত্রীলিঙ্গে যে ঈ-কার ছাড়া হতেই পারবে না, এমন কথা কে বল্লে ?"

সুনীতি বাবু বলিলেন, "কিন্তু আপনার যুক্তি মতে ত ঈ-কারই হওয়া উচিত ; 'দাদা'র স্ত্রীলিঙ্গ 'দিদি'—সুতরাং 'দিদী' হওয়া উচিত।"

আমি বলিলাম, "দেখুন, দাদার স্ত্রীলিঙ্গ ঠিক 'দিদি' নয়, সেটা হচ্ছে 'বৌদিদি'—আজকাল তরুণমহলে সংক্ষেপে 'বৌদি'। কিন্তু সে কথা যাক্। আমি ত বরাবর এই কথাই বলে আসছি যে, যে বাণান একেবারে প্রচলিত তাকে নিয়ে নাড়া চাড়া করা উচিত নয়। তাই 'দিদি' 'ঝি' 'বিবি' এসবই চলবে।"

সুনীতি বাবু বলিলেন, "কিন্তু আমি ত 'ঝী' এই রকম অর্থাৎ ঈ-কার দিয়েই লিখি।"

আমি বলিলাম, "আপনিই লেখেন, আর কেউ লেখে না। এমন কি, মেসের ঝি-ই যাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য সেই শরৎ চাটুয্যে মশাইও লেখেন না।"

আলোচনা ও বাদপ্রতিবাদ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিল দেখিয়া ডাঃ শহীদুল্লা সাহেব বলিলেন, "দেখুন দেব বাবু, আপনার কথাবার্ত্তা ত শুনলুম। মোটামুটি আপনি একজন সংস্কারবিরোধী বলুন।"

আমি বলিলাম, "তা বলতে চান বলুন—ওসব বিশেষণে আমি বিশেষ ভড়কাইনে। কিন্তু একথা খুবই ঠিক যে I don't believe in *Samskar* for *Samskar*'s sake! যেখানে কোন গোলমাল নেই বিশৃঙ্খলা নেই সেখানে খুঁচিয়ে ঘা করতে হবে এবং ঘা করে তারপর তার চিকিৎসা করতে হবে, ভাষার ওপর এপ্রকার আয়ুর্ব্বেদ-প্রয়োগে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মোটা কথাটা আপনাদের আমি বলি—সেটা মেনে নিলে অনেক বিতণ্ডা কমে যাবে। কথাটা হচ্ছে এই। বাঙ্গালা ভাষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অধিকার আপনাদের কেউ দেয়নি। ভাষায় যে সব শব্দের রূপ একেবারে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কোন রূপান্তর বা ব্যত্যয় প্রচলিত নেই—সে সব শব্দে তাই থাকবে; এটা সকলেরই মেনে নিতে হবে। যেখানে কিছু কিছু রূপান্তর আছে, যেমন জিনিষ, জিনিস; সহর, শহর; প্রভৃতি, সেখানে কোন একটাকে recommend করা মন্দ নয়। কিন্তু সত্যি বলতে, বাংলা সাধুভাষার রূপে গুরুতর কোন বিশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু আপনাদের প্রকৃত কাজ সেইখানে যেখানে বিশৃঙ্খলা অপরিমিত, অর্থাৎ কথ্যভাষার সাহিত্যিক প্রচলনে। এই কথ্য বা মৌখিক ভাষার শব্দের, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের, রূপবাহুল্য বাস্তবিকই অত্যন্ত অসুবিধাজনক। আপনারা ভেবে চিন্তে নির্ভীক ভাবে কারও খাতিরের অপেক্ষা না করে সেই দিকে যদি মনোনিবেশ করেন, কথ্য ভাষার রূপ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন, তবে কতকটা কাজ হতে পারে। যাক্, আপনাদের সঙ্গে খুব খানিকটা তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি করলুম, অপরাধ নেবেন না।"

এই কথা বলিয়া এবং ভাষাতত্ত্ববিষয়ে বিশ্বপণ্ডিতগণের জ্ঞানের গভীরতা ও গবেষণার মৌলিকতার পরিচয়-লাভে চমৎকৃত হইয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণান-কমিটির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ফাল্গুন, ১৩৪৩।

শিশুপাল-বধ

শিশুপাল-বধ

[বাগেরহাট বঙ্গীয় অধ্যাপক-সঙ্ঘের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আজকার বঙ্গীয় অধ্যাপক-সঙ্ঘের এই অধিবেশনে, বাঙ্গালা বাণান ব্যাপারে হঠাৎ যে বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়োজিত বাণান-কমিটির অতিরিক্ত সঙ্কীর্ণতার কল্যাণে—সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সম্প্রতি বাণানের কচ্‌কচিতে আমার কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় যোগদান করাই বোধ করি আমার প্রতি এই অনুরোধের হেতু। গোড়াতেই কিন্তু একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে হইতেছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে শুনিয়াছি, None but infants and idiots bother about spelling ; সুতরাং বাণান আলোচনা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদর্শন করিতে গেলেই ঐ দুই পর্য্যায়ের এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। আমাকে এখন আর ঠিক infant বলা বোধকরি চলে না, কারণ যদিও আমার শত্রুপক্ষ বলিয়া থাকেন যে আমার চেহারা সাতিশয় নধর এবং তরুণ-ভাবাক্রান্ত অর্থাৎ কিনা একেবারেই কচি ও কাঁচা,

তৎসত্ত্বেও সত্যের খাতিরে একথা আমার কবুল করিতেই হইবে যে ঠিক "বনং ব্রজেৎ"-এর সময় আসিয়া না থাকিলেও, আমার বয়স যে চল্লিশোর্দ্ধং তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার ভয় হইতেছে যে বাণান বিষয়ে আমার উৎসাহের আতিশয্য হেতু সুধীগণের চক্ষে আমি অপর পর্য্যায়ে অর্থাৎ idiot শ্রেণীতেই বোধ করি গিয়া পড়িতেছি।

তবে এবিষয়ে একটা excuse শুধু মনে আসিতেছে, সেইটাই সাহস করিয়া বলিয়া ফেলি। ঠিক infant না হইলেও, এত কাল ইস্কুল-মাষ্টারী করিতে করিতে এত বেশী infant-এর সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, যে মনটাও বোধ করি কতকটা শিশুভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং শিশুরা যেমন কোন্‌টা শুদ্ধ কোন্‌টা অশুদ্ধ ইহা লইয়া বিষম দ্বিধাগ্রস্ত এবং ভীতিত্রস্ত হইয়া পড়ে, আমারও মানসিক অবস্থা কতকটা তদ্বৎ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানী লোক, স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে এই মায়াময় জগতে শুদ্ধ অশুদ্ধ ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা এসব কিছুই প্রকৃত নহে ; তাই তাঁহারা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় আরূঢ় হইয়া "প্রসাদমধিগচ্ছন্তি"। আমি অকপটভাবে আপনাদের সমক্ষে স্বীকার করিতেছি যে আমার এখনও সে তুরীয় অবস্থা লাভ হয় নাই—ভরসা করি দ্বিসপ্ততি বর্ষ বয়স অতিক্রান্ত হইলে সে কৈবল্য সমাধিতে উপনীত হইতে পারিব।

বর্ত্তমানে যখন ভাষাবিভ্রাটে আমার কিঞ্চিৎ চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়ই তখন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই যাক্। পূর্ব্বে অন্যত্র এই বিষয়ে যে ভাবে ব্যাপক আলোচনা করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি আর এস্থলে করিতে চাহি না। শুধু শিক্ষার্থী শিশুসমাজের দিক্ হইতেই এই সব বাণানবিভ্রাটে কি রকম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তাহার কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

শিশুরা হাতে খড়ির সঙ্গে সঙ্গেই একটু একটু করিয়া বর্ণ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে ফলা-বাণান লিখিতে শিখে, কোন্ শব্দের কি বাণান

তাহা মুখস্থ করিতে আরম্ভ করে ; "বর্ণপরিচয়", "বাল্যশিক্ষা", "শিশুশিক্ষা", ইত্যাদি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে থাকে। এই সময় হইতেই শিশুর মনে এই ধারণাটা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে সে যেটুকু শিখিবে সেটুকু যেন শুদ্ধ ভাবে শেখে—কোন্‌টা ভুল কোন্‌টা শুদ্ধ সে বিষয় যেন তাহার চিত্ত সজাগ হয়। Accuracy-র প্রতি বিশুদ্ধির দিকে এই দৃষ্টি এবং এই মনোযোগ যদি শিশুর চিত্তে প্রথম হইতেই উপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে বহুলপরিমাণে slipshod looseness অথবা শিথিল অনিশ্চয়-তার ভাব হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ হয়। এই কারণে ভাষার বিশুদ্ধি ও ব্যাকরণের কড়াকড়ি, এই সবের প্রতি দৃষ্টি শিশুর mental discipline-এর পক্ষে সাতিশয় মূল্যবান্। একেই ত নানা কারণে আমাদের দেশে, বিশেষতঃ আমাদের বিদ্যালয় প্রভৃতিতে, মোটামুটি বলিতে গেলে পড়াশুনা বিষয়ে বিদ্যার্জ্জন বিষয়েই একটা যেন কি রকম বিতৃষ্ণা অনাদর তাচ্ছীল্যের ভাব আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; ইহার উপর আবার যদি শিশু বয়স হইতেই এই রকম একটা ধারণার প্রচার করিয়া দেওয়া যায় যে বাণান কিছু নহে, ব্যাকরণ কিছু নহে, যা-ইচ্ছা-তাই একটা লিখিলেই হইল, তাহা হইলে সেই শিশুর intellectual make-up ভবিষ্যতে কি হইয়া দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বিষয়টাকে আমাদের বিশ্বপণ্ডিতগণ যতটা লঘুচিত্ততার সহিত দেখেন বলিয়া মনে হয়, আমি কিন্তু ততটা দেখিতে পারি না।

এটা একটা অতি মোটা কথা যে কোন ভাষাই হঠাৎ একদিন আকাশ হইতে পড়িয়া সকলের মুখে মুখে সঞ্চারিত হয় নাই। প্রত্যেক ভাষারই একটা ইতিহাস আছে। কত রকম ঘটনাসমাবেশের মধ্য দিয়া যুগযুগান্তরের ব্যবহারের ফলে, এক একটা ভাষা তাহার বর্ত্তমান আকারে আসিয়া পৌছিয়াছে। ধীরে ধীরে কালের প্রবাহে ইহার বিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। এই ইতিহাস ও বিবর্ত্তনের ফলে ভাষার কতক অংশ সুস্থির (stabilized) হইয়া গিয়াছে, কতক অংশ এখনও অস্থির বা তরল (fluid) অবস্থায় রহিয়াছে। যে সব

বর্ণযোজনারীতি রচনারীতি বহুকালাগত প্রয়োগ ও ব্যবহারে সুস্থির হইয়া গিয়াছে, তাহারই উপর ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। সেই ব্যাকরণের মধ্যেই শিষ্টপ্রয়োগ crystallized হইয়া গিয়াছে। সকল ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষেই—বিশেষতঃ শিশু শিক্ষার্থীর পক্ষে ত বটেই—সেই শিষ্টপ্রয়োগগুলিই আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। এই গুলিই ভাষার কাঠাম ঠিক করিয়া দেয়, এবং বহুকাল-প্রচলিত ও পরিণত ভাষাতে এই কাঠামটাই ভাষার বহুলাংশ। এই শিষ্ট ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ ও ব্যবহার আয়ত্ত হইয়া গেলে পরে ভাষার যেটুকু fluid অংশ তাহার উপর ক্রমশঃ দখল জন্মিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষাতেও এই সব কথাই প্রযোজ্য। ইহা আজকারই ভাষা নহে; ন্যূনাধিক হাজার বৎসর ধরিয়া এই ভাষার বিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তি চলিয়া আসিয়া আজ একটা সুসংহত সুসম্বদ্ধ রূপে দাঁড়াইয়াছে। কত বড় বড় লেখক এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, কত বড় একটা সাহিত্য এই ভাষায় গড়িয়া উঠিয়াছে। শিষ্টপ্রয়োগ-সম্মত ইহার কাঠাম এক প্রকার সুস্থির হইয়া গিয়াছে। বহুস্থলেই ইহার বর্ণযোজনা-পদ্ধতিতে কোন অনিশ্চয়তা নাই। এই অবস্থায় যদি কেহ এই ভাষার সুপ্রতিষ্ঠিত রূপগুলিকে খামখা পরিবর্ত্তন করিয়া বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল আনয়ন করিবার দুশ্চেষ্টা করেন, এবং তাহাতে বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিগণ যদি বিচলিত হন, তবে তাহাতে বোধ করি বিশেষ অন্যায় হয় না।

আজ আমাদের এই বাণান-কমিটির কার্য্যকলাপে এইরকম একটি নিরর্থক গণ্ডগোলেরই সৃষ্টি হইয়াছে। যে জন্য এই বাণান-কমিটি গোড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আজকালকার কথ্য ভাষার fluid form গুলিকে সুস্থির করিবার জন্য, standardize করিবার জন্য, তাহাতেই যদি কমিটি মনো-নিবেশ করিতেন, তাহা হইলে এই গণ্ডগোলের বিশেষ কারণ ঘটিত না। কিন্তু সে দিক্ কার্য্যতঃ একদম ছাড়িয়া দিয়া ইহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন সাধুভাষার শব্দের সুপ্রচলিত রূপের সংস্কারে। আমরা চিরকাল

আর্য্য, ধর্ম্ম, সর্ব্ব, পুনঃপুনঃ, ক্রমশঃ, বাঙ্গালী, পাখী, রাণী, মামী, খুড়ী, ইত্যাদি রূপ দেখিয়া ও লিখিয়া আসিতেছি। ইঁহারা হঠাৎ ফতোয়া জারী করিলেন যে এসব চলিবে না, সব নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। একেই বলে হাতে কাজ না থাকিলে খুড়ার গঙ্গাযাত্রা করান। বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার নানা দিক্ পড়িয়া আছে, সে সব কোন দিকে ইঁহাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না, ইঁহারা লাগিলেন প্রচলিত বর্ণযোজনা প্রণালীর ওলট-পালট করিতে। নিষ্কাম mischief-making আর কাহাকে বলে? ইঁহাদের ফতোয়াই যদি চালু হয়, তবে বর্ণপরিচয়ের সময় হইতে পুনঃপুন, ক্রমশ হইতে সুরু করিয়া পাখি, মামি, রানি প্রভৃতি অশুদ্ধ রূপ আমাদের শিশুদিগকে শিখাইতে হইবে! এই বীভৎসতা হইতে ভাষা-বিধাতা আমাদের শিশুসমাজকে রক্ষা করুন।

বন্ধুবর দ্বারিক মুখুয্যে মহাশয়* এই মাত্র বলিতেছিলেন, "বাণান-কমিটির চেষ্টায় ভালই হইল; এযাবৎ পরীক্ষার খাতায় ছেলেদের বাণানভুল কাটিতে কাটিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত—বেচারারা নম্বরও খুয়াইত অনেকগুলি—দেখিয়া সত্য সত্যই কষ্ট হইত; এখন এই কাটাকাটির হাত হইতে ত রেহাই পাওয়া গেল। এটাই বা কম লাভ কি?"

দ্বারিক বাবু স্বয়ং একজন বাণান-কমিটির সম্মানিত সভ্য, সুতরাং তিনি যে কমিটির সপক্ষে প্রাণপণে ওকালতী করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তিনি যেন একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন মনে হইল। যদি বাণান-কমিটি খুব সাহস করিয়া—যাহাকে ইংরাজীতে বলে taking courage in both hands—একদম বাণানে বর্ণাশুদ্ধি abolish করিতে পারিতেন, তাহা হইলে না হয়, সেটা ভালই হউক আর মন্দই হউক, স্বীকার করিতে পারিতাম যে শিশুহত্যা ত বন্ধ হইল। কিন্তু তাহাত কৈ হইল না।

---

*শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এস্-সি., কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

বাণান-কমিটি প্রচলিত রূপ বাতিল করিয়া নয়া রূপ হুকুম করিয়াছেন; বর্ত্তমানে প্রচলিতরূপ না লিখিলে ছেলেদের নম্বর কাটা হয়, ভবিষ্যতে নয়ারূপ না লিখিলে ছেলেদের নম্বর কাটা হইবে; সুতরাং কাটাকাটিরূপ হিংসা-মূলক ব্যাপার সমানই চলিতে থাকিবে। দ্বারিক বাবু যখন এতটাই দয়াবান্, তখন দয়া করিয়া বাণান-কমিটিকে বরং একেবারে বাণানের উপদ্রবটাই বাতিল করিয়া দিতে পরামর্শ দিউন; আমরাও তাঁহাকে

"নিন্দসি বর্ণবিধেহরহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতশিশুঘাতম্"

সম্ভাষণপূর্ব্বক নবীন-বুদ্ধদেবরূপে অভিবাদন করিয়া ধন্য হই।

কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি। বাণান-কমিটি শিশুদিগের রক্ষাকল্পে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর আমরা সমালোচকেরা সুদর্শনচক্র হস্তে ধারণ করিয়া শিশুপাল-বধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি, একথাটাও বোধ করি একেবারে ঠিক নহে। আমাদের কুলিশকঠোর হৃদয়েও শিশুপালের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া বোধকরি অবশিষ্ট আছে। আমাদের দয়া হয় এই ভাবিয়া যে এই যে শিশুপাল—ইহারা আজ গোলামখানার পাঠ্যপুস্তকের চাপে পড়িয়া ত নয়া নয়া বাণান মক্স করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ পাইয়া বাহির হইল —কিন্তু কালই যখন ইহারা দেখিবে যে ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে এই সব আজগুবি বাণানের চল্‌তি নাই, তখন ইহাদের কি অবস্থা হইবে? বাণান-কমিটির প্রতি নিশ্চয়ই তখন এই দিগ্‌ভ্রান্ত শিশুপালের হৃদয়ে অবিমিশ্র কৃতজ্ঞতাই উথলিয়া উঠিবে না।

বন্ধুবর আরও বলিয়াছেন, "অত দুশ্চিন্তারই বা কারণ কি? দুই আনা পয়সা ব্যয় করিয়া সকলেই ত বাণানের এই নববিধান মুখস্থ করিতে পারেন। এত সস্তায় ভাষাগত কৈবল্য লাভ, ইহাতেও আপনাদের আপত্তি?"

তদুত্তরে আমার কেবল এইটুকু মনে হয় যে, পয়সার কথা যখন তুলিলেনই, তখন বলা উচিত যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণ-পরিচয়" আরও সস্তা, মূল্য ছয় পয়সা মাত্র—তদ্দ্বারাই যখন চলিয়া যাইতেছে, খামখা দুপয়সা বেশী খরচ করিতে যাই কেন? সুতরাং আমার খুবই সন্দেহ হইতেছে যে উক্ত দুপয়সা অতিরিক্ত খরচ কেহ করিবেও না, এবং ভদ্রলোকপাঠ্য পুস্তক-পত্রিকাদিতে (শিশুপাঠ্য নহে) নয়া বাণান চলিবেও না—সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠসমাপনান্তে, আজকালকার তরুণ ষ্টাইলে বলিতে গেলে, শিশুপালের "পরিস্থিতি" বড়ই "গুরুত্বপূর্ণ" হইয়া দাঁড়াইবে। ভবিষ্যতের এই গুরুতর অবস্থার কল্পনাতেই শিশুপালের উপর সত্য সত্যই দয়ার উদ্রেক হইতেছে।

আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না—বলিবার আবশ্যকতাও নাই। আমার যাহা বক্তব্য তাহা বুঝাইতে ভয়ানক একটা বিশেষজ্ঞতার দরকার করে না। ভাষাগত কাণ্ডজ্ঞানই এ বিষয়ে যথেষ্ট। এই সেদিনও জনৈক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন,

"Certain pale gentlemen get together and decide on the spelling of a word. You can compare them with a group of pale politicians who divided Europe after the war. I think on the whole they have made a mess of it. The fact is, there cannot be a right or a wrong when it comes to geographical boundaries. The only thing one can do is to try and keep things as they are, follow the common usage. The same with spelling. It is impossible to say what the spelling should be, we can only say what the common usage is. Sometimes by degrees the common usage turns to something else, and that then becomes the common usage in course of time."

এই সহজ কথাটাই আমার বক্তব্য। ভাষার দেহের স্বাভাবিক রূপের উপর সাংস্কারিক পাণ্ডিত্যের উপদ্রব একেবারেই নিরর্থক উৎপাত—এবং উদীয়মান তরুণ শিশুপালের উপর ত রীতিমত অত্যাচার। ভরসা করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অতঃপর এবম্প্রকার শিশুপাল-বধের উৎসাহ সংবরণ করিবেন।

বৈশাখ, ১৩৪৪।

পত্রালোচনা

পত্রালোচনা

[শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত]

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

৮ই জুন, ১৯৩৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আশা করি সুদূর আলমোড়ায় গিয়া আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিয়া কতকটা সুস্থ হইতে পারিয়াছেন, তাই আপনাকে একটু বিরক্ত করিতে সাহসী হইতেছি।

আমি আপনার বিশেষ পরিচিত নহি। সাক্ষাৎ পরিচয় মাত্র একবারই হইয়াছিল, বছর পাঁচেক পূর্ব্বে এক শ্রাবণ-প্রভাতে শান্তি-নিকেতনের উত্তরায়ণ-গৃহে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবু* আমাকে আপনার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। আমি গিয়াছিলাম স্বর্গীয় মনীষী ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে এক স্মৃতি-সভায় আপনাকে সভাপতি হইবার জন্ত অনুরোধ করিতে; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ও আরও কতিপয়

* "প্রবাসী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্. এ.।

বন্ধু আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মতি দান করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। যাক্। আপনার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের খুব বেশী সৌভাগ্য আমার না হইলেও শান্তি-নিকেতনের অনেকেই আমাকে চিনেন; প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয়* ত কলেজে আমার সহাধ্যায়ীই ছিলেন।

যাহা হউক, যে বিষয় লইয়া আমি আজ আপনাকে পত্রাঘাত করিতে সাহসী হইতেছি, তাহাতে ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিশেষ কোন অপেক্ষা রাখে না। ব্যাপারটা এই।

বছর দেড়েক ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত একটি কমিটি বাঙ্গালা বাণান-সংস্কারের ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, তাহা অবশ্যই আপনি জানেন; কারণ, উক্ত কমিটির প্রকাশিত পুস্তিকার ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন যে, মূলতঃ আপনার অনুরোধেই এই প্রচেষ্টার উদ্ভব; এবং দ্বিতীয় সংস্করণের গোড়াতে আপনার ও শরৎ চাটুয্যে মহাশয়ের সম্মতি জ্ঞাপিত হইয়াছে। এখন, এই বাণান-সংস্কার-প্রচেষ্টার ব্যাপারে আমি নিজেও কতকটা জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। দেশে যখন এই বিষয় লইয়া বিশেষ কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই—বস্তুতঃ যখন অতি অল্প লোকেরই মনোযোগ এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল—সেই সময়ে অর্থাৎ গত ৺পূজাবকাশে রাঁচি বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে আমি এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি; বিশেষতঃ বাণান-কমিটির কতকগুলি বিশেষ হাস্যাস্পদ প্রস্তাবের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের কশাঘাত করি। আমি বন্ধুবর প্রশান্তর মারফৎ আমার সেই অভিভাষণের এক কপি আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম—কারণ, আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল আমার কথা কয়টি আপনার গোচরে আনা। বাণান ছাড়াও, বর্ত্তমান

* প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এম্. এ., বি. এস্-সি.।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা, অশ্লীলতার ঢেউ প্রভৃতি, আরও অনেক জিনিষ আপনার নজরে আনা আমার অভিপ্রায় ছিল। আমি অবশ্য ঠিক জানি না যে উহা পড়িবার আপনার অবকাশ হইয়াছিল কি না। যাক্। পরে গত ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে বাঙ্গালা বাণান আলোচনা বিষয়েই একটি বৈঠক হয়; তাহাতে ঢাকার অধ্যাপক ডাক্তার শহীদুল্লা মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সেখানে আমি এবিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করি; বোধ হয় তাহারই ফলে বাণান-কমিটির উদ্যোক্তৃগণ আমাকে ও আরও দুইজন ভদ্রলোককে কমিটিতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। আহূত হইয়া আমি তথায় যাই; এবং গিয়া বাস্তবিকই রকম সকম দেখিয়া বিস্মিত হই। কমিটির পুস্তিকায় যে সব নূতন নূতন প্রস্তাব দেখা যায়, তাহা ছাড়াও দেখি যে বহু বহু আজগুবি এবং অভাবনীয় প্রস্তাব একে একে উঠিতে থাকে। দুই একটা বলিলেই যথেষ্ট হইবে; যথা: "যে, যাহা, যেমন, অর্থাৎ 'যদ্'-শব্দজ কথা 'জ' দিয়া লিখিতে হইবে," "বাঙ্গালা শব্দ হইতে ঐ-কার, ঔ-কার বর্জ্জন করিতে হইবে," ইত্যাদি। তখন আমি পরিষ্কার ভাবেই উঁহাদিগকে বলি, "বাঙ্গালা ভাষা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার আপনাদিগকে কেহ দেয় নাই; ভাষায় যে সব রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা সকলেরই মানিয়া লইতে হইবে; যে সব কথার অনেক রূপান্তর আছে, সে সব স্থানে কোন একটা রূপ নির্দ্দেশ করা মন্দ নয়; আর সত্য বলিতে, বাঙ্গালা সাধুভাষার রূপে গুরুতর কোন বিশৃঙ্খলতা নাই; আছে কথ্য ভাষায় (বা চল্‌তি ভাষায়), সেই বিষয়ের রূপ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা আপনারা করুন।" আর শ্যামাপ্রসাদ বাবুর নিকট হইতেও শুনিয়াছি যে, এই চল্‌তি ভাষার রূপবাহুল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেই আপনি বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এই কথা বলিবার পর আমি স্থির করিলাম যে, শুধু সমালোচনা না করিয়া আমার নিজের এবিষয়ে কি বলিবার আছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া কমিটির সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে, বোধ হয় ভাল হয়; তাই একটি

সংক্ষিপ্ত memorandum প্রস্তুত করিয়া উঁহাদিগকে দিই। সেইটিই জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"-তে বাহির হইয়াছে—শুধু উপসংহার অংশটি পরে জুড়িয়া দিয়াছি। আমি তাহারই এক কপি আপনার নিকটে এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম; যদি আপনি অবসরমত পড়িতে পারেন, তবে খুবই আনন্দিত হইব। কোন কোন বিষয়ে দেখিবেন যে, আপনি কোন কোন শব্দের যে রূপের ব্যবহার প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহারও সমালোচনা আছে। আশা করি, তাহাতে কিছু মনে করিবেন না; কারণ, ভাষাসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মতভেদ অনিবার্য্য।

আমি বিশেষ করিয়া আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি রেফের পরে কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব-প্রয়োগের বিষয়ে। এবিষয়ে আমি প্রবন্ধটিতে যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তি এই পত্রে করিতে চাই না; কিন্তু এই বিষয় লইয়াই বাণান-কমিটি একটু বেশী মাত্রায় জিদ্ বা বাড়াবাড়ি করিতেছেন বলিয়া আমার ধারণা। আপনি বাণানের নববিধান মানিবার রাজী-নামা দস্তখত করিয়াও কেন নিজের লেখায় উহা পালন করিতেছেন না, এই রকম অনুযোগকারী জনৈক পত্রলেখকের উত্তরে আপনি যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমি একদিন "প্রবাসী" আফিসে বসিয়া দেখিয়াছি, এবং আপনার সুরসাল মন্তব্যটি—"নিয়ম পরিবর্ত্তন সহজ, কিন্তু অভ্যাস পরিবর্ত্তন সহজ নহে"—পড়িয়া খুবই উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু এবিষয়ে আপনার প্রতি আমার একটু অনুযোগ আছে। যে অভ্যাস কু-অভ্যাস নহে, তাহা যে খামখা পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে—ইহা আপনি মানিয়া লইলেন কেন? আপনার এই apologetic attitude সম্বন্ধেই আমার অনুযোগ। বাস্তবিক পক্ষে, এ পর্য্যন্ত কোনই সঙ্গত কারণ কমিটি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই—সুপ্রচলিত ব্যাকরণ-সম্মত রূপ কেন পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে; বরঞ্চ তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে এবং দেওয়া হইয়াছে। মোটামুটি সে যুক্তি এই যে, ভাষার রূপের চরম প্রামাণ্যই হইতেছে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা;

এমন কি এই প্রচলনের খাতিরে অনেক অশুদ্ধ রূপও ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহা এখন সরাইবার উপায় নাই, আবশ্যকতাও নাই—সুপ্রচলিত রূপ-পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টার ফলে আবার নানাবিধ রূপ প্রচলিত হইয়া বিশৃঙ্খলার কারণ হয়। এ বিষয়ে আমার প্রবন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছি; আপনি যদি পড়িয়া সুবিধামত এ বিষয়ে আপনার মতামত জানাইতে পারেন, তবে আমি অত্যন্ত উপকৃত হইব। একটা কথা বলি, আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন,—বাণান-কমিটির নানাবিধ পরিবর্ত্তমান প্রস্তাবাবলীতে পূর্ব্বাহ্ণেই যে আপনি একখানি সহি দিয়া বসিয়াছেন, তাহা যেন একটু hasty বলিয়াই মনে হয়।

পত্রখানি সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। আমি এখন শেষ করি। তবে শেষ করিবার পূর্ব্বে অন্য একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আমার বড় ছেলেটি থার্ড ক্লাসে পড়ে; তাহার জন্য একদিন আপনার "ছুটির পড়া" বইখানি কিনিয়া আনিয়া পৃষ্ঠা উল্টাইতেই একটা অতি বিশ্রী ভুল চোখে পড়ায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। "সূর্য্যকিরণের ঢেউ" প্রবন্ধে ৭৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে Wave Theory of Light-এর আবিষ্কর্ত্তা "ডেন্মার্ক দেশের হিগেন্স নামক" পণ্ডিত। এত বড় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের নামে ও ধামে এত বড় ভুল বাস্তবিকই বিস্ময়জনক—উঁহার নাম হয়গেন্স (Huygens) এবং ধাম ডেন্মার্ক নহে, হল্যাণ্ড—বিখ্যাত ডাচ্ বৈজ্ঞানিক হয়গেন্স নিউটনের সমসাময়িক এবং প্রায় নিউটনেরই সমকক্ষ। দেখিলাম, আপনার এই ছোট্ট বইখানি ১৩১৬ সনে প্রথম মুদ্রিত হয়—আজ ২৮ বৎসরের কথা—এবং তারপর ইহার বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে; অথচ এরকম একটা মারাত্মক ভুল সমানে চলিয়া আসিতেছে, কেহ আপনার দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করে নাই, ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়।* আবার দেখা হইলেই প্রশান্ত ভায়ার উপর vote of censure আনিতে ত্রুটি করিব না।

---

*এই বই খানির হালের সংস্করণ (পৌষ, ১৩৪৫) হইতে বুঝিলাম যে হয়গেন্স সাহেবের কপালে আরও দুর্গতি লেখা ছিল—কারণ বিশ্বভারতীর কল্যাণে এবার তাঁহার নাম-রূপ দাঁড়াইয়াছে "ইয়েগে-স"!

তাছাড়া, গত পৌষ মাসের "প্রবাসী"-তে বাঙ্গালা বাণান সম্বন্ধীয় আপনার একটি ছোট্ট প্রবন্ধ বাহির হয়। সেই প্রবন্ধটি আমি পড়ি মান্দালয়ে বসিয়া। বিগত বড় দিনের ছুটিতে বন্ধুবর সুনীতি চাটুয্যে মহাশয় ও আমি ব্রহ্মদেশে যাই বাঙ্গালীদের এক সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষ্য করিয়া। তার পর অবশ্য আমি কয়েকদিনের জন্য গোটা বর্ম্মাদেশময়ই ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই। যখন আমি মান্দালয়ে, তখন ঐ পত্রিকাখানি আমার হাতে পড়ে, এবং প্রবন্ধটি বাণানবিষয়ক ও আপনার নিজের লেখা—তাই তখনই উহা পড়িয়া ফেলি। উহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি এস্থলে কিছু লিখিতেছি না; কিন্তু একটা বিষয় আমার বড় আশ্চর্য্য লাগিল—যত বারই "মূর্দ্ধন্য" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে (এবং বহুবারই ব্যবহৃত হইয়াছে) ততবারই ঐ শব্দটি "ণ" দিয়া লেখা হইয়াছে—অথচ "মূর্দ্ধন্য" শব্দটির "ন"টি বাস্তবিক "দন্ত্য ন"। আমি ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়াই ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু এই সেদিন আবার আপনার পুরাতন "শব্দতত্ত্ব" বইখানির উপভোগ্য প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে পুনরায় সেই "ণ"-এর আবির্ভাব দেখিয়া আমার একটু খট্‌কা লাগিয়াছে, হয়ত বা আপনার নিজের মনেই এবিষয়ে একটা ভুল ধারণা রহিয়া গিয়াছে।

তারপর, কিছুদিন পূর্ব্বে কোন একখানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রে আপনার একটি লেখায় দেখি যে, ফরাসী *"S'il vous plait"*-কে বাঙ্গালাতে লিখিয়াছেন "সি ভূ প্লে"; কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই উচ্চারণ? আমার ত ধারণা যে *"il"* শব্দের "l" silent-ও নয়, liquid-ও নয়, উহা সম্পূর্ণই উচ্চারিত হয়—সুতরাং *"S'il"* বাঙ্গালাতে "সিল্" হওয়াই উচিত। আমি ফরাসী মোটামুটি জানি; তবে কথাবার্ত্তায় ফরাসীতে বিশেষ অভ্যস্ত নহি, সুতরাং আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নহি। বিষয়টিও অতি সামান্য। তবে inaccuracy প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়াতে এটিও আপনাকে জানাইলাম, আপনি সহজেই এ বিষয়ে সন্দেহ দূর করিতে পারিবেন।

আমার এই চিঠির শেষভাগে এই যে সামান্য কয়েকটি ভুলচুকের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম, আশা করি ইহাতে আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। কারণ, অপর লক্ষ লক্ষ লোকের ন্যায় আমিও আপনার লেখার একজন নিয়মিত পাঠক এবং সশ্রদ্ধ পাঠক, এবং আপনার নামের সহিত জড়িত কোন লেখায় কোন ভুল দেখিলে মনটা বড় ভাল লাগে না। সত্য কথা বলিতে, এই জাতীয় ভুল বা inaccuracy আপনার লেখায় আমার চোখে বড় বেশী পড়েও নাই। যাহা হউক, যদি এই পত্রে আমি কোন প্রকারে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া থাকি, তবে সে অপরাধ নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন। প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র)

ওঁ

আলমোড়া

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

বানান সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য পড়েছি।—

প্রথমেই বলা আবশ্যক ব্যাকরণে আমি নিতান্তই কাঁচা, তার একটা প্রমাণ "মূর্দ্ধন্য" শব্দে আমার "ণ" কার ব্যবহার। এ সম্বন্ধে নিয়ম জানা ছিল কিন্তু বোধ হয় "ণ" কারের বাংনত্ব স্বীকার করাতে ঐ শব্দটা সম্বন্ধে বরাবর আমার মন প্রমাদগ্রস্ত হয়ে ছিল। বস্তুত শিক্ষার বনিয়াদের দোষেই এ রকম ঘটে থাকে—ব্যাকরণে আমার বনিয়াদ পাকা নয় এ কথা গোপন করতে গেলেও ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে।

বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার কারণ এই, যে, প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে

স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠ্‌চে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম। এ সম্বন্ধে আমার আচরণেও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় সে আমি জানি, এবং তার জন্যে আমি প্রশ্রয় দাবি করি নে। এরকম অব্যবস্থা দূর করবার একমাত্র উপায় শিক্ষাবিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা।

বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্য্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানিনে। কেবল মাত্র অক্ষরবিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জ্জীব বাহন—কিন্তু রসনা নির্জ্জীব নয়—অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কার মতোই উচ্চারণ করে চলে। সেদিকে লক্ষ্য করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি সে সকল শব্দের প্রায় ষোলো আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্ত্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। উক্ত পাশা এদেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন।

এমন কি, যে সকল অবিসম্বাদিত তদ্ভব শব্দ অনেকখানি তৎসম-ঘেঁষা তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে গেলেও পদে পদে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কা আছে। এরা উচ্চারণে প্রাকৃত কিন্তু লেখনে সংস্কৃত আইনের দাবি করে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসমিতি কতকটা পরিমাণে সাহস দেখিয়েছেন সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের মনেও ভয় ডর আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃত বাংলায় তদ্ভবশব্দবিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন চলে এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যদি নিতান্তই সম্পূর্ণ সেই ভিত্তিতে বানানের প্রতিষ্ঠা নাও হয় তবু এমন একটা অনুশাসনের দরকার

যাতে প্রাকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হতে পারে। সংস্কৃত এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা ছাড়া সভ্য জগতের অন্য কোনো ভাষারই লিখনব্যবহারে বোধ করি উচ্চারণ ও বানানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই—কিন্তু নানা অসঙ্গতিদোষ থাকা সত্ত্বেও এসম্বন্ধে একটা অমোঘ শাসন দাঁড়িয়ে গেছে। কাজ চলবার পক্ষে সেটার দরকার আছে। বাংলা লেখনেও সেই কাজ চালাবার উপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন মানি; আমরা প্রত্যেকেই বিধানকর্ত্তা হয়ে উঠলে ব্যাপারটা প্রত্যেক ব্যক্তির ঘড়িকে তার স্বনিয়মিত সময় রাখবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেবার মতো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমিতির বিধানকর্ত্তা হবার মতো জোর আছে—এই ক্ষেত্রে যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি এ কথা আমরা মানতে বাধ্য।

রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববর্জ্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিয়ে বেশী তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করিনে। যাঁরা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তাঁরা অন্যায় করেছেন তবুও তাঁদের পক্ষভুক্ত হওয়াই আমি নিরাপদ মনে করি। অন্তত তৎসম শব্দের ব্যবহারে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে কোনো ভয় নেই লজ্জাও নেই। শুনেছি "সৃজন" শব্দটা ব্যাকরণের বিধি অতিক্রম করেছে, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত কথাটা চালিয়েছেন তখন দায় তাঁরই, আমার কোনো ভাবনা নেই। অনেক পণ্ডিত "ইতিমধ্যে" কথাটা চালিয়ে এসেছেন, "ইতোমধ্যে" কথাটার ওকালতি উপলক্ষ্যে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখিনে—অর্থাৎ এখন ঐ "ইতিমধ্যে" শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়বানানসমিতিতে তৎসম শব্দসম্বন্ধে যাঁরা বিধান দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্বভার থেকে তাঁরা আমাদের মুক্তি

দিয়েছেন। এখন থেকে "কার্ত্তিক" "কর্ত্তা" প্রভৃতি দুই-ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক "ত" আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করে নিতে পারি, সেটা সাংঘাতিক হবে না। হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না—কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব। এখন থেকে "ভট্টাচার্য্য" শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে নির্ব্বিকার চিত্তে নির্ম্মম হতে পারব কারণ নব্য বানানবিধাতাদের মধ্যে দুজন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্য্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আর্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন, যেমন আধুনিক মাঞ্চু এবং চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা।

তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্ভব শব্দে অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে—কিছু কিছু চালাচ্চিও। যেখানে মতে মিলচি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানচি। কেননা অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলব না—এমন কি হয় তো —থাক্ আর কাজ নেই।

তা হোক্, উপায় নেই। আমি হয়তো একগুঁয়েমি করে কোনো কোনো বানানে নিজের মত চালাবো। অবশেষে হার মান্‌তে হবে তাও জানি। কেননা শুধু যে তাঁরা আইন সৃষ্টি করেন তা নয় আইন মানাবার উপায়ও তাঁদের হাতে আছে। সেটা থাকাই ভালো, নইলে কথা বেড়ে যায়, কাজ বন্ধ থাকে। অতএব তাঁদেরই জয় হোক—আমি তো কেবল তর্কই করতে পারব তাঁরা পারবেন ব্যবস্থা করতে। মুদ্রাযন্ত্রবিভাগে ও শিক্ষাবিভাগে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে সেই ব্যবস্থার দৃঢ়তা নিতান্ত আবশ্যক।

আমি এখানে স্বপ্রদেশ থেকে দূরে এসে বিশ্রামচর্চ্চার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল সর্ব্বত্রই অনুসরণ করে। আমার

যেটুকু কৈফিয়ৎ দেবার সেটা না দিয়ে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই যে দুঃখ স্বীকার করলুম এর ফল কেবল একলা আপনাকে নিবেদন করে বিশ্রামের অপব্যয়টা অনেক পরিমাণেই অনর্থক হবে। অতএব এই পত্রখানি আমি প্রকাশ করতে পাঠালুম। কেননা এই বানানবিধিব্যাপারে যাঁরা অসন্তুষ্ট তাঁরা আমাকে কতটা পরিমাণে দায়ি করতে পারেন সে তাঁদের জানা আবশ্যক। আমি পণ্ডিত নই, অতএব বিধানে যেখানে পাণ্ডিত্য আছে সেখানে নম্রভাবেই অনুসরণের পথ গ্রহণ করব, যে অংশটা পাণ্ডিত্যবর্জ্জিত দেশে পড়ে সে অংশে যতটা শক্তি বাচালতা করব কিন্তু নিশ্চিত জানব, যে, একদা "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি র'বে নিরুত্তর।" ইতি ১২।৬।৩৭

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

২২শে জুন, ১৯৩৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার পত্রের উত্তরে আপনার সুদীর্ঘ পত্রখানি পাইয়া আমি খুবই আনন্দিত হইলাম। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আপনি যে এই বয়সে এবং অপটু শরীর লইয়াও এতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য আপনি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিবেন। আপনি যে আপনার চিঠিখানি প্রকাশ করিতে দিয়াছেন, ইহাও বেশ ভালই হইয়াছে; এই বাণান-বিভ্রাট বিতণ্ডায় আপনি কতটা দায়ী এবং কতটা দায়ী নহেন, তাহা সাধারণে জানিতে পারিবে। আমিও আপনার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমার প্রথম পত্রখানি ও এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে দিলাম।

বলা বাহুল্য মাত্র যে আপনার পত্রখানি আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারেই পড়িয়াছি এবং একাধিকবার পড়িয়াছি। যাহা যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার সামান্য যা দুই এক কথা বক্তব্য তাহা একটু পরেই বলিতেছি। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে, "মূর্দ্ধন্য ণ" আপনার লেখনীর উপর যা এক হাত লইয়াছে, তাহা ভাবিয়া বাস্তবিকই কৌতুক অনুভব করিতেছি। আসল ব্যাপার হইয়াছে কি জানেন? "মূর্দ্ধন্য ণ"-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী আপনার লেখনীর উপর কিঞ্চিৎ কুপিতা হইয়াছেন, এবং প্রতিশোধ লইবার নিমিত্তই এই কাণ্ডটি ঘটাইয়াছেন। আপনি ত "ণ"-এর বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযান চালাইতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা হইতে বেচারীকে ভিটাছাড়া করিবার উপক্রম করিয়াছেন, এবারকার আষাঢ়ের "প্রবাসী"-তেও দেখা গেল যে, আপনার আক্রমণের প্রচণ্ডতা কিছু মাত্র কমে নাই *; তাই আপনার লেখনীর উপর শোধ তুলিবার জন্য "ণ" আপনার লেখনীর মুখে এমন স্থানেই প্রবেশ করিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছে, যেখানে সংস্কৃত আইন অনুসারেও তাহার একান্তই অনধিকারপ্রবেশ। অক্ষর-দেবতাদিগকে চটান

* "কী কারণে জানিনে, হয় ত উড়িষ্যার হাওয়া লেগে আধুনিক বাঙালী অকস্মাৎ মূর্ধণ্য নয়ের প্রতি অহৈতুক অনুরাগ প্রকাশ করছেন। আমি এমন চিঠি পাই যাতে লেখক শনিবার এবং শূণ্য শব্দে মূর্ধণ্য ন দিয়ে লেখেন। এটাতে ব্যাধির সংক্রামকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্ণেল, গবর্ণর জর্ণাল প্রভৃতি বিদেশী শব্দে তাঁরা দেবভাষার ণত্ববিধি প্রয়োগ করে তার শুদ্ধিতা (!) সাধন করেন। তাতে বোপদেবের সম্মতি থাকতেও পারে। কিন্তু আজকাল যখন খবরের কাগজে দেখতে পাই কানপুরে মূর্ধণ্য ন চড়েচে তখন বোপদেবের মতো বৈয়াকরণিককে তো দায়ী করতে পারি নে।... কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় তো মূর্ধণ্য নয়ের সাড়া নেই কোথাও। মুদ্রাযন্ত্রকে দিয়ে সবই ছাপানো যায় কিন্তু রসনাকে দিয়ে তো সবই বলানো যায় না। কিন্তু যে মূর্ধণ্য নয়ের উচ্চারণ প্রাকৃত বাংলায় একেবারেই নেই, গায়ে পড়ে তার আনুগত্য স্বীকার করতে যাব কেন? এই পাণ্ডিত্যের অভিমানে শিশুপালদের প্রতি যে অত্যাচার করা যায় সেটা মার্জনীয় নয়।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বানান-বিধি" ("প্রবাসী", আষাঢ়, ১৩৪৪)। (উদ্ধৃতাংশের ভুল ও বর্ণাশুদ্ধিগুলি মূলানুগত।)

কি সোজা কথা? এই ভয়েই দেখুন বিজ্ঞ বৈয়াকরণিকগণ অতি সাবধানে চলেন; বোপদেব ও শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য ত এই ভয়ে "ন" "ণ" ইহাদের কোনটিরই কাছে ঘেঁষেন নাই; পাণিনি তদপেক্ষাও চতুর, তিনি আপনার বিশাল বক্ষে উভয়কেই সমানে বসাইয়া উভয়েরই মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছেন; এমন কি, "ণ"-এর সঙ্গীনের ভয়ে উহাকে মাঝখানে রাখিয়া উহাকেই বেশী তোয়াজ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি ত ব্যাকরণ মানিবেন না—তাই আপনার এই বিপদ্।

আপনার এই চিঠিখানিতে দেখিলাম যে, আর একটি দেবীও আপনার উপরে চটিয়াছেন—তিনি সংযুক্ত-বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে সংযুক্তা দেবী। আপনি ত যুক্তাক্ষরের উপরেও কিঞ্চিৎ বাম; তাই বাঙ্গালা ভাষা হইতে "ঙ্গ" তাড়াইয়া তৎস্থলে "ং"-এর আমদানী করিতে চাহেন। কিন্তু সংযুক্তা দেবীর রোষে এমনই আপনার মতিভ্রম ঘটাইয়াছে যে, যেখানে বাস্তবিক পক্ষে "ং"-এরই অধিকার, সেখানেও আপনার লেখনী দ্বারা যুক্তবর্ণ লিখাইয়া তবে ছাড়িয়াছে। ক্ষেত্রটি হইতেছে "অবিসংবাদিত" শব্দ; "বদ্" ধাতুর "ব" অন্তঃস্থ ব, বর্গীয় ব নহে; সুতরাং "সম্"-এর সহিত সন্ধিতে "ম্"-এর স্থলে "ং"-ই হয়, "ম্ব" হয় না; যেমন, "সংবাদ" হয় "সম্বাদ" হয় না, "কিংবা" হয় "কিম্বা" হয় না; অথচ আপনি অম্লানবদনে "অবিসম্বাদিত" লিখিয়া বসিয়া আছেন, এবং সংযুক্তা দেবীর উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিকই বর্ণ-দেবতাদিগকে চটান মোটেই নিরাপদ্ নহে; এমন কি, বিশ্ব-পণ্ডিতদিগের বাণান-কমিটির দেবতাদিগকে চটান অপেক্ষাও আপৎসঙ্কুল মনে হয়। "বিশ্ব-পণ্ডিত" কথাটিকে আবার আপনি ব্যঙ্গাত্মক ধরিয়া লইয়া আমাকে অধিকতর বিপদে ফেলিবেন না; উক্ত শব্দটি খাঁটি ব্যাকরণসঙ্গত, রাঁচির বক্তৃতায় আমি উহার ব্যাসবাক্য পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছিলাম—"বিশ্ববিদ্যালয়-চিহ্নিত পণ্ডিত"—সমাস মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়।

যাহা হউক, আপনার এই চিঠিতে আর একটি বর্ণাশুদ্ধি আমার চোখে পড়িয়া গেল, অন্ততঃ আমার কাছে ত বর্ণাশুদ্ধি বলিয়াই মনে হইল—জানি না, আপনি প্রাকৃত বাঙ্গালার স্বাধীনতা-ঘোষণার নিদর্শনস্বরূপ উহা ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন কি না। শব্দটি হইল "দায়ী", আপনি লিখিয়াছেন "দায়ি"; শব্দটি নিছক্ সংস্কৃত, বাণান-কমিটির ভাষায় "তৎসম"—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও উহার অস্তিত্ব দেখা যায়। আপনি নিজে আপনার ব্যাকরণে বনিয়াদ কাঁচা বলিয়া কবুল করিয়াছেন, তাই এই সামান্য বৈয়াকরণিক উৎপাত আপনার উপর আপতিত হইল। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এখন আসল কথা ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করি। আপনি ত কৌশলী লোক; তাই নিজেকে ব্যাকরণে কাঁচা, অপণ্ডিত এবং একেবারে প্রাকৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়া "সংস্কৃত" বা সাধু বাঙ্গালা ভাষার উপর বাণান-সমিতির যে সমস্ত উৎপাত তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে "নম্র"ভাবে রাজী হইয়াছেন, এবং অন্যকেও—এমন কি মাদৃশ বিদ্রোহীকেও—উপদেশ দিয়াছেন যে, বাণান-সমিতির "যুক্তির জোর" না থাকিলেও তাঁহাদের "জোরের জোর" আছে, সুতরাং মানিয়া লওয়াই "নিরাপদ্"। কিন্তু যাহাকে আপনি প্রাকৃত বাঙ্গালা বলেন—বোধ করি, আমরা যাহাকে সচরাচর কথ্য বা চল্‌তি বাঙ্গালা বলি, তাহারই এই নামকরণ আপনি করিয়াছেন—সেখানে আপনি অপণ্ডিত ও অক্ষর-মোহ-নির্ম্মুক্ত প্রাকৃতজনের দোহাই দিয়াছেন, এবং সেক্ষেত্রে বাণান-সমিতির নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে যাহাকে জার্ম্মাণরা বলে *Unabhüngigkeitserklürung* অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা, তাহা করিতে নিরাপত্তার যুক্তি আপনাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। তাই যদি না করিতে পারিল, তাহা হইলে নৈরাপত্তের যুক্তি সাধু বাঙ্গালার ক্ষেত্রেই বা চলিবে কেন? জানি না কি অপরাধে "সাধু" বাঙ্গালা আপনার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হইল। সাধু বাঙ্গালা ত আর কোন অপরাধ করে নাই

—বঙ্গভাষাভাষীদিগের নানাবিধ প্রাকৃত বুলি বা dialect-এর একটা সর্ব্বজনবোধ্য common form বা common forum সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। এই ঐক্যসাধন প্রচেষ্টা যে আধুনিক জন-গণ-মন-অধিনায়কদিগের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইল, ইহা খুবই বিচিত্র বটে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

তবে নৈরাপত্ত্য যুক্তির প্রসঙ্গে একটা কথা চুপি চুপি এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত বাণান-সমিতিকে আপনি যতটা সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ততটা বাস্তবিকই কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। সত্য কথা বলিতে, বাঙ্গালী জাতি লালদীঘীর ordinance যেমন নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারে নাই, তেমনই বাঙ্গালা ভাষাও গোলদীঘীর ordinance যে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইবে, এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাণান-সমিতির এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত ও একান্ত অযাচিত, অনাহূত ও অনাবশ্যক প্রস্তাব সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এবিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; এখন ত press এবং platform এবিষয়ে মুখর হইয়া উঠিয়াছে; বহু গণ্যমান্য বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি সাধু বাঙ্গালা ভাষার শব্দের settled বাণান খামখা পরিবর্ত্তন করিয়া ভাষায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; বাণান-সমিতির কর্ণধারগণ জনমতের এই বিক্ষোভ দর্শনে চিন্তিত হইয়া দুই একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা ব্যক্তিকে তাঁহাদের সপক্ষে পাওয়া যায় কি না, এই চেষ্টায় ছুটাছুটি করিতেছেন; তাঁহাদের কেমাল পাশা-complex কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে; এতদিন পরে শুনিতেছি যে sweet reasonableness-এর মাহাত্ম্য তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। যাহা হউক, Better late than never।

তাছাড়া, "পণ্ডিত" বলিয়া আপনি যতটা বিনয়পূর্ব্বক সমীহ প্রদর্শন করিয়াছেন বাণান-সমিতির সদস্যগণকে—ততটা সমীহ আমি প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না। কারণ বোধ হয়, Two of a trade can never agree

—অর্থাৎ ইউরোপের ও ভারতবর্ষের কিছু কিছু ভাষা আমিও কথঞ্চিৎ জানি বলিয়া ছিটে-ফোঁটা পাণ্ডিত্যের অভিমান আমার নিজের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে কিনা তাই। সুতরাং বিশ্বপণ্ডিতদিগের ipse dixit বা আপ্তবাক্য নির্ব্বিবাদে হজম করিবার প্রবৃত্তি আমার হয় না—এমন কি নৈরাপদ্যের খাতিরেও হয় না। তাই তর্কের আসরে অবতীর্ণ হই; এবং কচ্‌কচি করি।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত ত শুধু প্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম; এখন ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার শব্দযোজনা ও উচ্চারণ সম্বন্ধে এই চিঠিতে এবং আষাঢ়ের "প্রবাসী"-তে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি।

প্রথমতঃ আপনি একটু complain করিয়াছেন যে, বাঙ্গালাতে প্রচলিত সংস্কৃত (বা তৎসম) শব্দে অক্ষরই শুধু সংস্কৃতানুযায়ী হয়, উচ্চারণ বহু স্থলেই হয় না—"কেবলমাত্র অক্ষরবিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র।" এবং ইহার কারণও আপনি তৎক্ষণাৎই দেখাইয়াছেন, "বাংলা লেখার অক্ষর বানানের নির্জ্জীব বাহন কিন্তু রসনা নির্জ্জীব নয়—অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কার মতোই উচ্চারণ করে চলে।" কারণ ঠিকই দেখাইয়াছেন; তবে শুধু বাঙ্গালা ভাষাই যে এই অপরাধে অপরাধী এমত নহে, সমস্ত জীবন্ত ভাষারই এই অবস্থা—বর্ণবিন্যাস মোটামুটি ঠিক থাকে কিন্তু উচ্চারণরীতি দেশ ও কালভেদে সততই পরিবর্ত্তিত হয়। এই হেতুই বর্ণের অপর নাম অ-ক্ষর, অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয়। এই বিষয়ে complain করিয়া কোন লাভ নাই; এটা একটা অবিসংবাদিত fact, ইহাকে মানিয়া লইতে হইবে। কোন জীবন্ত ভাষাকেই phonetic কাঠামতে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। কিন্তু যদি উল্টাটাই ধরিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ যেমন যেমন উচ্চারণের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তেমন তেমনই বাণানও বদলাইতে হইবে, তাহা হইলে কি Babel of tongues উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন হইল জনৈক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন :

"In this changing world sounds do not remain constant. A word spelt to-day according to the best canons of phonetic theory and practice may soon be pronounced in a way which makes its former phonetic perfection a mockery. Spelling cannot change as quickly as pronunciation; if it did, we should soon be faced with a variety of spelling that would make intelligent communication impossible. Uniformity, and consequently rigidity, is the price of intercourse; and yet pronunciation varies from individual to individual. This is the problem that all spelling reformers must face, and face with growing knowledge of the impossibility of their task."

কথাটা খুবই খাঁটি। তবে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে যখন রূপ ও ধ্বনির অসামঞ্জস্য অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া দাঁড়ায়, তখন কতকটা সামঞ্জস্য-চেষ্টা মন্দ নয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সুবিন্যস্ত সংস্কৃত বর্ণমালার উপরই বাঙ্গালা ভাষা দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনিতে ও রূপেতে মারাত্মক প্রভেদ দাঁড়ায় নাই, যেমন দাঁড়াইয়াছে অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত রোমক বর্ণমালার উপর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে, এবং ইংরাজীতে ত ইহার নিদর্শন একেবারে চরম। এক হিন্দুস্থানী অধ্যাপক নাকি একদা বলিয়াছিলেন, "আংরেজী বাত বহুত্ তাজ্জব বাত্ হৈ; আংরেজ লোগ বোল্‌তে হৈঁ 'নালিজ' (nolej-এর হিন্দী বিকৃতি), ঔর লিখ্‌তে হৈঁ 'ক্-না-উ-লে-ড্-গে' (k-n-o-w-l-e-d-g-e)।" বাঙ্গালাতে ধ্বনি এবং রূপের মধ্যে এমন কোন গুরুতর তালাক অদ্যাবধি হয় নাই। শুধু যা কিছু গোলমাল এবং অসুবিধা হয় তাহা এই কারণে যে, সংস্কৃতের বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণের ধ্বনি বাঙ্গালাতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

স্বরবর্ণের মধ্যে অ (সংস্কৃতে উচ্চারণ, হ্রস্ব-আ), ঋ (সংস্কৃতে উচ্চারণ, র্-র্-র্), ঌ (সংস্কৃতে উচ্চারণ, ল্-ল্-ল্), এ (সংস্কৃতে diphthong বা সন্ধ্যক্ষর, উচ্চারণ অ অর্থাৎ হ্রস্ব-আ+অন্তঃস্থ য়), ঐ (সংস্কৃতে উচ্চারণ, দীর্ঘ আ+অন্তঃস্থ য়), ও (সংস্কৃতে সন্ধ্যক্ষর, উচ্চারণ অ অর্থাৎ হ্রস্ব-আ+অন্তঃস্থ ব), এবং ঔ (সংস্কৃতে উচ্চারণ, দীর্ঘ আ+অন্তঃস্থ ব)—এইগুলির ধ্বনি বাঙ্গালাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ; তাছাড়া, হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রভেদও খুব বেশী রক্ষিত হয় না। "অ" ত হ্রস্ব-আ হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া একেবারে নূতন একটা "অ" ধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছে। ঋ ঌ ত ব্যঞ্জন রি লি-তে পরিণত হইয়াছে; পশ্চিম ভারতে ঋ রু-তে পরিণত হইয়াছে ; যেমন, "রাধা-কৃষ্ণ"-কে তথায় বলা হয় "রাধাক্রুষ্ণ," "অমৃতাঞ্জন" ঔষধটির বিজ্ঞাপনে দেখা যায় "অম্রুতাঞ্জন," ইত্যাদি। "এ", "ও" ত সন্ধ্যক্ষর বা diphthong-এর ধর্ম্ম একদম পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র এক একটি simple vowel-এ পরিণত হইয়াছে। "ঐ" "ঔ" diphthong রহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের উচ্চারণ সংস্কৃতানুরূপ নহে ; হিন্দীতে উহাদের উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃতানুযায়ী। সংস্কৃত উচ্চারণ জানা থাকিলে আর সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির অদ্ভুত রূপান্তরগুলি অদ্ভুত মনে হয় না। তখন সহজেই বুঝা যায় যে, দেব+ঋষিঃ=দেবর্ষিঃ ; মহা+ঋষিঃ=মহর্ষিঃ ; নে+অনম্=নয়নম্ ; নৈ+অকঃ=নায়কঃ ; ভো+অনম্=ভবনম্ ; পৌ+অকঃ=পাবকঃ ; ইত্যাদি কেন হয়। তাছাড়া, বাঙ্গালাতে আরও একটি স্বরধ্বনি দেখা যায়—"cat"-এর ধ্বনি—যাহা সংস্কৃতে ছিল না, সুতরাং সংস্কৃত বর্ণমালায় যাহার কোন প্রতিরূপ নাই ; কাজেই বাঙ্গালাতে কোথাও "এ" দিয়া, কোথাও য-ফলাতে আকার দিয়া ইহা প্রকাশ করা হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে দুই "ন", তিন "স," দুই "ব", দুই "জ"-এর উচ্চারণ একই রকম হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলে ; ঙ, ঞ-এর উচ্চারণ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ; ক্ষ, ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলারও উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মোটামুটি এই ব্যাপার।

ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে। বর্ত্তমানে যে রূপের যে ধ্বনি বা sound-value দাঁড়াইয়াছে, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে; যেখানে একই ধ্বনির একাধিক রূপ দাঁড়াইয়াছে, সেখানেও বেশী মাথা ঘামাইবার দরকার করে না; ব্যবহার এবং প্রয়োগের "অমোঘ শাসন" বাঙ্গালাতেও অন্যভাষা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে; তদনুসারে "ন" "ন"-ই থাকিবে, "ণ" "ণ"-ই থাকিবে, কোনটাকেই বিতাড়িত করিবার দরকার নাই; কারণ, বাঙ্গালাতে অসংখ্য সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব্দ আছে (অর্থাৎ তৎসম ও তদ্ভব), তাহাতে তিন "স", দুই "ন", দুই "জ", ইত্যাদি বিরাজ করিবেই। কেবল একদম অসংস্কৃত শব্দে কোন একটা রূপ প্রচলনের চেষ্টা চলিতে পারে—মাত্র সেই সব স্থলে, যেখানে রূপের এখনও stability দাঁড়ায় নাই।

প্রাচীন ভাষা হইতে আহৃত বর্ণমালার এইরূপ ধ্বনিবিকারের উদাহরণ যে শুধু বাঙ্গালাতেই আছে, এমন নহে; সমস্ত জীবন্ত ভাষাতেই আছে। ইউরোপীয় ভাষা হইতে দুই একটি উদাহরণ দিলে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ধরুন, লাটিন বর্ণমালার "c" অক্ষর; ইউরোপীয় নানা ভাষায় ইহার নানাবিধ ধ্বনিবিকার ঘটিয়াছে। ইংরাজীতে "c" একেবারেই অনাবশ্যক অক্ষর—হয় ইহা "k", নয় "s"—তা বলিয়া বাঙ্গালায় "ণ" বর্জ্জনের ন্যায় ইংরাজীতে "c" বর্জ্জনপ্রচেষ্টা প্রকট হয় নাই—"action"-ই লেখে "aktion" লেখে না, "civilization"-ই লেখে "sivilization" লেখে না। ফরাসীতেও তদ্রূপ "c"-এর দ্বিবিধ উচ্চারণ; তবে "s" উচ্চারণের সময়ে c-এর নীচে একটি cedilla (ç) ব্যবহৃত হয়—a, o, এবং u-এর পূর্ব্বে c বসিলে। জার্ম্মাণেও তদ্রূপ, "k" এবং "ts"। ইটালিয়ানেও তদ্রূপ, "k" এবং "চ" (যেমন, Duce-এর উচ্চারণ, দুচে)। স্পানিশেও তদ্রূপ "k" এবং "থ" (যেমন, Cervantes-এর উচ্চারণ, থের্ভান্তেস্)। আবার আর একটা মজার জিনিষ আছে। ইউরোপীয় প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই "চ"-এর ধ্বনি

আছে কিন্তু রূপ নাই। কত রকমে "চ" ধ্বনি প্রকাশ করা হয় তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইংরাজীতে "ch", ফরাসীতে "tch", জার্ম্মাণে "tsch" (যেমন, "কাম্‌চাট্‌কা" লেখা হয় Kamtschatka), পোলিশে "cz", হাঙ্গেরিয়ানে "cs", ইত্যাদি নানা ভাবে নানা বর্ণসমবায়ে "চ" ধ্বনি প্রকাশ করা হয়। তেমনি "জ" ধ্বনি; ইংরাজীতে "j"এর জ-ধ্বনি হওয়ায় সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু ফরাসীতে ও পোর্টুগীজে j = zh, জার্ম্মাণে ও ইটালিয়ানে j = y (যেমন, Jena-র উচ্চারণ য়েনা, Ajaccio-র উচ্চারণ আয়াচ্চো), স্পানিশে j = জার্ম্মাণ ch (বা খ্‌ খ্‌ খ্‌ ধ্বনির মত কতকটা), ইত্যাদি হওয়াতে তাহাদিগকেও অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে; যেমন, "জ" ধ্বনি বুঝাইতে ফরাসীতে "dj", জার্ম্মাণে "dsch" ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি। জার্ম্মাণে v = লাটিন f, w = লাটিন v, z = ts হইয়া গিয়াছে। ইহাতে complain করিয়া কি হইবে? বর্ত্তমানে যে ভাষায় বর্ণরূপের যে ধ্বনি প্রচলিত তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা "সাধু" ভাষার "তৎসম" শব্দের বর্ণমালাই যে প্রবঞ্চনার দায়ে দোষী হইয়া আপনার বিচারে "অসাধু" বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য * তাহা নহে; সমস্ত জীবন্ত ভাষার প্রচলিত বর্ণমালাকেই এ বিষয়ে আসামী করা যাইতে পারে।

* "বাংলাভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু ধ্বনিটা তার স্বকীয়। ধ্বনিবিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি। বানানের জোরেই বাংলা আপন অপভ্রংশত্ব চাপা দিতে চায়। এই কারণে বাংলাভাষার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান।...... বর্ণপ্রলেপের যোগে সবর্ণত্ব প্রমাণ ক'রে দেবার চেষ্টা ক্রমাগতই চলছে।... আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের দাবী ক'রে থাকি কৃত্রিম দলিলের জোরে।" শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, "বাংলা বানান" ("প্রবাসী", পৌষ, ১৩৪৩)।

"আমাদের দেশের পূর্বতন আদর্শ খুব বিশুদ্ধ। বানানের এমন খাঁটি নিয়ম পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় আছে বলে জানিনে। সংস্কৃত ভাষা খুব সূক্ষ্ম বিচার করে উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সদ্ব্যবহার রক্ষা করেছেন। একেই বলা যায় honesty, যথার্থ সাধুতা। বাংলা সাধুভাষাকে honest ভাষা বলা চলে না, মাতৃভাষাকে সে প্রবঞ্চনা করেছে।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বানান-বিধি" ("প্রবাসী", আষাঢ়, ১৩৪৪)।

দ্বিতীয়তঃ,"তদ্ভব", বা খাঁটি দেশজ, এবং বৈদেশিক ভাষা হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দ সম্বন্ধে উচ্চারণানুযায়ী বাণান করা বিষয়ে যে প্রস্তাব আপনি অনুমোদন করেন, সে সম্বন্ধেও প্রসঙ্গতঃ উপরেই অনেক কথা বলা হইয়াছে। তবে যেখানে ব্যুৎপত্তি বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত না হয়, সেখানে উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাসের চেষ্টা করা যাইতে পারে; বস্তুতঃ তাহা করাও হইয়া থাকে, লিখি "বিড়াল" আর পড়ি "মেকুর", এ রকম বড় একটা দেখা যায় না।

"প্রবাসী"-র প্রবন্ধে "ইলেক্"-এর উপর আপনি খুব খড়্গহস্ত হইয়াছেন দেখিতে পাইলাম—ওকারের পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়া* ; কিন্তু খড়্গহস্ত হইবার কোন কারণ দেখি না; কারণ, ইলেক্টা কেহ খাম্খা দেয় না, যেখানে কোন বর্ণ লোপ পাইয়াছে বা elision হইয়াছে, সেইখানেই বর্ণ-লোপের চিহ্নস্বরূপ ইলেক্ দেওয়া হয়। যেমন "হইল"-এর "ই" লোপ হইয়া "হ'ল" ভাবে লেখা হয়—আপনারা রাঢ়দেশে ই-কারের লোপ হেতু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অ-কারকে ও-কার ভাবে উচ্চারণ করেন—যেমন আপনারা পশ্চিমবঙ্গে মদ্য = ম + ই + দ্দ (পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চারিত)-কে "মোদ্দো" বলেন। আপনারা বলেন "হোলো," আমরা পূর্ব্ববঙ্গে বলি "হইল"। সে যাহাই হউক, ইলেক্টা যে একটা নিরর্থক unmitigated nuisance—শুধু vexation of spirit—শব্দতত্ত্বের দিক্ হইতে মোটেই একথা বলা চলে না।

---

* "যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে হরিজনবর্গ থেকে উপরের পংক্তিতে উঠেছে, তার উচ্চারণ ওকারবহুল একথা মানতে হবে। অনেক মেয়েদের চিঠিতে দেখেছি তাঁদের ওকারভীতি একেবারেই নেই। তাঁরা মুখে বলেন 'হোলো,' লেখাতেও লেখেন তাই। কোরচি, কোরবো, লিখতে তাঁদের কলম কাঁপে না। ওকারের স্থলে অর্ধকুণ্ডলী ইলেক চিহ্ন ব্যবহার করে তাঁরা ঐ নিরপরাধ স্বরবর্ণটার চেহারা চাপা দিতে চান না। বাংলা প্রাকৃতের বিশেষত্বঘোষণার প্রধান নকিব হোলো ঐ ওকার, ইলেক চিহ্নে বা অচিহ্নে ওর মুখ চাপা দেবার ষড়যন্ত্র আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয় না।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বানান-বিধি" ("প্রবাসী," আষাঢ়, ১৩৪৪)।

ইংরাজীর apostrophe s ('s)-এর যে ইলেক্ তাহাও এই কারণেই সঞ্জাত। ফরাসী circumflex চিহ্ন, যেমন *bête*, তাহাও বহুল পরিমাণে elision হইতেই উদ্ভূত; লাটিন *bestia* হইতে Old French *beste*; তারপর s লোপ হইয়া *bête*—এই একই মূল হইতে ইংরাজী beast। শুধু ইলেক্ বা elision-এর বিষয়ে নহে, অনেক বিষয়েই শব্দের বর্ত্তমান রূপে প্রাচীন রূপের vestige বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ভাষার ব্যুৎপত্তি বুঝিবার পক্ষে ও ইতিহাস জানিবার পক্ষে, সেই সব অনুচ্চারিত vestige-এরও যথেষ্ট মূল্য আছে। যে ইংরাজী "through" শব্দের ইয়াঙ্কি সংস্করণ "thru" রূপে আপনি খুব উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন দেখিলাম *—বোধ করি moral courage-এর দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া—তাহারও "gh" অক্ষরদ্বয় আকাশ হইতে পড়ে নাই, উহার মূল ভাষার ভিত্তিভূমিতেই শিকড় গাড়িয়া রহিয়াছে —য্যাংগ্লো-স্যাক্সন *thurh*, জার্ম্মাণ *durch* হইতেই এই শব্দের উদ্ভব। মূলের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া হয়ত এই দৃষ্টিকটু "through" রূপই বাঁচিয়া থাকিবে, এবং হয়ত ইয়াঙ্কিস্থানের অমূলক "thru" রূপটি কিয়দ্দিন পরেই তাহার orchid-লীলা সংবরণ করিবে! ভাষার রাজ্যে কখন যে কি হয় কিছু বলা যায় না। ইলেকের বিষয় এই পর্য্যন্ত।

বস্তুতঃ উচ্চারণানুযায়ী বাণানের mania একবার পাইয়া বসিলে শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা আজকালকার "তরুণ" ব্যাকরণবর্জ্জিত লেখকগণের "য্যামোন," "ত্যামোন," "এ্যামোন," ইত্যাদি রূপই দেখাইয়া

* "মার্কিনদেশীয় বানানে through শব্দ থেকে তিনটে বেকার অক্ষর বর্জন ক'রে বর্ণবিন্যাসে যে পাগলামির উপশম করা হলো আমাদের রাজত্বে সেটা গ্রহণ করবার যদি বাধা না থাকত তা হলে সেই সঙ্গে বাঙালির ছেলের অজীর্ণ রোগের সেই পরিমাণ উপশম হতে পারত। কিন্তু ইংরেজ আচারনিষ্ঠ, বাঙালির কথা বলাই বাহুল্য। ...এই সম্বন্ধে রাজায় প্রজায় মনোভাবের সামঞ্জস্য দেখা যায়।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বানান-বিধি" ("প্রবাসী," আষাঢ়, ১৩৪৪)।

দিতেছে। ইহার উপরে আবার বন্ধুবর সুনীতি চাটুয্যে মহাশয় বলেন যে, "যদ্"-শব্দজ যাবতীয় কথা "জ" দিয়া লেখা উচিত, অর্থাৎ এবার আর যেমন তেমন নহে—একেবারে "জ্যামোন্"। তাই ত আমাদের ন্যায় বঙ্গদেশীয়গণ অর্থাৎ বাঙ্গালগণ রাঢ় ও সুহ্ম প্রদেশের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া "ক্যাবোল্" ভাবিতেছে—"কাণ্ডোডা হইলে ক্যামোন্?" ("হইলে"-র উচ্চারণ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য: আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালদের "হ্" উচ্চারণ রাঢ়ীয় উচ্চারণ নহে, অতটা মহাপ্রাণ নহে; ইহার nearest equivalent আমি দেখি ফরাসী aspirated h-এ)।

বস্তুতঃ আপনার প্রস্তাবিত প্রাকৃত বাঙ্গালার বর্ণবিন্যাসে উচ্ছৃঙ্খলতা-দমনপ্রচেষ্টা (যে প্রস্তাবের ফলেই শুনিতে পাই বাণান-সমিতির উদ্ভব), এবং আপনার অনুমোদিত ঠিক ঠিক উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাস-প্রচেষ্টা—এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টা পরস্পরবিরুদ্ধ; কারণ, উচ্চারণবৈষম্য থাকিবেই এবং তদনুসারে বাণান করিতে হইলে বাণানেও বৈষম্য হইবে এবং তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খলতা বা বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। ইহাদের মধ্যে কোন না কোন স্থানে compromise করিতেই হইবে; এবং তথাকথিত "সাধু" ভাষা এই compromise-এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। আপনি যে এই সাধুভাষার প্রতি এতটা বিরূপ কেন, এবং ইহার প্রতি আজকাল আপনি যে এতটা বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন কেন, তাহা সত্যই আমি বুঝিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল যে সাধুভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে, অন্ততঃ সাধুভাষায় ব্যবহৃত বাঙ্গালার ক্রিয়াপদগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে, এই আষাঢ় মাসের "প্রবাসী"-র প্রবন্ধে আপনি একটি অতি বিচিত্র theory খাড়া করিয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন,

"অল্প কিছুকাল মাত্র পূর্ব্বে গড়-উইলিয়মের গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন, তাতে বাংলার ক্রিয়াপদগুলিকে

আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোস পরিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে কিন্তু তেমনি প্রাকৃতও নয়।"

এটা খুব মৌলিক আবিষ্কার বটে। এই theory-টি বিখ্যাত স্কচ্ দার্শনিক Dugald Stewart-এর সংস্কৃত ভাষা উৎপত্তির theory-টিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা কুত্রাপি কস্মিন্‌কালেও ছিল না; উহা কতিপয় ভারতীয় পণ্ডিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বিদেশীদিগকে জব্দ করিবার নিমিত্ত "ং" "ঃ" প্রভৃতির দ্বারা কণ্টকিত করিয়া দুর্ব্বোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছে।

আপনার এই theory-টিও তদ্বৎ। আমার ত ধারণা যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদিগের আর যত দোষই থাকুক না কেন, নূতন ভাষা মস্তিষ্ক হইতে সৃষ্টি করিবার স্পর্দ্ধা আধুনিক বিশ্বপণ্ডিতদিগের ন্যায় তাঁহাদের ছিল না; এবং সেইজন্যই বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহারে তাঁহারা যতই সংস্কৃত ঘেঁষা হউন না কেন, ক্রিয়াপদের বিভক্তি ব্যবহারে একেবারে প্রচলিত বাঙ্গালা প্রয়োগই তাঁহারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাই তাঁহাদের হস্তে "কোকিল-কলালাপবাচাল মলয়ানিল উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে"। ওদিকে মলয়ানিলের যতই সংস্কৃত দাপট থাকুক না কেন, আসিবার সময় একেবারে বাঙ্গালা হইয়াই "আসিয়াছে"। তাঁহারা "এসেছে" না লিখিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কোন দোষ ধরা যায় না—কারণ, "এসেছে" একটা dialectical form মাত্র, যেমন "আইছে" আর একটা dialectical form, "আইসাছে" আর একটা dialectical form; সুতরাং প্রাকৃত বাঙ্গালারই শিষ্টপ্রয়োগে এই সব form তাঁহারা ব্যবহার করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গভাষাভাষীদিগের বিবিধ dialectical form-এর সমন্বয়ক্ষেত্র সাধুভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের রূপ;

অথবা উল্টাভাবে বলা যাইতে পারে যে, এই সাধুভাষার ক্রিয়াপদের রূপই vulgarized হইয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, যেমন সংস্কৃত ভাষা vulgarized হইয়া নানাবিধ প্রাকৃতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের এই যে সাধুভাষার রূপ—করিয়া, করিলাম, করিব, করিতেছি, করিতেছিলাম, করিয়াছি, করিয়াছিলাম, করিতে, করিবার, করিলে, ইত্যাদি—ইহাদের সৃষ্টির জন্য গড়-ইউলিয়ম কলেজকে "অপরাধী" (?) করিলে কিঞ্চিৎ অন্যায়ই করা হয়। কারণ, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, প্রভৃতি এই সব রূপ ভূরি ভূরি ব্যবহার করিয়াছেন—অথচ ইঁহাদের কেহই যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন, ইহা অন্ততঃ আমার ত জানা নাই।

আর দুই একটি কথা বলিয়াই আমার এই সুদীর্ঘ পত্র সারা করি। অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বাঙ্গালাতে প্রায় সর্ব্বত্রই হয়; শুধু দ্ব্যক্ষর-বিশিষ্ট বিশেষণ শব্দে প্রায়ই হয় না—এই যে নিয়ম আপনি দেখাইয়াছেন, ইহা অতি সুপরিচিত নিয়ম; ইহার সঙ্গে এটুকুও যোগ করা যাইতে পারে যে, শেষের অকারান্ত অক্ষরটি যুক্তাক্ষর হইলে হসন্ত উচ্চারণ হয় না এবং সংস্কৃত "ক্ত"-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন বিশেষণ শব্দ সচরাচর হসন্ত উচ্চারিত হয় না। কিন্তু এই নিয়মটির ফলে যে সিদ্ধান্তে আপনি উপনীত হইয়াছেন বাণান সম্বন্ধে, আমার নিজের সিদ্ধান্ত তদ্বিপরীত। আমি বলি (এবং আমার ন্যায় আরও অনেকেই বলেন) যে, যখন এইরূপ একটি সুস্পষ্ট নিয়মই পাওয়া যাইতেছে, তখন অ-কারান্ত যে প্রচলিত বাণান তাহা রাখিলেও কোন ক্ষতি নাই; context হইতেই বিশেষণ কি না বুঝা যায়, এবং তদনুযায়ী উচ্চারণ করিতে কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং, দৃষ্টান্তস্বরূপ, "মতন" শব্দ হইতে উৎপন্ন যে "মত" শব্দ, তাহাকে "মতো" লিখিবার কোন আবশ্যকতা নাই; "মন্‌+(ভাবে) ক্ত" দ্বারা যে বিশেষ্য "মত" শব্দ সিদ্ধ হয়, সে শব্দ হইতে ইহার পৃথক্ উচ্চারণ সহজেই ধরা যায়।

আর একটি কথা আপনি লিখিয়াছেন, সংস্কৃত "এব" (কিংবা "হি") শব্দের অপভ্রংশ "ই," এবং সংস্কৃত "অপি" শব্দের অপভ্রংশ "ও" —এই অব্যয়দ্বয় সম্পর্কে। আপনার মতে এই "ই" এবং "ও" এই particle-দ্বয় বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণ করিবার "মুদ্রাভঙ্গীর সঙ্কেতচিহ্ন" মাত্র।* আমার ত তাহা মনে হয় না। ইংরাজীতে "of" যেমন অনেক সময়ে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া "o' " রূপ ধারণ করে, কিন্তু তাহাতে উহা যে "of"-ই তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; সেইরূপ "ই" এবং "ও" একেবারেই "এব" এবং "অপি"—ছোট্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদের সার্থকত্বও ঘুচে নাই, অব্যয়ত্বও ঘুচে নাই। ইহারা স্বতন্ত্র শব্দই, তবে বিশেষ্যের কিংবা বিশেষণের কিংবা ক্রিয়াপদের সঙ্গে ব্যবহার হয় এই মাত্র তফাৎ। পূরাপূরি যে অব্যয় শব্দ "এব" এবং "অপি", তাহারাও এইরূপই অন্য শব্দের সাহচর্য্যই করিয়া থাকে; "আকাশস্থো নিরালম্বঃ" ভাবে খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে না। তাই যদি হয়, তবে উক্ত particle-দ্বয়ের অস্তিত্ব ঘুচাইবার জন্য আপনি এত লালায়িত কেন? এবিষয়ে আমি ত কোন কারণই দেখিতে পাই না।

আবার উল্টাদিকে বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনার কথা ও যুক্তি মানিয়া লইয়া যদি "যখনই", "তখনই", "আমারও", "কাহারও", "কোনও", "কখনও", ইত্যাদিকে "যখনি", "তখনি", "আমারো", "কাহারো", "কোনো", "কখনো", ইত্যাদি লিখি, তবে "ভাতি (ভাতই) বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য, তবে মাঝে মাঝে তাহারা দুধো (দুধও) খাইয়া থাকে, আবার

* "বাংলা শব্দে কতকগুলি মুদ্রাভঙ্গী আছে। ভঙ্গীসঙ্কেত যেমন অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে যুক্ত এগুলিও তেমনি। যে মানুষ রেগেছে তার হাত থেকে ছুরিটা নেওয়া চলে, কিন্তু ভ্রূর থেকে ভ্রূকুটি নেওয়া যায় না। যেমনি, তখনি, আমারো, কারো, কোনো, কখনো শব্দে ইকার এবং ওকার কেবলমাত্র ঝোঁক দেবার জন্যে। ওরা শব্দের অনুবর্তী না হয়ে, যথাসম্ভব তার অঙ্গীভূত থাকাই ভালো।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বানান-বিধি" ("প্রবাসী", আষাঢ়, ১৩৪৪)।

মাছো (মাছও) খুব ভালবাসে"; "আর বলেন কেন? দিনি (দিনই) বল, রাতি (রাতই) বল, মোটে সময়ি (সময়ই) পাই না"; ইত্যাদি ভাবেই বা না লিখিব কেন? যুক্তি একই (বা একি—এ কি কিন্তু নয়)। আর এক কথা বলি। যখন উচ্চারণের মাত্রাভেদ অথবা stress ভেদ করিবার জন্য আপনি কোন কোন স্থলে "কি" শব্দকে "কী"-রূপে লেখেন, তখন আপনার মতানুসারে "যখনই" "তখনই" প্রভৃতিকে "যখনী" "তখনী" লেখাই উচিত; এবং তদনুসারে দুইদিন বাদে "ভাতী" বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য হইয়া উঠিবে। আমার ত মনে হয়, "ই" এবং "ও" অব্যয়াত্মক particle-দ্বয়ের প্রতি আপনি অযথা নির্ম্মম ব্যবহার করিতেছেন। উহারা শব্দের একান্তে কায়ক্লেশে কথঞ্চিৎ আপনাদিগের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে, উহাদের প্রতি আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির এত খরদৃষ্টি কেন?

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।

যাক, অনেক বক্ বক্ করিলাম। আপনার প্রশ্রয় পাইয়া আপনার কর্ণপীড়া ও বিশ্রামপীড়া নিশ্চয়ই উৎপাদন করিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কিন্তু সন্দেহমাত্রং নাস্তি। জন্তুবিশেষের সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে একটি প্রবচন আছে—Give him an inch and he will take an ell—আমারও হইয়াছে তদবস্থা; আপনার সুদীর্ঘ পত্রই আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাইয়াছে।

এখন রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব—অর্থাৎ যেটি বাণান-কমিটির মতে আমার favourite fad—সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্গিরণ করিয়া পালা সাঙ্গ করি। আমার বক্তব্য এই—এবং আপনি প্রকারান্তরে আপনার চিঠিতে আমাকে সমর্থনই করিয়াছেন—যে, ভাষায় যে বাণান একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়াস অবাঞ্ছনীয়—প্রয়োগের দাপটে, যেমন আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, বহু ব্যাকরণদুষ্ট পদও চলিয়া গিয়াছে, যেমন, সৃজন, ইতিমধ্যে, জাগ্রত, সক্ষম, সততা, ইত্যাদি; তেমনই যে বাণান

ব্যাকরণসম্মত এবং যাহা ভাষায় একেবারে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা ত মানিয়া লইতেই হইবে। প্রচলিত ব্যাকরণদুষ্ট পদও চলিবে অথচ প্রচলিত ব্যাকরণসম্মত পদ চলিবে না, এমন কথা একান্তই অশ্রদ্ধেয়। যে সব স্থলে বর্ণ-দ্বিত্ব হয়, তথায় এইরূপ প্রয়োগ যে কত পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমি চন্দননগরের বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়মে রক্ষিত একটি শিলালিপিতে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত একটি সংস্কৃত লেখা এইভাবে লেখা আছে :

"শ্রীরস্তু

শাকে পঞ্চপঞ্চাশদধিকচতুর্দ্দশশতাব্দিতে মধ্যে শ্রীশ্রীমন্মহামুদ সাহ নৃপতেঃ সময়ে নূরবাজ খাঁনপুত্র মহাপাত্রাধিপাত্র শ্রীমৎ ফরাস খাঁনেন সংক্রমোয়ং বিনির্ম্মিত ইতি।"

এই শিলালিপির তারিখ ১৪৫৫ শকাব্দ বা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বৎসর। বাঙ্গালায় বর্ণ-বিন্যাসের এত পুরাতন নজীর আমি বাণান-সমিতির "ভট্টাচার্য"-আখ্যাধারী পণ্ডিতদ্বয়ের অলোক-সামান্য আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। তা যে রকম বিপদ্‌ই আসুক না কেন। ভরসা করি, আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত বিপদ্‌ই কাটাইয়া উঠিয়া বাহাল তবিয়তে বিরাজ করিতে পারিব।

এই পত্রস্থ আমার বিপুল বাচালতা আপনি মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই পুনরায় আমার বিনীত প্রার্থনা।

আশা করি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র)

ওঁ

আলমোড়া

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আলোচ্য বিষয়টি সুরু করবার পূর্বে অপ্রাসঙ্গিক ছোটো কথাটিকে সেরে নেওয়া যাক। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে আপনার পত্রে আমি "দায়ী" শব্দে হ্রস্ব ইকার প্রয়োগ করেছি। যদি আপনি ঠিকমতো পড়ে থাকেন তবে আমার পক্ষে বক্তব্য এই যে ঐ শব্দটির স্বরলাঘব আমার দ্বারা আর কখনোই ঘটেনি। আপনার চিঠিতেই এই প্রথম স্খলন হোলো তার দুটি কারণ থাকতে পারে, এক বেপথু, আর এক জরাজনিত মনোযোগের দুর্বলতা। বোধ করি শেষোক্ত কারণটিই সত্য। আজকাল এরকম প্রমাদ আমার সর্বদাই ঘটে থাকে, সেজন্য আমি ক্ষমার যোগ্য। আপনার ৭৭ বছর বয়সের জন্যে আমি অপেক্ষা করতে পারব না—যদি পারতুম তবে আপনার পত্রের এই অংশের প্রত্যুত্তর দেবার উপলক্ষ্য তখন হয়তো পাওয়া যেত।

আমি পূর্বেই কবুল করেছি যে, কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে আমি ব্যাকরণে কাঁচা। অতএব প্রাকৃত বাংলায় তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তর্ক করবার অধিকার আমার নেই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বানানের বিচার আমার মতের অপেক্ষা করে না। কেবল আমার মতো অনভিজ্ঞ ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কর্তব্য তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা। যেখানে তাঁদের অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতেই হবে। অন্যত্র নয়। বানানসংস্কারসমিতি বোপদেবের তিরস্কার বাঁচিয়েও রেফের পর দ্বিত্ববর্জনের যে বিধান দিয়েছেন সেজন্য নবজাত ও অজাত প্রজাবর্গের হয়ে তাঁদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি।

বিশেষজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই দুর্লভ। ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম একথা মানতেই হবে। অথচ তাঁদের অনেকেরি অন্য এমন গুণ থাকতে পারে যাতে একোহি দোষো গুণসন্নিপাতের জন্য সাহিত্যব্যবহার থেকে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া চলবে না। এঁদের জন্যেই কোনো একটি প্রামাণ্য শাসনকেন্দ্র থেকে সাহিত্যে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্যবিধি প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। আইন বানাবার অধিকার তাঁদেরই আছে আইন মানাবার ক্ষমতা আছে যাঁদের হাতে। আইনবিজ্ঞায় যাঁদের জুড়ি কেউ নেই ঘরে বসে তাঁরা আইনকর্তাদের পরে কটাক্ষপাত করতে পারেন কিন্তু কর্তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আইন তাঁরা চালাতে পারবেন না। এই কথাটা চিন্তা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাকা করে দেবার জন্যে দরখাস্ত জানিয়েছিলেম। অনেকদিন ধরে বানান সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার নিজেও করেছি অন্যকেও করতে দেখেছি। কিন্তু অপরাধ করবার অবাধ স্বাধীনতাকে অপরাধীও মনে মনে নিন্দা করে, আমিও করে এসেছি। সর্বসাধারণের হয়ে এর প্রতিবিধানভার ব্যক্তিবিশেষের উপর দেওয়া চলে না—সেই জন্যেই পীড়িত চিত্তে মহতের শরণাপন্ন হতে হোলো। আপনার চিঠির ভাষার ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে বানানসংস্কারসমিতির "হোমরা চোমরা" পণ্ডিতদের প্রতি আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই। এই অশ্রদ্ধা আপনাকেই সাজে কিন্তু আমাকে তো সাজে না, আর আমার মতো বিপুল-সংখ্যক অভাজনদেরও সাজে না। নিজে হাল ধরতে শিখি নি, কর্ণধারকে খুঁজি—যে-সে এসে নিজেকে কর্ণধার বলে ঘোষণা করলেও তাদের হাতে হাল ছেড়ে দিতে সাহস হয় না, কেননা, এতে প্রাণের দায় আছে।

এমন সন্দেহ আপনার মনে হতেও পারে যে সমিতির সকল সদস্যই সকল বিধিরই যে অনুমোদন করেন তা সত্য নয়। না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আপোসে নিষ্পত্তি করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত স্বাক্ষরের দ্বারা এই কথারই প্রমাণ হয় যে এতে তাঁদের সম্মিলিত সমর্থন আছে। যৌথকারবারের

অধিনেতারা সকলেই সকল বিষয়েই একমত কিনা, এবং তাঁরা কেউ কেউ কর্তব্যে ঔদাস্য করেছেন কিনা সে খুঁটিনাটি সাধারণে জানেও না জানতে পারেও না। তারা এইটুকু জানে যে স্বাক্ষরদাতা ডিরেক্টরদের প্রত্যেকেরই সম্মিলিত দায়িত্ব আছে। ("বশিত্ব" "কৃতিত্ব" প্রভৃতি ইন্‌ভাগান্ত শব্দে যদি হ্রস্ব ইকার প্রয়োগই বিধিসঙ্গত হয় তবে দায়িত্ব শব্দেও ইকার খাটতে পারে বলে আমি অনুমান করি)। আমরাও বানানসমিতিকে এক বলে গণ্য করচি এবং তাঁদের বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত হচ্চি। যেখানে স্বস্বপ্রধান দেবতা অনেক আছে সেখানে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। অতএব বাংলা তৎসম শব্দের বানানে রেফের পর দ্বিত্ববর্জনের যে বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হয়েছে সেটা সবিনয়ে আমিও স্বীকার করে নেব।

কিন্তু যে-প্রস্তাবটি ছিল বানানসমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত তৎসম শব্দসম্পর্কীয় নয়। প্রাকৃত বাংলা যখন থেকেই সাহিত্যে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করল তখন থেকেই তার বানানসাম্য নির্দিষ্ট করে দেবার সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই—যাঁরা সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই তাঁরা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি, কেননা আজো তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের ভিৎ পাকা করার কাজ সুরু করবার সময় এসেছে। এতদিন এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করে নি। এই কারণে সুনীতিকেই* এই ভার নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিসেরও জোর। সেই জন্যে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমন কি, আমার

* ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্. এ., ডি. লিট্.।

নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল। আমার সংস্কার, প্রুফ-শোধকের সংস্কার, কাপিকারকের সংস্কার, কম্পোজিটরের সংস্কার এবং যে সব পত্রিকায় লেখা পাঠানো যেত তার সম্পাদকদের সংস্কার এই সব মিলে পাঁচ ভূতের কীর্তন চলত। উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি নিয়ামক হন, এবং দণ্ডপুরস্কারের দ্বারা তাঁর নিয়ন্তৃত্ব যদি বল পায় তাহলেই বানানের রাজ্যে একটা শৃঙ্খলা হতে পারে। নইলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদের মতো বিচক্ষণ লোকের দ্বারে দ্বারে মত সংগ্রহ করে বেড়ানো শিক্ষার পক্ষে যতই উপযোগী হোক কাজের পক্ষে হয় না।

কেন যে মুস্কিল হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। "বর্ণন" শব্দে আপনি যখন মূর্ধন্য ণ লাগান তখন সেটাকে যে মেনে নিই সে আপনার খাতিরে নয়, সংস্কৃত শব্দের বানান প্রতিষ্ঠিত স্বে মহিম্নি—নিজের মহিমায়। কিন্তু আপনি যখন "বানান" শব্দের মাঝখানটাতে মূর্ধন্য ণ চড়িয়ে দেন তখন ওটাকে আমি মানতে বাধ্য নই। প্রথমত এই বানানে আপনার বিধানকর্তা আপনি নিজেই—দ্বিতীয়ত আপনি কখনো বলেন প্রচলিত বানান মেনে নেওয়াই ভালো আবার যখন দেখি মূর্ধন্য ণ-লোলুপ নয়া বাংলা বানানবিধিতে আপনার ব্যক্তিগত আসক্তিকে সমর্থনের বেলায় আপনি দীর্ঘকাল প্রচলিত বানানকে উপেক্ষা করে উক্ত শব্দের বুকের উপর নবাগত মূর্ধন্য ণয়ের জয়ধ্বজা তুলে দিয়েছেন তখন বুঝতে পারিনে আপনি কোন্ মতে চলেন। জানিনে "কানপুর" শব্দের কানের উপর আপনার ব্যবহার নব্যমতে বা পুরাতন মতে। আমি এই সহজ কথাটা বুঝি যে প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোথাও নেই, নির্জীব ও নিরর্থক অক্ষরের সাহায্যে ঐ অক্ষরের বহুল আমদানি করে আপনাদের পাণ্ডিত্য কাকে সন্তুষ্ট করচে বোপদেবকে না কাত্যায়নকে। দুর্ভাগ্যক্রমে বানানসমিতিরও যদি ণ-এর প্রতি অহৈতুক অনুরাগ থাকত তাহলে দণ্ডবিধির জোরে সেই বানানবিধি আমিও মেনে নিতুম। কেননা আমি জানি আমি চিরকাল বাঁচব না কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বানানে শিক্ষালাভ করবে তাদের আয়ু আমার জীবনের মেয়াদ ছাড়িয়ে যাবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তিনি প্রাকৃত বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপ স্বীকার করবার পক্ষপাতী ছিলেন একথা বোধ হয় সকলের জানা আছে। সেকালকার যে-সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের কারো কারো হাতের লেখা বাংলা বানান আমার দেখা আছে। বানানসমিতির কাজ সহজ হোতো তাঁরা যদি উপস্থিত থাকতেন। সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির এক নূতন কীর্তি। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন শিথিল করে দেওয়া উচিত। বস্তুত এ'কেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া। এতকাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না নিয়ে যে বহু কোটি বাঙালি প্রতিদিন মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এই জন্য তাদের সেই খাঁটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে। এক কালে প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় যখন প্রাকৃত ভাষায় পালি ভাষায় আপন আপন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন ঠিক এই সমস্যাই উঠেছিল। যাঁরা সমাধান করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা বোঝার মতন চাপিয়ে যান নি জনসাধারণের পরে। যে অসংখ্য পাঠক ও লেখক পণ্ডিত নয় তাদের পথ তাঁরা অকৃত্রিম সত্যপন্থায় সরল করেই দিয়েছিলেন। নিজের পাণ্ডিত্য তাঁরা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক করেছিলেন বলেই এমনটি ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

আপনার চিঠিতে ইংরেজি ফরাসি প্রভৃতি ভাষার নজির দেখিয়ে আপনি বলেন ঐ সকল ভাষায় উচ্চারণে বানানে সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু এই নজিরের

সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি নে। ঐ সকল ভাষার লিখিত রূপ অতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসচে, এই পরিণতির মুখে কালে কালে যে সকল অসঙ্গতি ঘটেছে হঠাৎ তার সংশোধন দুঃসাধ্য। প্রাকৃত বাংলা ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাসপোর্ট্ পেয়েছে। এখন ওর বাণান নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তো। কালে কালে পুরোনো বাড়ির মত বৃষ্টিতে রৌদ্রে তাতে নানারকম দাগ ধরবে, সেই দাগ-গুলি সনাতনত্বের কৌলিন্য দাবী করতেও পারবে। কিন্তু রাজমিস্ত্রি কি গোড়াতেই নানা লোকের নানা অভিমত ও অভিরুচি অনুসরণ করে ইমারতে পুরাতন দাগের নকল করতে থাকবে? য়ুরোপীয় ভাষাগুলি যখন প্রথম লিখিত হচ্ছিল তখন কাজটা কী রকম করে আরম্ভ হয়েছিল তার ইতিহাস আমি জানি নে। আন্দাজ করচি কতক-গুলি খামখেয়ালি লোক মিলে একাজ করেন নি, যথাসম্ভব কানের সঙ্গে কলমের যোগরক্ষা করেই স্থরু করেছিলেন। তাও খুব সহজ নয়, এর মধ্যেও কারো কারো স্বেচ্ছাচার যে চলে নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে তো আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায় না—অতএব ব্যক্তিগত অভিরুচির অতীত কোনো নীতিকে যদি স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি তবে উচ্চারণকেই সামনে রেখে বানানকে গড়ে তোলা ভালো। প্রাচীন ব্যাকরণকর্তারা সেই কাজ করেছেন, তাঁরা অন্য কোনো ভাষার নজির মিলিয়ে কর্তব্য সহজ করেন নি।

এ প্রশ্ন করতে পারেন বানানবিধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার মেনে নেওয়াকেই যদি আমি শ্রেয় মনে করি তাহলে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করি কেন? প্রতিবাদ করি বিচারকদের সহায়তা করবার জন্যেই, বিদ্রোহ করবার জন্যে নয়। এখনো সংস্কার কাজের গাঁথুনি কাঁচা রয়েচে, এখনো পরিবর্তন চলবে, কিন্তু পরিবর্তন তাঁরাই করবেন, আমি করব না। তাঁরা আমার কথা যদি কিছু মেনে নেবার যোগ্য মনে করেন সে ভালোই,

যদি না মনে করেন তবে তাঁদের বিচারই আমি মেনে নেব। আমি সাধারণভাবে তাঁদের কাছে কেবল এই কথাটি জানিয়ে রাখব যে প্রাকৃত ভাষার স্বভাবকে পীড়িত করে তার উপরে সংস্কৃত ব্যাকরণের মোচড় দেওয়াকে যথার্থ পাণ্ডিত্য বলে না। একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত দেব। প্রচলিত উচ্চারণে আমরা বলি কোলকাতা, কলিকাতাও যদি কেউ বলতে ইচ্ছে করেন বলতে পারেন, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু ইংরেজ এই সহরটাকে উচ্চারণ করে ক্যালক্যাটা এবং লেখেও সেই অনুসারে। আপনিও বোধ হয় ইংরেজিতে এই সহরের ঠিকানা লেখবার সময় ক্যালক্যাটাই লেখেন, অথবা ক্যালক্যাটা লিখে কলিকাতা উচ্চারণ করেন না—অর্থাৎ যে জোরে প্রাকৃত বাংলায় আপনারা ষত্বণত্ব মেশীনগান চালাতে চেষ্টা করেন সে জোর এখানে প্রয়োগ করেন না। আপনি বোধ করি ইংরেজিতে চিটাগংকে চট্টগ্রাম সিলোনকে সিংহল বানান করে বানান ও উচ্চারণে গঙ্গাজলের ছিটে দেন না। ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করবামাত্রই যশোরকে আপনারা জেশোর বলেন, এমন কি মিত্রকে মিটার লেখার মধ্যেও অশুচিতা অনুভব করেন না। অতএব চোখে অঞ্জন দিলে কেউ নিন্দে করবে না, মুখে দিলে করবে। প্রাকৃত বাংলায় যা শুচি সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি।

আপনি আমার একটি কথা নিয়ে কিছু হাস্য করেছেন কিন্তু হাসি তো যুক্তি নয়। আমি বলেছিলেম বর্তমান সাধু বাংলা গদ্যভাষার ক্রিয়াপদগুলি গড় উইলিয়মের পণ্ডিতদের হাতে ক্ল্যাসিক ভঙ্গীর কাঠিন্য নিয়েছে। আপনি বলতে চান তা সত্য নয়। কিন্তু আপনার এই উক্তি তো সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্গত নয় অতএব আপনার কথায় আমি যদি সংশয় প্রকাশ করি তবে রাগ করবেন না। বিষয়টা আলোচনার যোগ্য। এককালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলুম। সেই সাহিত্যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ্য করেছিলুম। হয়

তো ভুল করেছিলুম। দয়া করে দৃষ্টান্ত দেখাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন ছাপাখানা চলন হবার পরে প্রাচীন গ্রন্থের উপর দিয়ে যে শুদ্ধির প্রক্রিয়া চলে এসেছে সেটা বাঁচিয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করবেন।

আর একটি কথা। ইলেক। আপনি বলেন লুপ্ত স্বরের চিহ্ন বলে ওটা স্বীকার্য কেননা ইংরেজিতে তার নজির আছে। "করিয়া" শব্দ থেকে ইকার বিদায় নিয়েছে অতএব তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে ইলেকের স্থাপনা। ইকারে আকারে মিলে একার হয়—সেই নিয়মে ইকার আকারের যোগে "করিয়া" থেকে "কোরে" হয়েছে। প্রথমবর্ণের ওকারটিও পরবর্তী ইকারের দ্বারা প্রভাবিত। যেখানে যথার্থই কোনো স্বর লুপ্ত হয়েছে অথচ অন্য স্বরের রূপান্তর ঘটায়নি এমন দৃষ্টান্তও আছে; যেমন ডাহিন দিক থেকে ডান দিক, বহিন থেকে বোন, বৈশাখ থেকে বোশেখ। এখনো এই সব লুপ্তস্বরের স্মরণচিহ্ন ব্যবহার ঘটেনি। গোধূম থেকে গম হয়েছে, এখানেও লুপ্ত উকারের শোকচিহ্ন দেখি নে। যে সকল শব্দে স্বরবর্ণ কেন, গোটা ব্যঞ্জন বর্ণ অন্তর্ধান করেছে সেখানেও চিহ্নের উপদ্রব নেই। মুখোপাধ্যায়ের পা-শব্দটি দৌড় দিয়ে নিজের অর্থরক্ষা করেছে, পদচিহ্নমাত্র পিছনে ফেলে রাখে নি,—এই সমস্ত তিরোভাবকে চিহ্নিত করবার জন্যে সমুদ্রপার থেকে চিহ্নের আমদানি করবার প্রয়োজন আছে কি? ইলেক না দিলে ওকার ব্যবহার করতে হয়, নইলে অসমাপিকার সূচনা হয় না। তাতে দোষ কী আছে।

পুনর্বার বলি আমি উকিল মাত্র, জজ নই। যুক্তি দেবার কাজ আমি করব, রায় দেবার পদ আমি পাই নি। রায় দেবার ভার যাঁরা পেয়েছেন আমার মতে তাঁরা শ্রদ্ধেয়।

বোধ হচ্চে আর একটি মাত্র কথা বাকি আছে। এখনি তখনি আমারো তোমারো শব্দের ইকার ওকারকে ঝোঁক দেবার কাজে ইঙ্গিতের মধ্যে গণ্য করে ওদুটোকে শব্দের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলেম।

তার প্রতিবাদে আপনি পরিহাসের সুরে বলেছেন, তবে কি বলতে হবে, আমরা ভাতি খাই রুটি খাইনে। দুটো প্রয়োগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেটা আপনি ধরতে পারেন নি। শব্দের উপরে ঝোঁক দেবার ভার কোনো-না-কোনো স্বরবর্ণ গ্রহণ করে। যখন আমরা বলতে চাই বাঙালি ভাতই খায় তখন ঝোঁকটা পড়ে আকারের পরে, ইকারের পরে নয়। সেই ঝোঁকবিশিষ্ট আকারটা শব্দের ভিতরেই আছে স্বতন্ত্র নেই। এমন নিয়ম করা যেতে পারত যাতে ভাত শব্দের ভা-এর পরে একটা হাইফেন স্বতন্ত্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হোতো—যথা বাঙালি ভা-তই খায়। ইকার এখানে হয়তো অন্য কাজ করচে, কিন্তু ঝোঁক দেবার কাজ তার নয়। তেমনি "খুবই" শব্দ, এর ঝোঁকটা উকারের উপর। যদি "তীর" শব্দের উপর ঝোঁক দিতে হয়, যদি বলতে চাই "বুকে তীরই বিঁধেছে," তাহলে ঐ দীর্ঘ ঈকারটাই হবে, ঝোঁকের বাহন। দুধটাই ভালো কিম্বা তেলটাই খারাপ এর ঝোঁকগুলো শব্দের প্রথম স্বরবর্ণেই। সুতরাং ঝোঁকের চিহ্ন অন্য স্বরবর্ণে দিলে বেখাপ হবে। অতএব ভাতি খাব বানান লিখে আমার প্রতি লক্ষ্য করে যে-হাসিটা হেসেছেন সেটা প্রত্যাহরণ করবেন। ওটা ভুল বানান, এবং আমার বানান নয়। বলা বাহুল্য "এখনি" শব্দের ঝোঁক ইকারের পরে, খ-এর অকারের উপরে নয়।

এখনি তখনি প্রভৃতি শব্দের বানান সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলবার আছে। যখন বলি কখনই যাব না, আর যখন বলি এখনি যাব, দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তা ভিন্ন বানানে নির্দেশ করা উচিত। "কারো" শব্দের বানান সম্বন্ধেও ভাববার বিষয় আছে। "কারো কারো মতে শুক্রবারে শুভকর্ম প্রশস্ত" অথবা "শুক্রবারে বিবাহে কারোই মত নেই", এই দুইটি বাক্যে ওকারকে কোথায় স্থাপন করা উচিত? এখানে কি বানান করতে হবে কারও কারও, এবং কারওই?

আপনার চিঠির একটা জায়গায় ভাষার ভঙ্গীতে মনে হোলো ক-এ দীর্ঘ ঈকার যোগে যে "কী" আমি ব্যবহার করে থাকি সে আপনার অনুমোদিত নয়। আমার বক্তব্য এই যে, অব্যয় শব্দ "কি" এবং সর্ব-নাম শব্দ "কী" এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন কি প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না। "তুমি কি জানো সে আমার কত প্রিয়" আর "তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়" এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্চে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্চে জানার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাৎ না থাকলে নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করা যায় না। ইতি ২৯ জুন ১৯৩৭

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

১৯শে জুলাই, ১৯৩৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

৺রথযাত্রার দিন (১০ই জুলাই) অপরাহ্ণে অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার পত্রখানি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে বলিলাম এই জন্য যে, প্রায় দিন পনের মধ্যে আমার শেষ পত্রখানির কোন উত্তর না পাইয়া আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে বোধ হয় উত্তর দিবার কোন আবশ্যকতা আপনি বোধ করেন নাই—কারণ পূর্ব্বেই ত আপনি নোটিস্ দিয়া রাখিয়াছেন যে একদা "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি র'বে নিরুত্তর"। যাহাই হউক, আপনি যে এতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা ভাষা

ও বাণান সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং আমাকেও আলোচনার সুযোগ দিয়াছেন, এজন্য সত্যই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

কিন্তু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমেই আপনার নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত মনে করিতেছি। কারণ, আপনার লেখাতে এবং প্রথম চিঠিতে যে দুই একটি ভ্রম বা বর্ণাশুদ্ধি আমার নজরে আসিয়াছে তাহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিশ্চয়ই অভদ্রতা হইয়াছে—অন্ততঃ bad form—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়ত ইহাতে আপনি সত্যসত্যই মনে ব্যথা পাইয়াছেন। অন্ততঃ আপনার এই চিঠিখানির প্রথম প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া আমার ত তাহাই মনে হইল। কিন্তু বাস্তবিক ব্যথা দিবার জন্য আমি আপনার ভুল দেখাই নাই—আপনার ন্যায় লোকের লেখাতে এই জাতীয় ভুল দেখিলে মনে বড় কষ্ট লাগে, সেই জন্যই সসঙ্কোচে এবং রসিকতার আবরণে উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহসী হইয়াছি। জানিবেন, মহত্ত্বের একটা দায় আছে—ইংরাজীতে যাহাকে বলে penalty of greatness—তাহারই ফলে, গীতার ভাষায় বলিতে গেলে,

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

যদি অনবধানতাবশতঃ কোন ভুল আপনার ন্যায় লোকে করিয়া বসেন, তবে অন্যের পক্ষে সেটা নজীর হইয়া বসে—"আর্ষ প্রয়োগ" হইয়া উঠিতেও বড় বেশী দেরী লাগে না। তাই আপনি যে জানাইয়াছেন যে "দায়ী" শব্দ আপনি "দায়ি" রূপে লেখেন না, হঠাৎ ওরকম হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সত্যসত্যই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি। বাস্তবিকই আপনার ন্যায় লোকের দায়িত্ব অতি গুরুতর। সেই জন্যই আপনাকে আমি এই সব ভুলের বিষয়ে লিখিয়াছিলাম। ভরসা করি, ক্ষুণ্ন হইয়া থাকিলেও এখন আর মনে কোন ক্ষোভ রাখিবেন না।

এই ভরসার উপর নির্ভর করিয়াই এই চিঠির একটি ভুল আপনাকে দেখাইয়া দিই—অবশ্য এবার আর আপনি নিজের হাতে লেখেন নাই,

অনেক গণেশ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—সুতরাং ভুলটি গণেশ ঠাকুরের না স্বয়ং বেদব্যাসের, তাহা আমি ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে এই কয়েক মাস পূর্ব্বে গোলদীর্ঘিকার গুরুগৃহের সমাবর্ত্তন-উৎসব উপলক্ষ্যে বেদব্যাস ঠাকুর নিজে যে বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাতেও এই ভুলটি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শব্দটি হইতেছে "কৌলীন্য"—"কুলীন" শব্দের উত্তর "ষ্ণ্য" প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন—পদমধ্যস্থ ঈ-কারটি একেবারেই স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত—অথচ আপনার চিঠিতে লেখা আছে "কৌলিন্য"। তাছাড়া আর একটি জিনিষ আপনার এই দুই চিঠিতেই লক্ষ্য করিয়াছি। যে কথ্য ভাষার ক্রিয়াবিভক্তির উপর আপনার আজকাল এত ঝোঁক তাহার ব্যবহারেও আপনি মোটেই uniformity রাখেন না—কোথাও "ছিলুম", কোথাও "চিলুম"; কোথাও "ছে" কোথাও "চে"; কোথাও "লুম", কোথাও "লেম"। আবার কোথাও ইলেক্ আছে, কোথাও নাই। কোথাও আপনার আধুনিক প্রস্তাবানুযায়ী "ই" এবং "ও" পূর্ব্ব-শব্দের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে, কোথাও তাহারা অক্ষত শরীরে বিরাজ করিতেছে। শব্দের ও বাণানের শৃঙ্খলাবিধানের সপক্ষে এতখানি ওকালতী করিবার পরও কি এইরূপ আচরণ আপনার পক্ষে ঠিক হইয়াছে?

আর এক কথা। বাণান-কমিটির নববিধানের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য-স্বীকারের নিদর্শনস্বরূপ গণেশ ঠাকুরকে দিয়া ত "অপূর্ব" দ্বিত্ববর্জ্জিত লিপি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ওদিকে যে মহা গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন—"ইংরেজি", "বাঙালি", "ফরাসি", প্রভৃতি লঘুস্বরান্ত বাণান যে কমিটি তাঁহাদের তৃতীয় সংস্করণে বাতিল করিয়া দিয়াছেন—এ যে একেবারে বিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রীরাধিকার "এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস"। শ্রদ্ধেয় বিশ্বপণ্ডিতদিগের কোন্ সংস্করণের প্রতি আপনি অচলা ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন ঠিক বুঝিলাম না। Put not your trust in Princes—and Pundits। তবুও ত পণ্ডিতমণ্ডলীর

তুরীয় সংস্করণ এখনও বাকী। জানি না এই বিদ্রোহাপরাধের নিমিত্ত কমিটির নমস্ত "ভট্টাচার্য"-বর্গ আপনাকে sedition-এর চার্জ্জে ফেলিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিবেন কিনা। এই ভয়েই আমি পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্পর্কে "শতহস্তেন বাজিনম্" নীতি অনুসরণ করিয়া থাকি।

আপনাকে যেমন বাণান ব্যাপারে ছোটখাট ভুলের জন্য অনুযোগ করিয়াছি, বন্ধুবর সুনীতি চাটুয্যে মহাশয়কেও তেমনই করিয়াছি। তাঁহার লেখায় একদিন দেখি "ব্যবহারিক", আর একদিন দেখি "অধীতব্য", আর একদিন দেখি "বিশেষতো"। কোনটিই ঠিক নহে—প্রথমটি হইবে "ব্যাবহারিক" (ব্যবহার+ষ্ণিক), এবং দ্বিতীয়টি হইবে "অধ্যেতব্য" (অধি+ই+তব্য), এবং শেষেরটি হইবে "বিশেষতঃ" (বিশেষ+তসিল্)। এই "অধ্যেতব্য" কথাটির পিছনে ত রীতিমত একটি কাহিনীই রহিয়া গিয়াছে। রেঙ্গুণে যখন সুনীতিবাবু ও আমি যাই বিগত বড়দিনের সময়ে—তত্রত্য বাঙ্গালীদের এক সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্য করিয়া—তখন শুনি যে সুনীতিবাবু তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে "অবশ্য অধীতব্য বিষয়" বার বার অম্লানবদনে বলিয়া যাইতেছেন, এবং ছাপার লেখাতেও দেখি তদ্বৎ। তখন আর উঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলিবার বিশেষ ফুরসৎ হয় নাই ; পরে কলিকাতায় ফিরিয়া, যখন বাণান-সংস্কার লইয়া আমাদের মধ্যে ঘোরতর বিতণ্ডা চলিতেছে, তখন এক বন্ধুর বাড়ীতে আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ। অবসর পাইয়া অমি বন্ধুবরকে বলিলাম, "সুনীতিবাবু, একটা কথা আপনাকে আমার রেঙ্গুণেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু বলা হয় নি।" বন্ধু বলিলেন, "কি এমন কথা ?" আমি বলিলাম, "আপনি রেঙ্গুণে আপনার বক্তৃতায় 'অধীতব্য' শব্দ বার বার প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু 'অধীতব্য' ত হয় না।" সুনীতিবাবু বলিলেন, "বলেন কি ? হয় না ?" আমি বলিলাম, "কি করে হবে ? অধি পূর্ব্বক ই ধাতু তব্য ; 'তব্য'-যোগে 'ই'-এর গুণে 'এ' হবে, অর্থাৎ 'অধ্যেতব্য' ; যেমন,

জেতব্য, ভেতব্য, কর্ত্তব্য, ধর্ত্তব্য ; এর আর কথা কি ?" বন্ধু বলিলেন, "এই মেরেছেন মশাই ! আমি আর ওকথাই ব্যবহার করব না—একদম অন্য শব্দ লাগাব।" আমি বলিলাম, "তা স্বচ্ছন্দে লাগাতে পারেন। কিন্তু তা বলে 'অধীতব্য' ত আর হয় না। আর এ ত বাংলা শব্দ নয় যে গোল-দীঘী থেকে এর বাণান ঠিক হবে, এ যে সংস্কৃত।" উভয়ের মধ্যে হাস্যের কলরোল উঠিল।

আসল কথা কি জানেন ? আমার মনে হয় এইরূপ সহজ সুপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে আপনার কিংবা সুনীতিবাবুর মত পণ্ডিত লোকের—আপনাকেও পণ্ডিতের কোঠায় ফেলিলাম অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, কারণ আপনার অসাধারণ বিনয় এবং তজ্জনিত অপাণ্ডিত্যের ভাণ সত্ত্বেও ইহা আমাদের কাহারওই অজ্ঞানা নাই যে সংস্কৃতে আপনি সুপণ্ডিত—আপনাদের ন্যায় লোকের পদস্খলনের আসল কারণ অমনোযোগ, carelessness, একটা নিরঙ্কুশ ভাব ; বস্তুতঃ অজ্ঞতা এইরূপ slipshod writing-এর কারণ আমার মনে হয় না। আপনি আপনার এই চিঠিতে একস্থানে লিখিয়াছেন যে পুরাণো আমলের বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বাঙ্গালা লেখার নমুনা আপনি দেখিয়াছেন, এবং বাণান-কমিটি সেই সব লেখা দেখিতে পাইলে লাভবান্ হইতেন ইহাও মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখার সেই সব irregularity-ও এই কারণেই সঞ্জাত—অর্থাৎ ভাবটা এই, বাঙ্গালা আবার ভাষা ! যাহোক কিছু লিখিলেই হইল ; সুতরাং যা তা লিখিয়াছেন। সেই সব বাণান-বিকৃতি অনাচারমূলক ভুলই এবং অশুদ্ধ—তদ্দ্বারা বাঙ্গালার শুদ্ধ বাণানের কোন নজীর হয় না। এই চিঠির শেষভাগে পুরাণো পুঁথির বাঙ্গালার নমুনা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও দেখিতে পাইবেন, একই শব্দের নানা প্রকার বাণান, এবং তাহাও প্রায় সব কয়টিই অশুদ্ধ, একই লেখকের লেখায় পাশাপাশি রহিয়াছে। পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের রচনাতেই যখন ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল দেখা যায়, তখন অপণ্ডিত অজ্ঞ scribe-দিগের দ্বারা লিখিত পুঁথিতে যে

একেবারেই বাণানের self-determination হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু সে ভুলগুলি অশুদ্ধই। সংস্কৃতের সঙ্গে না মিলিলেই যে পুরাণো পুঁথির বাণান অশুদ্ধ বলিতে হইবে, সে কথা আমি বলি না। যদি দেখা যায় যে, কোন একটা বাণান অবলম্বিত হইয়াছে, সেটা সংস্কৃতানুগ নহে কিন্তু বাণানটি uniform অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সেই বাণান অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই বাণানকে আর অশুদ্ধ না বলিয়া প্রয়োগবাহুল্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মনে করা যায় ; ধরিয়া লওয়া যায় যে ঐ শব্দের উহাই তদানীন্তন রূপ। কিন্তু ধরুন, "মূর্ধ্য" "মূর্জ্জ" ইত্যাদি বহুবিধ রূপ যেখানে পুঁথিতে দেখা যায়—উদাহরণ এই চিঠির শেষাংশেই পাইবেন—সেখানে ঐ সব বাণান ভুলই ধরিতে হইবে, অজ্ঞতাজনিতই হউক কিংবা অনবধানতাজনিতই হউক।

এই প্রসঙ্গে সুনীতি বাবুর সঙ্গে আমার একদিন তর্ক হইয়াছিল। তিনি বলিতেছিলেন, "'যদ্'-শব্দজ কথা 'জ' দিয়ে লেখা উচিত।" আমি বলিলাম "কেন ?" উত্তর হইল, "প্রাকৃতে এরকম হয়।" আমি বলিলাম, "প্রাকৃতে কি হয় তা নিয়ে ত আলোচনা হচ্ছে না ; কথা হচ্ছে বাংলা নিয়ে। প্রথম কথা, প্রাকৃতে যদি সংস্কৃত 'যদ্'-শব্দজ কথাগুলিকে vulgarize করে বর্গীয় 'জ' দিয়ে লিখে থাকে, আর আজ বাংলাতে যদি মূলের শুদ্ধ রূপই চল্‌তি হয়ে থাকে, তবে প্রাকৃতের খাতিরে সেই শুদ্ধ রূপ বাতিল করে vulgar form-টাই নিতে হবে এর কি মানে আছে ? তাছাড়া, বাংলা ভাষাও ত বহুদিন থেকে চলে আসছে ; তার শিষ্টপ্রয়োগে কি ব্যবহার প্রচলিত, সেইটেও ত দেখতে হবে ; তাতে কি দেখা যায় ?" তিনি বলিলেন, "অনেক পুরোণো পুঁথিতে দেখবেন বর্গীয় 'জ' দিয়ে 'যে' শব্দ লেখা আছে।" আমি বলিলাম, "বটে ! তা আপনিও অনেক অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের চিঠিতে দেখতে পাবেন, 'অশেষপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন' লিখতে গিয়ে 'অশেষ' শব্দটি একেবারে 'অসেস' ভাবে লেখা আছে। আর আদালতের নথী দেখেছেন কোন দিন ? তাতে দেখবেন যে 'পিতা' শব্দটি

ভ্রমক্রমেও ওভাবে লেখা হয় না ; একেবারে বরাবর 'পীতা' বলে লেখা হয়। লোকে না জেনে অনেক রকম ভুল করতে পারে ; কিন্তু সে সব ভুল দিয়ে বাণান স্থির হয় না।" তারপর আমি সুনীতি বাবুকে বলিলাম, "আর আপনি যে প্রাকৃতের নজীর দিচ্ছেন, তাও ঠিক নয় ; কারণ, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রাকৃতে 'য' স্থানে 'জ' হয় বটে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃত—যে প্রাকৃতের সঙ্গেই বাঙ্গালা ভাষার নিকটতম সম্বন্ধ—তাতে 'জ' স্থানে 'য' হয়। সুতরাং বাংলা পুরোণো পুঁথিতে যে কখনও কখনও 'যদ্'-শব্দজ কথাতে 'জ' দেখা যায়,—তা প্রাকৃতের খাতিরে নয়, সেটা একেবারেই অজ্ঞতাপ্রসূত এবং ভুল।" বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বাণান বা বাণান-বৈষম্যের উপরে কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক। তাই এবিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে এত কথা বলিলাম।

এখন বাণান ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব কথা আপনি বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি "বাণান" শব্দের বাণান সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎটি দিয়া রাখি। এ কৈফিয়ৎটি কিন্তু আমি যে ছাপান প্রবন্ধ আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতেই স্পষ্ট করিয়া দেওয়া আছে—এবং "কি" শব্দের "কী" রূপ সম্বন্ধে আমার কি আপত্তি এবং কেন আপত্তি তাহারও আলোচনা তথায় আছে—তাই আমার একটু সন্দেহ হইতেছে যে বোধ হয় প্রবন্ধটি তেমন মনোযোগ দিয়া পাড়বার অবসর আপনার হয় নাই। মোটামুটি কারণ এই যে, এই বাণান মূলানুযায়ী ; এবং এইরূপ বাণান করিলে নির্ম্মাণার্থক "বানান" শব্দ (যাহার উচ্চারণ স্বরান্ত) হইতে ইহার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে এবং বুঝা সহজ হয় , যেমন মণ (ওজন), মন (চিত্ত); আপণ (দোকান), আপন (নিজের); ইত্যাদির ন্যায়। অন্যান্য ভাষাতেও একই উচ্চারণের বিভিন্নার্থক শব্দের মধ্যে এইরূপ বাণান-ভেদের নজীর আছে ; যেমন, ইংরাজীতে sent, cent, scent ; tail, tale ; ফরাসীতে chant, champ ; sein, sain, saint, ceint ; ইত্যাদি। আর

বিশেষতঃ এস্থলে যখন "ণ" দিয়া লিখিলে মূল "বর্ণন" শব্দের সঙ্গে সঙ্গতিও রক্ষা হয়। তবে আপনার একটা charge-এ আমি not guilty plead করিতেছি। এই বাণানে আমার বিধানকর্ত্তা আমি নিজেই, অর্থাৎ আমিই যে এই প্রকার বাণানের প্রথম অবতারণা করিয়াছি তাহা নহে—এই শব্দটির দুই রকম বর্ণবিন্যাসই ভাষায় প্রচলিত—৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা লেখক ও সাহিত্যিক এই শব্দটিকে "ণ" দিয়া লিখিয়াছেন।

যেখানে "ণ" দিয়া বাণান কোন শব্দের মূলানুযায়ী, যেখানে বোধ-সৌকর্য্যার্থে "ণ" দিয়া লিখিলে সুবিধা হয়, যেখানে "ণ"-ই প্রচলিত প্রয়োগ—সেখানে স্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই যে আমি মোটেই "ণ" -এর বিরোধী নহি—কারণ এই নির্দ্দোষ বেচারীটির উপর আমার কোন আক্রোশ নাই। "রাণী" শব্দের প্রচলিত "ণ" রূপটিকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া তৎস্থলে "রানী" বা "রানি"-র আমদানী করিতে হইবে, "ন"-এর প্রতি এমন অত্যাসক্তি আমার নাই। প্রাকৃত বাঙ্গালাতে মূর্দ্ধন্য "ণ"-এর স্থান কোথাও নাই, ইহা একটি নির্জ্জীব ও নিরর্থক অক্ষর মাত্র—এসংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন বুঝিলাম না; কারণ সংস্কৃত উচ্চারণে "ন" ও "ণ"-এর প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা উচ্চারণে "ন" ও "ণ"-এর তুল্য মূল্য ও তুল্য অধিকার—ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কথা বলাতে যদি আমার "ণ"-এর প্রতি অত্যাসক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে—তবে নাচার। আর মূর্দ্ধন্য-বর্ণ-বিদ্বেষী পংডিতমংডলীই বা কিরূপে প্রাকৃত বাঙ্গালা হইতে "ণ"-বহিষ্কার সুসম্পন্ন করিবেন তাহাও ত বুঝিতে পারি না—তাঁহারা কি "মিঠাই মণ্ডা" "মোচার ঘণ্ট" "ঝাড় লণ্ঠন" প্রভৃতিকেও গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া শুদ্ধ করিয়া লইবেন? নচেৎ ত এত প্রচণ্ড কাণ্ডকারখানার পরেও একটি প্রকাণ্ড অশ্বাণ্ড প্রসূত হইয়া সমস্তই লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিবে।

ঢুণ্টিরাজ গণেশকে স্মরণ করা ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না। আর একটা কথা বলিয়া রাখি যে, যদি "ণ"-এর প্রতি অত্যাসক্তি কাহারও থাকিয়া থাকে, তবে তাহা নব্য "বাঙালি" পাণ্ডিত্যের ধ্বজাধারীদের নহে, তাহা প্রাচীন প্রাকৃত পণ্ডিতদেরই ছিল; কারণ একমাত্র পৈশাচী প্রাকৃত ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতেই "ন" নাই, একেবারেই "ণ"-এর রাজত্ব। আমি ত দেখিতে পাই নব্য "বাঙালি" লেখকদিগের আসক্তি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে অন্য একটি অনুনাসিক বর্ণের প্রতি—সেটি হইতেছে মাথায় পাগড়ী "ঙ"—নিজেদের পাগড়ীর অভাব ঘুচাইবার নিমিত্তই কি? যে "ঙ" অক্ষরটির স্বতন্ত্র ব্যবহার সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে প্রায় কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই প্রোথিতপ্রায় অনিশ্চিতধ্বনি অক্ষরটির পুনরুজ্জীবনপ্রচেষ্টা নিছক জীবে দয়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় কি?

এখন আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। প্রথমতঃ বাণান-সংস্কার, ও বাণান-কমিটি কি ভাবে সংস্কার প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন সেই বিষয়ে বলিব; এবং তৎপরে আপনি যে স্বতন্ত্র আলোচনা তুলিয়াছেন, "ই" এবং "ও"-র প্রয়োগ, "কি"-"কী" সমস্যা, এবং বাঙ্গালা সাধুভাষার ক্রিয়াপদের রূপের উৎপত্তি ও ইতিহাস, তদ্বিষয়ে বলিব। পূর্ব্বাহ্নেই কিন্তু বলিয়া রাখি, "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" কথাটি আমার প্রতি খাটিবে না; কারণ, আমার এত বেশী বিদ্যা নাই যাহার ভারে আমার চিত্ত বিনয়াবনত হইয়া পড়িবে—সে বিনয় আপনার ন্যায় জ্ঞানগৌরবান্বিত মহাজনেই সাজে—আমার প্রতি অপর প্রবচনটিই প্রযোজ্য, "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।"

বাণান-কমিটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনি একটা কথা বলিয়াছেন —পূর্ব্বেও আমি সেইরূপই শুনিয়াছিলাম, তবু আপনার নিজের কথায় তাহার confirmation হইল—সে কথাটা এই যে, "যে প্রস্তাবটি ছিল বাণানসমিতি স্থাপনের মূলে সেটা প্রধানত তৎসম শব্দ সম্পর্কীয় নয়।" এবং ইহার কারণও বোধ হয় এই যে বাঙ্গালা ভাষাতে প্রচলিত তৎসম

অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের বাণানে কোন বিশৃঙ্খলা বা অনিশ্চয়তা নাই। অবশ্য সংস্কৃতেও কোন কোন শব্দের বিকল্পরূপ আছে, যেমন, শ্রেণি, শ্রেণী; অবনি, অবনী; পরিবেশন, পরিবেষণ; ইত্যাদি; রেফের পরে উষ্মবর্ণ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের বৈকল্পিক দ্বিত্বও ইহার এক নিদর্শন। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা প্রয়োগে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না; কারণ, প্রায় অনেক স্থলেই উহার একটি রূপই বাঙ্গালাতে অবলম্বিত হইয়াছে, যেমন শ্রেণী, অবনী, ইত্যাদি; বর্ণ-দ্বিত্বের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালাতে একটা নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং সেগুলির সর্ব্বদাই দ্বিত্ব হয়, কোনও exception নাই, যেমন, র্চ্চ, র্চ্ছ, র্জ্জ, র্ত্ত, র্দ্দ, র্দ্ধ, র্ব্ব, র্ম্ম, র্য্য; আবার কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না, এবং বর্ত্তমান প্রচলিত প্রয়োগে প্রায় কোন সময়েই তাহাদের দ্বিত্ব হয় না; যেমন, র্ক, র্খ, র্গ, র্ট, র্থ, র্ণ, ইত্যাদি। এবিষয়ে শিষ্ট-প্রয়োগে রীতিই একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কোন বিশৃঙ্খলা হয় না। সুতরাং "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম", এই যে দুশ্চিন্তায় আপনি পতিত হইয়াছেন, এস্থলে তাহার কোনই কারণ নাই—যেহেতু সকল দেবতারই ব্যবহার এক্ষেত্রে একবিধ। আর দুই চারিটি শব্দে দুই রকম বাণানের ব্যবহার থাকিলেও তাহাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, যেমন ইংরাজীতে judgment, judgement; rhyme, rime; ইত্যাদি দুই প্রকার বাণানই প্রচলিত আছে—তাহাতে এমন কিছু আসে যায় না। সুতরাং তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কারপ্রচেষ্টার বিশেষ কোন scope নাই, আবশ্যকতাও নাই।

শুধু সরলতা বা অন্য কোন theory-র খাতিরে বর্ণবিপর্য্যয় ঘটাইলে তাহাতে ফল হইবে এই যে, যেখানে বর্ত্তমানে কোন শব্দের একই রূপ চলে, সেখানেও বহু রূপ চলিতে আরম্ভ করিবে—কারণ প্রচলিত রূপ সহজে কেহই ছাড়িতে চাহিবে না, অভ্যাসবশতঃই হউক কিংবা একগুঁয়েমি বশতঃই হউক। সুতরাং নূতন করিয়া বিশৃঙ্খলার আমদানী হইবে—যে বিশৃঙ্খলা নিবারণ করা অথবা কমানই শুনিতে পাই বাণান-কমিটির

উদ্ভবের প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়া, বর্ণদ্বিত্ব-বর্জ্জন ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে অশুদ্ধ রূপের অবতারণা হইবে ; যেমন, কার্তিক, কার্তিকেয়, বার্তা, বার্তিক, বার্ধক্য, প্রভৃতি ভুল বাণানও হয়ত বাণান-কমিটির দৌলতে আমদানী হইবে। সুতরাং যে নবজাত এবং অজাত শিশু-সম্প্রদায়ের শ্রমলাঘবের হেতুভূত হওয়াতে আপনি তাহাদের পক্ষ হইয়া বাণান-কমিটিকে "রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" বলিয়া অভিবাদন জানাইয়াছেন, আমার গুরুতর সন্দেহ হয় যে, সেই শিশু-সম্প্রদায় এই গোলমালের স্রষ্টা পণ্ডিতমণ্ডলীকে হয়ত বা অভিসম্পাত করিয়াই বসিবে, কারণ তাহাদিগকে এক set র্ব্ব, র্চ্চ-এর উপর আবার আর এক set র্ব, র্চ, ইত্যাদি মজুত করিতে হইবে। মুদ্রাযন্ত্রওয়ালারা ত ইতিমধ্যেই বাণান-কমিটিকৃত বর্ণবিপ্লবে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। তাহারা ঠিক করিয়া লইয়াছে যে অতঃপর বই ছাপা হইবে দুই প্রকার—এক প্রকার বই ভদ্রলোকের পড়িবার জন্য, আর এক প্রকার বই গোলামখানার ছাপ পাইবার জন্য ; এবং তাহারা ধরিয়া লইয়াছে যে শেষোক্ত বইগুলিতে রেফ থাকিলে "্য"-ফলা থাকিবেনা, "ষ্ট"-ও থাকিবেনা ; সুতরাং তাহারা ছাপিতেছে "দৈর্ঘ" "দার্ঢ", "রাস্ট্র" এবং "ইস্ট মন্ত্র", এবং তৎফলে আবার গ্রন্থকর্ত্তাদের কাছে বকুনী খাইতেছে। সে বেচারারা বুঝিবে কি প্রকারে যে "ধৈর্য্য"-তে "্য"-ফলা থাকিবেনা, অথচ "দৈর্ঘ্য"-তে থাকিবে, এবং "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"-তে "ষ্ট" চলিবেনা, অথচ "ইষ্ট মন্ত্রে" চলিবে ? অথচ এত যে trouble এবং হাঙ্গামা, ইহা একদম অনাবশ্যক এবং gratuitous।

বাণান-কমিটির "ং"-প্রীতিতেও এইরূপ আর একটি গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা অনেক সংস্কৃত ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন—লক্ষ্য করিবেন যে তাঁহাদের সংস্কৃতনিষ্ঠা স্থলবিশেষে মদপেক্ষাও প্রবল—যে সন্ধির নিয়মানুসারে ভয়ংকর, ভয়ঙ্কর ; শংকর, শঙ্কর ; সংন্যাসী, সন্ন্যাসী ; উভয়ই হয়, কারণ ভয়ম্, শম্, সম্, ইহারা স্বতন্ত্র পদ। কিন্তু সাধারণ লোকে

বুঝিবে কি প্রকারে কোন্‌টি পদ আর কোন্‌টি পদ নয়? তাহারা "শংকর"-এর দেখাদেখি অংক, অংগ, বংগ, কলিংগ, রংগ, ব্যংগ ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু এই শেষোক্ত রূপগুলি অশুদ্ধ; যেমন, হিন্দীতে "পংডিত" "মংত্র" লেখে, সে সব বাণান অশুদ্ধ। "ং" লইয়া এত নিরর্থক লাফালাফি করিবার কোন দরকার ছিল না, কারণ এ ব্যাপারেও বাঙ্গালাতে একটা নিয়ম মোটামুটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। "প্রবাসী"-র প্রবন্ধে নিয়মটি দেখাইয়াছি; তাই এখানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

এবিষয়ে শুধু আর একটি কথা বলা দরকার মনে করি। সরলতার যে সব যুক্তি এই সব পরিবর্ত্তনের সপক্ষে দেখান হয়, তাহারও যে বিশেষ কোন মূল্য আছে, তাহা মনে হয় না। কারণ, বাঙ্গালা ভাষার অসংখ্য যুক্তবর্ণের মধ্যে মাত্র নয়টি বর্ণ-দ্বিত্বযুক্ত ত্র্যক্ষর যুক্তবর্ণকে দ্ব্যক্ষর যুক্তবর্ণে, অথবা মাত্র কোন কোন স্থলে "ঙ্ক"-কে "ংক"-তে, কিংবা "ঙ্গ"-কে "ংগ"-তে পরিণত করিলে এমন কোন গুরুতর সরলতা সংসাধিত হয় না, যাহার দরুণ অতখানি বিশৃঙ্খলা ও ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা আনয়ন করা যাইতে পারে। যে উচ্চারণানুযায়ী বাণানের জন্য আপনি এত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ত ছাড়িয়াই দিলাম—কারণ, রেফের পরে বর্ণদ্বিত্বমূলক বাণানই উচ্চারণানুযায়ী, কারণ আমরা "দুর্দ্দান্ত" শব্দকে "দুর্‌+দান্ত" এরকম আল্‌গা ভাবে উচ্চারণ করি না, করি "দুর্‌+দ্দান্ত" ভাবে সজোরে; এবং "র্য্য"-এর বেলাতে ত কথাই নাই; উহা হইতে "য"-ফলা লোপ করিলে উহার উচ্চারণ "র্জ"-তে পরিণত হইবে, "র্জ্য"-তে নহে। এ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধে আমি অনেক বলিয়াছি, এবং "প্রবাসী"-তে রামানন্দবাবুও বলিয়াছেন *।

* "অনেক শব্দের বানানে বাংলায় যেখানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়, গ্রন্থকার সেখানে একটিমাত্র বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, তিনি সর্ব্ব, পূর্ব্ব, কর্ত্তৃক, ধর্ম্ম, না লিখিয়া লিখিয়াছেন সর্ব, পূর্ব, কর্তৃক, ধর্ম। কিন্তু বাঙালীরা ত উচ্চারণ করে না সর্‌ব, পূর্‌ব, কর্‌তৃক, ধর্‌ম; তাহারা দুটা ব, ত, ম উচ্চারণ করে—তাহা যত স্পষ্ট বা অস্পষ্টই হউক।" "রবীন্দ্রজীবনী" গ্রন্থের সমালোচনা ("প্রবাসী", বৈশাখ, ১৩৪৪)।

বস্তুতঃ এই উচ্চারণের খাতিরেই সংস্কৃত ব্যাকরণে এই স্থলে দ্বিত্ব বিকল্পে গৃহীত হইয়াছে যদিও ব্যুৎপত্তিতে সব সময়ে আসে না। আর প্রয়োগের কথা? পুরাতন পুঁথি ঘাঁটিতে গিয়া দেখি যে, বাঙ্গালাতে এই রীতি অতি প্রাচীন—অন্ততঃ ৭০০।৮০০ বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালাতেও এই-ই প্রয়োগ। আমার নিজের এ বিষয়ে মত এই যে, প্রচলিত যে বাণান তাহাই থাকুক অর্থাৎ যে যে স্থলে বর্ণদ্বিত্ব হয়, তাহাই হউক, যে যে স্থলে হয় না, না-ই হউক।

তারপর, সাধু বাঙ্গালার তদ্ভব (অথবা সংস্কৃতমূলক) শব্দ সম্বন্ধে এবং একেবারে দেশজ কিংবা বৈদেশিক ভাষা হইতে আগত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই সব শব্দে তৎসম শব্দ অপেক্ষা অনিশ্চয়তা কিছু বেশী আছে; কিন্তু আপনার চিঠির ভঙ্গীতে কিংবা বাণান-কমিটির আলোচনার ভঙ্গীতে যেরূপ মনে হয় যে ইহা একটি বিশৃঙ্খলার ও স্বৈরাচারের ক্ষেত্র—কোন নিয়মকানুনই নাই, নিছক অরাজকতা, এবং সেই chaos হইতে cosmos বাণান-কমিটিই আনিতেছেন—বস্তুতঃ সে রকমটা কিছুই নহে। এই বিষয়ে আমি আন্দাজে vague কথা না বলিয়া একটু accuracy অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। উচ্চারণানুযায়ী বাণানের যে বড় তর্ক আপনি তুলিয়াছেন, সে বিষয়ে পূর্ব্বের চিঠিতে আমি কিছু বলিয়াছিলাম, এ চিঠিতেও হয়ত আরও কিছু বলিব, কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমি এস্থলে কিছু বলিয়া রাখিতে চাই। সে কথাটি এই।

বাঙ্গালা ভাষাতে বাণান মোটামুটি উচ্চারণসঙ্গতই। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রধান কারণ এই যে বাঙ্গালাতে কোন silent বর্ণের ব্যবহার নাই। পূরা কোন অক্ষর কখনও অনুচ্চারিত থাকেনা। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম আছে দুই একটি ফলা সম্বন্ধে, যথা ব-ফলা এবং ম-ফলা। সাধারণ উচ্চারণে কোন কোন শব্দে এই ফলাগুলি প্রায় silent থাকিয়া কতকটা বর্ণদ্বিত্ব আনয়ন করে, যেমন পক্ব, কণ্ব, ছদ্ম, রুক্মিণী—তাও

শিষ্ট উচ্চারণে অন্তঃস্থ ব কিংবা অনুনাসিকের আভাস এই সব শব্দেও পাওয়া যায়; আবার অনেক শব্দে ফলাগুলি পুরাপুরিই উচ্চারিত হয়, যেমন ঋগ্বেদ, উদ্বাহ, অম্বা, জন্ম, গুল্ম। আর, য-ফলাকে silent ধরা যায় না, কারণ কতকটা বর্ণদ্বিত্ব আনয়ন করিলেও, উহার একটি স্বতন্ত্র ধ্বনি স্পষ্টই বর্ত্তমান। তাই মোটামুটি বলা চলে যে বাঙ্গালাতে silent অক্ষর নাই—যেমন ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে আছে। কাজেই উচ্চারণানুযায়ী বাণান বা বাণানের অনুযায়ী উচ্চারণই বাঙ্গালার নিয়ম—ব্যতিক্রম সামান্য।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাঙ্গালাতে এক বর্ণের বহু ধ্বনি নাই—একটি বর্ণের একটিই ধ্বনি। ইহারও সামান্য ব্যতিক্রম আছে—তবে সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম। ব্যতিক্রম প্রধানতঃ দুইটি—স্বরবর্ণ এ-কার এবং অ-কার সম্বন্ধে। এ-কারের "এ"-ধ্বনি ছাড়া মাঝে মাঝে "য়্যা"-ধ্বনি (ইংরাজী cat-এর স্বরধ্বনি) শ্রুত হয়; তবে এরূপ ধ্বনিবিকার খুব বেশী নয়, এবং অধিকাংশ স্থলেই সুপরিচিত; তাছাড়া, এই ধ্বনিবিকারটি বহুলমাত্রাতেই স্থানীয় উচ্চারণের মৌখিক বিকার (local or dialectical variation)—একই শব্দের কোথাও "এ" উচ্চারণ, কোথাও "য়্যা" উচ্চারণ; যেমন, পূর্ব্ববঙ্গে পেট, লেপ, তেল, ইত্যাদির উচ্চারণ প্যাট্, ল্যাপ্, ত্যাল্, ইত্যাদি, পশ্চিমবঙ্গে নহে। অ-কার সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এই যে, কখনও অ-ধ্বনিই থাকে, কখনও ঈষৎ অথবা সম্পূর্ণই ও-ভাবাপন্ন হয়, আর পদান্তে ত সচরাচর হসন্ত ভাবেই উচ্চারিত হয়। এই হসন্ত উচ্চারণের নিয়ম অর্থাৎ কোথায় হয় না হয়—তাহা ত একরকম বিধিবদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। আর কি পদান্তে কি পদমধ্যে, অ-ধ্বনি যে অনেক সময় বিকৃত হইয়া ও-ভাবাপন্ন হয়, ইহাও অনেকাংশেই স্থানীয় উচ্চারণের বিকার—যেমন, আপনারা কলিকাতা অঞ্চলে "বড়" "ভাল"-কে প্রায় "বড়ো" "ভালো" উচ্চারণ করেন; আমরা পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা ততটা করি না; আর সেদিন রামানন্দ বাবু আমাকে বলিতেছিলেন যে বাঁকুড়া অঞ্চলেও করে না, তথায় অ-ধ্বনিই উচ্চারিত হয়;

পক্ষান্তরে, আমরা পূর্ব্ববঙ্গে ঘন, কম, বন, সমান, ইত্যাদিকে ঘোনো, কোম, বোন, সোমান, ইত্যাদি বলি, আপনারা পশ্চিমবঙ্গে বোধ হয় তেমন বলেন না। উচ্চারণের এই সব স্থানীয় মৌখিক বিকৃতি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; সাধু-রূপের বাণানে ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সাধু বাঙ্গালা ভাষায় phonetic spelling-ই নিয়ম—ব্যতিক্রম অতি অল্প।

তবে বিশৃঙ্খলা হয় কেন? তাহা হয়, এক বর্ণের বহুধ্বনি থাকার দরুণ নহে—কারণ বাঙ্গালাতে তাহা বিশেষ নাই—কিন্তু বহুবর্ণের এক ধ্বনি থাকার দরুণ। এইখানেই সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার তফাৎ; সংস্কৃত বর্ণমালার ধ্বনি কতক বিকৃত হইয়া বাঙ্গালাতে এই গোলমাল ঘটাইয়াছে। সংস্কৃত "অ" (হ্রস্ব-আ) যে বাঙ্গালায় "অ" (aw)-তে পরিণত হইয়াছে, অথবা সংস্কৃত সন্ধ্যক্ষর "এ" (হ্রস্ব-আ+য়্) যে বাঙ্গালায় simple vowel "এ"-তে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই; কারণ ধ্বনি বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধ্বনিটি unique-ই রহিয়াছে অর্থাৎ অন্য কোন বর্ণ দ্বারা ঐ ঐ ধ্বনি প্রকাশিত হয় না; সুতরাং তাহাতে কোন confusion হয় না। কিন্তু দুই "ন", তিন "শ", দুই "জ", দুই "ব", ইহাদের কার্য্যতঃ একই উচ্চারণ হইয়া যাওয়াতে, এবং ই-ঈ, উ-ঊ ইহাদের মাত্রাভেদ উচ্চারণে রক্ষিত না হওয়াতে, এবং ঋ ঌ স্বরবর্ণ রি লি ব্যঞ্জনবর্ণে পরিণত হওয়াতে confusion-এরই সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে বাণান unphonetic হয় না, কিন্তু অনিশ্চিত হয়। Unphonetic হয় না এই কারণে, যে পাখী, পাখি; কাণ, কান; জিনিষ, জিনিস; কাজ, কায; ইত্যাদি যে বাণানই লেখা হউক না কেন, উচ্চারণ phonetic-ই হইবে; কারণ ঐ বর্ণগুলি, ই-ঈ; ণ, ন; ষ, স; জ, য; ইহাদের উচ্চারণ একই প্রকার—অন্ততঃ সচরাচর। সুতরাং phonetics-এর দোহাই দিয়া আপনি "ঈ", "ণ", "য", "ষ" নির্ব্বাসিত করিতে চাহিলে, আমিও "ই", "ন", "জ", "স" নির্ব্বাসিত করিতে পারি—বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণের পক্ষে ফল সমানই।

সংস্কৃত উচ্চারণের নজীর এস্থলে অচল, কারণ বাঙ্গালাতে এই সমস্ত বর্ণের সবগুলির সংস্কৃত উচ্চারণ নাই, আছে বাঙ্গালা উচ্চারণ—এবং সে উচ্চারণ হিসাবে ঐ বর্ণযুগ্মগুলি তুল্যমূল্য। আমি যে গত চিঠিখানিতে নানা ইউরোপীয় ভাষায় বর্ণের ধ্বনিবিকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলাম, তাহাও বর্ণের সহিত ধ্বনির অসামঞ্জস্য সূচিত করিবার জন্য ততটা নহে, যতটা লাটিন বর্ণমালার কোন কোন বর্ণের ধ্বনি সেই সব আধুনিক ভাষায় কি রকম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহাই সূচিত করিবার জন্য। সুতরাং আমার মনে হয় যে, "ঈ", "ণ", "য", "ষ", ইত্যাদি ব্যবহারে বাণান unphonetic হয় অথবা উচ্চারণানুযায়ী হয় না—এই যে একটা কথা আজকাল খুব fashionable হইয়াছে—বাঙ্গালা বর্ণমালার বর্ত্তমান উচ্চারণানুসারে সে কথার কোন অর্থই নাই। আমি যদি সুনীতি বাবুকে "ষূণিতী বাবু" লিখি, অথবা আপনার নামটিকে "রবিন্দ্রণাথ" রূপে লিখি, তাহা হইলে নামের উপরে, রূপের উপরে, রুচির উপরে যতই অত্যাচার করা হউক না কেন, ধ্বনি অথবা উচ্চারণের উপরে কিছু মাত্র অত্যাচার হয় না—কারণ ধ্বনি অবিকৃতই থাকে। এই সহজ কথাটা, বাঙ্গালা ভাষার phonetics-এর যাঁহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত।

কিন্তু এক ধ্বনির বর্ণবাহুল্যের বা redundancy-র দরুণ phonetic গোলমাল না হইলেও বাণানের গণ্ডগোল বা confusion ত হইবারই কথা। সেই গণ্ডগোল বাঙ্গালাতেও স্বভাবতঃ কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে শিষ্টপ্রয়োগে এই বর্ণবাহুল্যের ব্যাপারেও "অমোঘ শাসন" বহু শব্দের সম্বন্ধেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অজ্ঞ লোকে ভুল করিলেও সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সম্বন্ধে ত কোন অনিশ্চয়তাই নাই—আপনার "শব্দতত্ত্ব"-এর মজার কথাটি মনে পড়ে—"সুশীতল সমীরণ" লিখিতে ইতস্ততঃ লাগিলে ছেলেদের পক্ষে "ঠাণ্ডা হাওয়া" লেখাই নিরাপদ্—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ তৎসম বাক্যাবলীর বর্ণবিন্যাস একই প্রকার, নানা প্রকার নহে।

বাকী রহিল তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ। এ স্থলেও প্রায় অধিকাংশ শব্দেরই একটা বাণানই দাঁড়াইয়া গিয়াছে; যেমন, চাষা, আপোষ, পোষাক, রেশম, পেশা, সখ, সৌখীন, গিন্নী, রাণী, সর্ত্ত, শোনা, ইত্যাদি। যেখানে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, সেখানে তাহাই চলিতে থাকুক; কারণ ইহাদিগকে পরিবর্ত্তন করিবার পক্ষে কোন phonetic যুক্তি নাই, যেহেতু বাঙ্গালা উচ্চারণে "চাষা"-কে "চাসা" কিংবা "চাশা" লিখিলে উচ্চারণের কোনই তারতম্য হইবে না। সেই জন্যই যখন "মাষ্টার"-কে বাণানের নববিধান মতে "ম্যাস্টার"-এর ন্যায় বর্ণসঙ্কররূপে আসরে অবতীর্ণ হইতে দেখি, তখন আপনার ভাষাতেই বলি, ভাবিত হই এই phonetic পাণ্ডিত্যের অর্ঘ্য কোন্ বৈয়াকরণ-দেবতার উদ্দেশে—বোপদেব কিংবা কাত্যায়ন ত নহেনই? এহেন পণ্ডাপ্রদর্শন যে নিতান্তই পণ্ডশ্রম, কারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে ষ ও স তুল্যমান।

বাণান-কমিটির ব্যাপারে আর একটি মজার জিনিষ লক্ষ্য করিবেন। "ণ"-এর বেলায় তাঁহারা আপনারই ন্যায় খড়্গহস্ত; তৎসম ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালা শব্দে "ণ" চলিবে না ফতোয়া বাহির হইয়া গেল—ফতোয়ার ধাক্কায় "রাণী" পর্য্যন্ত সিংহাসনচ্যুত। কিন্তু "ষ", "শ", "স"-এর বেলায় তাঁহারা আমার অপেক্ষাও মূল-ভক্ত এবং ব্যুৎপত্তির পূজারী; দৃষ্টান্ত যথা, "আমিষ" হইতে "আঁষ" হইবে; "অংশু" হইতে "আঁশ" হইবে; ইত্যাদি। "কর্ণ" ও "স্বর্ণ"-এর বেলায় কিন্তু "কান" এবং "সোনা"—সেখানে ব্যুৎপত্তির কোন বালাই নাই—যদিও ঐ শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি "আঁষ" ও "আঁশ" শব্দদ্বয়ের অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। শুধু তাহাই নহে। যে সব শব্দ অন্য বিদেশী ভাষা হইতে আসিয়াছে, যেমন হিব্রু, আরবী, ফারসী, ইংরাজী, ইত্যাদি, সে সব স্থলেও নিয়ম হইয়াছে যে মূল শব্দের উচ্চারণানুযায়ী "শ" কিংবা "স" হইবে—যদিও ফারসীতে আরবীতে হিব্রুতে কোন্ শব্দের কি উচ্চারণ ছিল তাহা সাধারণ লোকের জানিবার কথা নহে—বাণান-কমিটিরও

কয়জন লোক এবিষয়ে ঠিক মত কিছু জানেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এই সেদিন দেখিলাম মৌলানা আক্রাম খাঁ মহাশয়ের সম্পাদিত "আজাদ" পত্রিকাতে লিখিত হইয়াছে :

"আরবী পার্সী শব্দ সম্বন্ধে কমিটির সদস্যগণের বিজ্ঞতা যে কিরূপ হাস্যজনক, মাননীয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'চলন্তিকা'-ই তাহার অন্যতম প্রমাণ। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, সাধারণতঃ আরবী শব্দগুলিকে পার্সী ও পার্সী শব্দগুলিকে আরবী বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই এই পুস্তকের একটা অন্যতম বিশেষত্ব। এমন কি, 'চাবুক' ও 'বকরী'-র ন্যায় শব্দ-গুলিকে বেদুইনের জম্বীলে পূরিয়া দিতেও গ্রন্থকার কোন দ্বিধা করেন নাই।" (এই সব গলদের জন্যই কি লোকে উক্ত অভিধানখানিকে "গলন্তিকা" বলিয়া থাকে ?)

বিদ্যা যাঁহার যেরূপই থাকুক না কেন, বৈদেশিক কিংবা দেশজ শব্দের বাণান সে বিদ্যা খাটাইবার প্রশস্ত ক্ষেত্র নহে ; কারণ বাঙ্গালাতে যে "স"-ই ব্যবহৃত হউক না কেন, উচ্চারণ সমানই হইবে। অথচ এই সব স্থলে, যে সকল শব্দে বাণান একেবারে settled হইয়া গিয়াছে সেখানেও পণ্ডিত-বর্গ আরবী ফারসী হিব্রু বিদ্যা ফলাইয়া রং-বেরং-এর নানা নয়া বাণানের আমদানী করিয়াছেন ; এবং পুরাতনী ভাষা-জননীকে নবীনারূপে সজ্জিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নানাবিধ "শৌখিন পোশাকে" মণ্ডিত করিয়া বোধ করি আনন্দের আতিশয্যেই "শখ" করিয়া "শরবৎ" পান করিতেছেন। (এই বাণানগুলি আমার নহে—ভরসা করি আপনারও নহে—তবে বাণান-কমিটির বটে।) ইহার উপর আর টীকা নিষ্প্রয়োজন। প্রচলিত বাণান তুলিয়া দিয়া এই সব বিভীষিকার অবতারণা করা কি বাণানের সংস্কার না বাণানের বিকার ?

যাহা বলিতেছিলাম—বাঙ্গালাতে তদ্ভব, দেশজ ও বৈদেশিক শব্দেও বহুস্থলেই কোন একপ্রকার বাণান প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যে যে স্থলে হয়

নাই, অর্থাৎ যে যে যে স্থলে শিষ্টপ্রয়োগেও দুই তিন রকম দেখা যায়—তাও তিন রকম বড় একটা দেখা যায় না, দুই রকমই দেখা যায়, যেমন, সাদা, শাদা ; সহর, শহর ; জিনিষ, জিনিস ; ইত্যাদি—সেই সব স্থলে কোন এক রকম রূপ recommend করা যাইতে পরে। তাহারও যে খুব বেশী একটা urgency বা আবশ্যকতা আছে এমন নহে, কেননা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, সংস্কৃতেও কোন কোন শব্দে বিকল্প রূপ আছে, ইংরাজীতেও আছে, তাহাতে এমন কোন গুরুতর অসুবিধা হয় না।

আর ই-ঈ, উ-ঊ, ণ-ন লইয়া যে একটা কলরব আজকাল বড় বেশী শুনা যাইতেছে, সে সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাধু বাঙ্গালাতে এবিষয়েও বিশেষ কোন অরাজকতা নাই ; দস্তরমত নিয়মই অনেকটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মোটামুটি সংস্কৃতের রূপ, অথবা সংস্কৃতানুসারী রূপই প্রচলিত ; যেমন, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কারই প্রচলিত ; সংস্কৃত ণত্ববিধানানুসারেই অধিকাংশস্থলে "ন""ণ"-তে পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্ভব, দেশজ, এমনকি বৈদেশিক শব্দেও—শুধু ক্রিয়াবিভক্তিতে ছাড়া ; দেশবাচক বা ভাষাবাচক বা ব্যবসায়-বাচক শব্দে সংস্কৃত ইন্ ও ণিন্-প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের প্রথমার একবচনের রূপের অনুসরণে ঈ-কারই প্রচলিত, যেমন, বাঙ্গালী, গুজরাটী, ডাক্তারী, ইত্যাদি। কোন কোন লেখক—এবং আপনি স্বয়ং তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান (বাণান সম্বন্ধে আপনার যথেচ্ছাচার ত আপনি নিজেই চিঠিতে স্বীকার করিয়াছেন)—ইচ্ছা করিয়া এই সব প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পাখি, খুড়ি, বাঙালি, ডাক্তারি, পুরানো, ইত্যাদি রূপের আমদানী করিয়াছেন, এবং এই প্রকার নয়া আমদানীর ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া এখন নজীর দেখাইতেছেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় ভয়ানক বিশৃঙ্খলা, সুতরাং একটা কিছু করিতে হইবে, অর্থাৎ মনের অভিপ্রায়টা এই যে, নয়া আমদানী গুলিকেই standardize করিতে হইবে, নিয়মসঙ্গত প্রচলিত রূপ বাতিল করিয়া। ইহাকে ত ভাষাসংস্কার বলে না। সহজতর, স্বাভাবিকতর সংস্কারের পথ

হইল, যে সব নিয়ম বহুপ্রচলিত, সেই সব নিয়মকেই যথাসম্ভব extend করা—অবশ্য যদি কোথাও নিয়মের বহির্ভূত খুব সুপ্রচলিত রূপ থাকে তাহাকে disturb না করিয়া। (এ কথা ত সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে settled সুপ্রচলিত রূপ লইয়া গোলমাল করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।)

সাধু বাঙ্গালাতে প্রচলিত শব্দ—তৎসম, তদ্ভব, দেশজ ও বৈদেশিক—এই সকল সম্বন্ধেই আলোচনা করা গেল, এবং দেখা গেল যে ইহাতে বিশৃঙ্খলা অতি যৎসামান্য, প্রয়োগের অমোঘ শাসন বহু ক্ষেত্রেই বাণানকে নিয়মিত করিতেছে—শুধু সামান্য যে কয় স্থলে রূপান্তর (variant) দেখিতে পাওয়া যায়, সে সব স্থলে কোন একটা রূপকে নির্দ্দেশ করা চলিতে পারে। সংস্কারের scope এই পর্য্যন্ত।

আসল যেখানে সংস্কার করিবার অথবা বিশৃঙ্খলা-দূরীকরণের প্রসারিত ক্ষেত্র রহিয়াছে, সে স্থল হইল কথ্য বা মৌখিক (conversational বা colloquial) ভাষার ক্ষেত্র। এবং এই প্রশ্ন আজকাল একটু urgent-ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; কারণ অনেক লেখক আজকাল শুধু নাটকীয় পাত্র-পাত্রীদের মুখে নহে, গম্ভীর রচনাতেও বহুল পরিমাণে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। এইরূপ ব্যবহার কতটা করা উচিত সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমার নিজের ধারণা এই যে, পাত্রপাত্রীদিগের কথাবার্ত্তায় ব্যতীত, সাধারণতঃ ঠিক লেখকের নিজের লেখায় বা গম্ভীর রচনায় মৌখিক ভাষা ব্যবহার করা উচিত নহে। যেমন ইংরাজীতে shan't, won't, I'll, you'll, ain't, প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত (contracted) মৌখিক রূপ অথবা প্রাদেশিক dialect কথাবার্ত্তার স্থলে ভিন্ন অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না ; যেমন সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত বুলি কথাবার্ত্তার স্থলে ভিন্ন অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না ; তেমনই, পুজো, ইচ্ছে, কোর্চ্ছে, কোচ্ছিল, কোরবো, কোবরেজ, দুষ্টু, প্রভৃতি (সাধুভাষার পূজা, ইচ্ছা, করিতেছে, করিতেছিল, করিব, কবিরাজ, দুষ্ট, প্রভৃতির corrupted or contracted local variety) গম্ভীর রচনাতে

ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য রচনায় এই convention বা রীতিই মোটামুটি প্রচলিত ছিল। তাই আজ যে কথ্য ভাষার রূপের বিশৃঙ্খলার একটা বাস্তবিক সমস্যাই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে সমস্যা পূর্ব্বে তেমন উঠে নাই। কোন কোন অঞ্চলের প্রচলিত মৌখিক রূপ যদি লৈখিক ভাষায় চলিতে আরম্ভ করে, তবে ত রূপবাহুল্য এবং বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী; কারণ লোকের উচ্চারণ কালভেদে, দেশভেদে, পাত্রভেদে নানাবিধ, সুতরাং সেই সব উচ্চারণ অক্ষরে রূপান্তরিত করিতে গেলে, নানা লোকে নানাভাবে তাহা করিবে।

কিন্তু ভালমন্দের কথা তুলিয়া এখন বিশেষ লাভ নাই, কারণ কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষা অনেক পরিমাণে লিখিত সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এখন আবশ্যক সেই ভাষার রূপগুলি যথাসম্ভব standardize করা। অন্য জিলার মৌখিক ভাষার কথা ত ছাড়িয়াই দিলাম—এক কলিকাতা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেই মৌখিক ভাষাতে একই শব্দের কত বিভিন্ন রূপ! ক্রিয়াপদের মৌখিক বিভক্তিতে ত রূপবাহুল্যের একেবারে ছড়াছড়ি। "বলিলাম" এই মূল সাধুরূপ হইতে বল্লাম, বল্লেম, বল্লুম, বোল্লাম, বোল্লেম, বোল্লুম, বন্নু, বোন্নু, ইত্যাদি। শেষের দুইটি যদি নেহাৎ গ্রাম্য রূপ বলিয়া ছাড়িয়াও দিই, এবং যদি অ-কারের ও-ভাবগ্রস্ত উচ্চারণ বলিয়া তাহার পূর্ব্বের তিনটির স্বাতন্ত্র্যও অস্বীকার করি, তাহা হইলেও প্রথম তিনটির যে বিভক্তিত্রয়, "লাম", "লেম", "লুম", তাহাদের ত আর reconcile করা যায় না। এই রকম অবস্থা ক্রিয়াপদের অন্যান্য বিভক্তি সম্বন্ধেও। এই সম্বন্ধে বাণান-কমিটির কতকটা কাজ করিবার সত্য সত্যই scope ছিল, অথচ তদ্বিষয়ে বাণান-কমিটির মন্তব্য এই যে, "লাম", "লেম", "লুম", তিনরূপই চলিতে পারে; করান, পাঠান, অথবা করানো, পাঠানো, দুইরূপই চলিতে পারে; হব, খাব, অথবা হবো, খাবো, দুই রূপই চলিতে পারে, ইত্যাদি। অর্থাৎ যে প্রসঙ্গে কমিটির কিছু করিবার ছিল সে প্রসঙ্গে তাঁহাদের motto

হইল নৈষ্কর্ম্য বা surrender ; আর যে প্রসঙ্গে কমিটির বিশেষ কিছুই করিবার ছিল না, সে প্রসঙ্গে তাঁহাদের motto হইল "একটা নূতন কিছু করো।" "লাম", "লেম", "লুম", সবই চলিবে মৌখিক ভাষায়, কিন্তু "আর্য্য", "ধর্ম্ম", "রাণী", "পোষাক" চলিবে না সাধুভাষায়—একেবারে *reductio ad absurdum* ! (তবে শুনিতেছি যে অনেক মেহেরবাণী করিয়া বিশ্বপণ্ডিতগণ তদীয় তৃতীয় সংস্করণে "রাণী"-কে বিকল্পে বাহাল করিয়াছেন—বোধ হয় নেহাৎই gallantry-র খাতিরে—দয়ার শরীর !)

বাণান-সংস্কার সম্বন্ধে এবং কিভাবে আপনার নমস্য ও শ্রদ্ধেয় কমিটি বাণান-সংস্কার চালাইয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। অলমতিবিস্তরেণ। শুধু অন্য ভাষায় বাণান-সংস্কার-ব্যাপারে কি ভাবে এবং কি নীতিতে চেষ্টা হয়, তাহার দুই একটি উদাহরণ দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

ইংরাজীতে Honour, Favour প্রভৃতির স্থলে Honor, Favor প্রভৃতি রূপ প্রস্তাবিত হইয়াছে, এবং উত্তর-আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে ; কিন্তু ইংলণ্ডে চলে নাই। এই সম্বন্ধে Fowler's *Modern English Usage* গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :

"The American abolition of '*-our*' in such words as *honour* and *favour* has probably retarded rather than quickened English progress in the same direction. Our first notification that the book we are reading is not English but American is often, now-a-days, the sight of an '*—or*'. 'Yankee' we say, and congratulate ourselves on spelling like gentlemen ; we wisely decline to regard it as a matter for argument.·········Such a change may come gradually. It is

not worth while to resist such a gradual change or to fly in the face of national sentiment by trying to hurry it."

অপর এক স্থলে : "Lackey", "Lacquey"—একই শব্দের দুইরূপই চলিত—Fowler লিখিয়াছেন, "The '—*key*' form is recommended" ; কিন্তু "Lacquer" "Lacker"-এর স্থলে শুধু লিখিয়াছেন, "The first form is established" ; ব্যস্, established-এর উপরে আর কথা কি ? (*cf.* রাণী ।)

Concise Oxford Dictionary—যাহা ইংলণ্ডের বিখ্যাত Oxford English Dictionary বা O. E. D.-র উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাহাতে লিখিত হইয়াছে Judgment, Rhyme, Axe, প্রভৃতি রূপের সম্বন্ধে :

"Such generally established spellings as *judgment*, *rhyme*, *axe*, have not been excluded in favour of the *judgement*, *rime*, *ax*, preferred by the O. E. D., but are retained at least as alternatives having the right to exist."
(*cf.* রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ।)

অন্যত্র, "In dealing with verbs such as *level*, *rivet*, *bias*, whose parts and derivatives are variously spelt, the final consonant being often doubled with no phonetic or other significance, we have as far as possible fallen in with the present tendency, which is to drop the useless letter, but stopped short of recognising forms that at present strike every reader as Americanisms ; thus, we write *riveled*, *riveter*, but not *traveling*, *traveler*."

কাণ্ডজ্ঞান বা commonsense এবং হুজুক বা faddism-এর মধ্যে কত তফাৎ তাহা ইংরাজী বাণান-সংস্কার এবং বাঙ্গালা বাণান-সংস্কারের এই

চিত্রদ্বয় হইতেই স্পষ্ট অনুমিত হয়—Look at this picture and look at that! বাঙ্গালা বাণান-কমিটির প্রচণ্ড গবেষণার মোটামুটি চিত্রটি দাঁড়াইল এই—মৌখিক ভাষায়, যেখানে রূপবাহুল্য এবং বিশৃঙ্খলা অপরিমিত, সেখানে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসের কিংবা সামর্থ্যের অভাব; আর সাধুভাষায়, যেখানে বর্ণবিন্যাস মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে একটা কিছু নূতনত্ব অথবা বিকল্পের সৃষ্টি করিতে উৎসাহ কিংবা স্পর্দ্ধার সীমা নাই। সংস্কারের নামে বিকারের সৃষ্টির এতদপেক্ষা নিদারুণ দৃষ্টান্ত কল্পনা করা দুঃসাধ্য। ইতি বাণান-সংস্কারপ্রসঙ্গঃ।

এখন আপনি যে আর কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা তুলিয়াছেন—আষাঢ়ের "প্রবাসী"-তে এবং আপনার এই চিঠিখানিতে—তাহারই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিব। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে একটা কথা সম্বন্ধে একটু নিঃসংশয় হইতে চাই। সে কথাটি আপনার ব্যবহৃত "প্রাকৃত বাংলা" সম্বন্ধে। ঠিক কি অর্থে যে আপনি "প্রাকৃত" বাঙ্গালা কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন আপনার প্রবন্ধে এবং পত্রে, তাহা আমি সব সময়ে বুঝিতে পারি নাই। একটু যেন loosely কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয়। কোন সময়ে মনে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষাকেই আপনি "প্রাকৃত" বাঙ্গালা বলিয়াছেন; কোন সময়ে মনে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার অ-সংস্কৃত অংশকে আপনি "প্রাকৃত" বাঙ্গালা বলিয়াছেন; আবার কোন সময়ে মনে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার যে মৌখিক (colloquial) রূপ আজকাল বহুল পরিমাণে সাহিত্যে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকেই আপনি "প্রাকৃত" বাঙ্গালা বলিয়াছেন। যেমন, এক স্থলে লিখিয়াছেন, "প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই"—কারণ তাহার অভিধান আছে। সে স্থলে ব্যাপক অর্থাৎ প্রথম অর্থে ব্যবহার মনে হয়। কিন্তু তৎপরেই যখন লিখিয়াছেন "কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি", তখন মনে হয় দ্বিতীয় অর্থে,

অর্থাৎ অ-সংস্কৃত অংশ অর্থে কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। আবার যখন কিছু পরে লিখিয়াছেন "প্রাকৃত বাংলা ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাসপোর্ট্ পেয়েছে" তখন মনে হয় তৃতীয় অর্থে অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার মৌখিকরূপ বুঝাইতে কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। তবে ছাপার অক্ষরের কথা বলাটা তত সুবিধার হয় নাই, কারণ আমাদের দেশে কি মৌখিক কি লৈখিক বাঙ্গালা, ছাপার অক্ষরের এলাকায় প্রবেশ কাহারওই বেশী দিনের কথা নহে। আপনি বোধ হয় সাহিত্যে ব্যবহারই mean করিয়াছেন—কারণ অপর একস্থলে লিখিয়াছেন "এতকাল পরে তাদের সেই ভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এইজন্য তাদের সেই খাটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে।" শুধু মৌখিকরূপী বাঙ্গালার সম্বন্ধেই বলা যায় যে, অল্পদিন হইল সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে (যদিও এ কথাটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কারণ আধুনিক যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যেও "আলালী" ধরণের রচনা প্রায় আশী বৎসর পুরাণো হইতে চলিল—তবে পরিমাণে বেশী নহে, এই যা)। কিন্তু অ-মৌখিক বাঙ্গালা ত চিরকালই বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়াছে—তৎসম, তদ্ভব, দেশজ, বিদেশী শব্দ-সংবলিত যে বাঙ্গালা তাহার সাহিত্যই ত বাঙ্গালা সাহিত্য। আমার যে সংশয় তাহা আপনাকে জানাইলাম। আলোচনার মধ্যে অস্পষ্টার্থ কিংবা বহুলার্থ কথা ব্যবহার করিলে logical ধারা বজায় রাখা বড় শক্ত হইয়া পড়ে। আমার ত মনে হয় যে, যদি আপনি প্রথম অর্থাৎ ব্যাপক অর্থেই "প্রাকৃত বাংলা" কথাটি ব্যবহার করিতে চাহেন, তবে অত বিশেষণে মণ্ডিত না করিয়া শুধু বাঙ্গালা ভাষা বলিলেই পারেন,— এ যেন একেবারে New Presbyter is but old Priest writ large! তাহা হইলে এই বাঙ্গালা ভাষারই তৎসম অংশ, তদ্ভব অংশ, দেশজ অংশ, বিদেশী অংশ, সাধুরূপ, মৌখিক রূপ, এই সব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা বেশ পরিষ্কাররূপে করা যায়।

যাহা হউক, যদি এই ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা অর্থেই আপনার মন্তব্যগুলি ধরিয়া লই, তবে তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আপনি লিখিয়াছেন, "এখন ওর (অর্থাৎ প্রাকৃত বাংলার) বানান নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তো", এবং তারপরেই "পুরোনো বাড়ির নানারকম দাগের" উপমা দিয়াছেন। অর্থাৎ ভাবটা বা implication-টা এই যে, বাঙ্গালার বাণান-নির্দ্ধারণে কোন নীতিই নাই, আজই প্রথম একটা নীতি প্রস্তুত করিতে হইবে, নূতন করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিতে হইবে—অর্থাৎ পণ্ডিতদিগকে এখনই প্রথম সাহিত্যিক বর্ণ-সমাজের মনু-পরাশর হইয়া উঠিতে হইবে। এই অভিমানটি আমি শুধু যে আপনার ভাষার ভঙ্গীতেই পাইতেছি তাহা নহে; নব্য বাণান-সংস্কারকদের অনেকেরই কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে এই রকম একটা প্রচণ্ড অহমিকার ভাব লক্ষ্য করিয়াছি, যেন তাঁহাদেরই মানস-সরোবর হইতে নবীন ভাষা-শতদল অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত হইয়া সদ্যোবিকসিত হইয়া উঠিবে।

কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নহে। এই কথারই ইঙ্গিত আমি চন্দননগরের বক্তৃতায় করিয়াছিলাম। আমি রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলাম, ইমানুয়েল কাণ্ট নামক বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক দুইখানি মোটা মোটা পুঁথি লিখিয়াছিলেন, একখানির নাম *Kritik der reinen Vernunft* (*Critique of pure Reason*), এবং অপরখানির নাম *Kritik der praktischen Vernunft* (*Critique of Practical Reason*)। সংস্কারকগণের ধরণধারণ দেখিয়া মনে হয়, যেন তাঁহারা pure reason-এর চর্চ্চায় বসিয়া গিয়াছেন, যেন তাঁহাদিগকে চাপরাশ দেওয়া হইয়াছে একটা নূতন ভাষা গড়িয়া তুলিবার জন্য—বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বের সাহায্যে—যেন তাঁহারা একটা প্রাচ্য Esperanto কিংবা Volapük রচনার পরোয়ানা পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ত সেরূপ নহে বাস্তব

ব্যাপার হইল practical reason-এর। একটা ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার নানা দোষ ত্রুটি বিরূপতা "পুরাতন দাগ" মানিয়া লইতে হইবে, clean slate-এ চিত্রাঙ্কন করিবার সুযোগ ত এখানে নাই। কেবল scope এইটুকু যে, বিশেষ কোন গলদ বা বিশৃঙ্খলা থাকিলে তাহার যথাসম্ভব নিরাকরণের চেষ্টা করা। আপনার "পুরোনো ইমারত"-এর উপমার সম্বন্ধে আমার ইহাই উত্তর—ইমারতটি ত পুরাতনই, নূতন করিয়া রাজমিস্ত্রী ডাকিয়া এই ভাষাসৌধ নির্ম্মাণ করিবার contract কেহ দেয় নাই, কেহ দিতে পারে না।

তাই বলি, বাঙ্গালা ভাষাকে নূতন করিয়া প্রস্তুত করিবার সময় আজ নাই—হাজার বৎসর ধরিয়া প্রচলিত কোন ভাষারই এইরূপ নব নির্ম্মাণ সম্ভবে না। এই জাতীয় দম্ভ এবং স্পর্দ্ধা পরিহার করিতে হইবে; ভাষার সংস্কারের কার্য্যে শ্রদ্ধার সহিত, সম্ভ্রমের সহিত, দরদের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে; খোঁজ করিয়া দেখিতে হইবে, আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে যে ভাষার গঠনে কি কি নীতি পাওয়া যায়, কি কি নিয়ম রহিয়াছে, কোন্ কোন্ ব্যবহার প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত; সেই সব নীতি, সেই সব নিয়ম, সেই সব ব্যবহার আরও প্রচলিত দৃঢ়বদ্ধ করা যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে; প্রাচীন ভাষাসৌধকে এই ভাবেই সুদৃঢ় ও সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিতে হয়। এবং পূর্ব্বের আলোচনায় দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, আমাদের দেশের ভাষায় নীতি, নিয়ম ও শিষ্টাচারের অভাব নাই—ইহা একটা উদ্দাম বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যের তাণ্ডবলীলাভূমি নহে।

এখন আপনার প্রসঙ্গগুলি একে একে ধরি। ইলেক্-সম্বন্ধে কথাটাই প্রথমে সারিয়া লই। সত্য কথা বলিতে ইলেক্-সম্বন্ধে আমার নিজের কোন অত্যাসক্তি নাই—যেমন শুনিয়াছি আছে বন্ধুবর সুনীতি বাবুর—এইজন্য ত বন্ধুমহলে তিনি "ইলেকট্রিশ্যান" বলিয়াই পরিচিত। আমি শুধু আপনাকে দেখাইতে চাহিয়াছিলাম ভাষাতত্ত্ব হিসাবে ইলেক্ কোন্

কোন্ স্থলে বসে। "গোধূম" হইতে "গম" হয়, গ্রীক *eleemosyne* হইতে য়্যাংলো-স্যাক্সন *œlmysse*-এর মধ্য দিয়া বর্ত্তমান ইংরাজীর অকিঞ্চন alms-এর উদ্ভব ; এই সব স্থলে যে ইলেকের উৎপাত বা আপনার ভাষায় "চিহ্নের উপদ্রব" স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা ত সর্ব্বজনবিদিত—এই সব ত এক শব্দ হইতে অপভ্রংশ হইয়া নূতন একটি গোটা শব্দের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত। এই সব স্থলে ত ইলেকের স্মৃতিচিহ্ন থাকে না। ইলেকের রাজত্ব হইল intermediate stage-এ—মাঝামাঝি অবস্থায়। যখন ঠিক নূতন শব্দে পরিণতি হয় নাই, যখন রূপটিকে পুরাতন পূর্ণরূপের contraction বা সংক্ষেপ বলিয়াই চেনা যায়, তখনই ইলেক্ বসে। "পড়িয়া" যখন সংক্ষেপে "প'ড়ে" লেখা হয়, তখন ইলেক্ বসে (এবং ইলেকের যে কিছু উপকারিতা আছে, তাহা বোধ করি আপনিও এক্ষেত্রে স্বীকার করিবেন, কারণ "প'ড়ে" না লিখিয়া "পোড়ে" লিখিলে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা) ; কিন্তু "গোধূম" যখন "গম" রূপ স্বতন্ত্র শব্দই হইয়া গিয়াছে, তখন আর ইলেক্ বসে না। ভাষার মৌখিক রূপের পরিবর্ত্তমান fluid অবস্থাতেই ইলেকের ছড়াছড়ি (যেমন shan't, won't, ain't, ইত্যাদি) ; যখন তাহা সাধুরূপের rigidity প্রাপ্ত হয়, তখন ইলেকের ব্যবহার যৎসামান্য। সুতরাং সাধুভাষাপন্থী মাদৃশজনের ইলেক্-ঘটিত মাথাব্যথা বিশেষ নাই ; সে লড়াই আপনাতে ও সুনীতি বাবুতে লাগিয়া যাউক ; আমরা কৌতুক দেখিতে থাকি।

তারপর "ই" এবং "ও" অব্যয়াত্মক particle-দ্বয় সম্পর্কে এবং প্রসঙ্গতঃ "কি" এবং "কী" সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলি। আপনি এবিষয়ে গম্ভীর ভাবে আদেশ দিয়াছেন আমাকে হাস্য প্রত্যাহরণ করিতে। আপনি যখন হুকুম করিয়াছেন, তখন অবশ্যই প্রত্যাহরণ করিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একবার না হাসিয়া পারিলাম না ; কারণ, আপনি যে ধ্বনি-প্রভেদের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ত বিশেষ ভারসহ বলিয়া মনে হইল না।

যেমন ধরুন, "তারই" এবং "ভাতই"। "তারই" (যাহাকে আপনি "তারি" লেখেন) এবং "ভাতই" (যাহাকে আমি "ভাতি" লিখিয়া আপনার তিরস্কারভাজন হইয়াছি), এতদুভয়ের মধ্যে আপনি একটা emphasis বা ঝোঁকগত প্রভেদ বা distinction দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন যে "বাঙ্গালী **ভাতই** খায়" এই কথাটিতে "ই" ব্যবহারের দরুণ "ভাত"-এর উপর যে জোর পড়ে, শব্দটির ভা-অংশের অর্থাৎ প্রথম স্বরের উপরেই সেই জোর পড়ে, সুতরাং এ স্থলে "ই"-কে ভাত শব্দটির অন্তর্গত করা উচিত নহে, এবং গম্ভীর ভাবে বলিয়াছেন যে, "ভাতি" বাণান ভুল বাণান। (আমি অবশ্য শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে আপনার চক্ষেও কোন কোন বাণান ভুল বাণান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যাক।) কিন্তু যখন বলি "ওহে খোকা এতক্ষণ যার কথা তোমায় বলছিলুম, এটা **তারই** বাড়ী;" তখন "ই" ব্যবহারের দরুণ "তার" শব্দের উপরে যে ঝোঁকটি পড়ে, সেটা পড়ে কিসের উপর? সেই তা-অংশেরই উপর বা প্রথম স্বরেরই উপর। বস্তুতঃ, "তারি" "ভাতি" এই শব্দদ্বয়ের উপর emphasis-এর ব্যবহারে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। যদি "ভাতি" ভুল বাণান হয়, তবে "তারি"-ও ভুল বাণান। আর যদি তথাপি আপনি "তারি" লেখা পছন্দ করেন, তবে আমিও ইচ্ছা হইলে "ভাতি" লেখা সুরু করিতে পারি। তেমনই, "এখনই যাব" এবং "মাখনই খাব", এই দুই বাক্যে "এখনই" ও "মাখনই" কথা দুইটির উপর ঠিক একই স্থানে বা একই ভাবে জোর পড়ে, অর্থাৎ সাধারণতঃ প্রথম স্বরের উপরই পড়ে। তবে কখন্ কোথায় কি ভাবে জোর পড়িবে তাহা বক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—ইহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম হইতে পারে না। আর আসল কথা, উচ্চারণে ঝোঁক যেখানেই পড়ুক, তদ্দরুণ "ই" এবং "ও" অব্যয় শব্দদ্বয়ের অস্তিত্ব প্রাক্তন শব্দেতে বিলীন হইয়া যাইবার কি কারণ থাকিতে পারে? এবিষয়ে আপনার যুক্তির গোড়ার ভুল হইতেছে এই যে "ই" এবং "ও"

সার্থক অব্যয় শব্দ—ইহারা কোন স্বরভঙ্গীর চিহ্ন নহে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে ধ্বনিবিচার একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। আর এক কথা, অ-কারান্ত হসন্ত-উচ্চারিত শব্দের বেলায়ই এই ব্যাপার আপনি করিতে পারেন, অন্য-স্বরান্ত শব্দের বেলায়—আমরাই, তোমরাই, আমিও, তুমিও, ইত্যাদির বেলায় কি করিবেন? বেচারা অ-কার নেহাৎ নিরাকার বলিয়াই ত তাহার উপর এই উৎপাত—কিন্তু নিরাকারের উপর এই অত্যাচার কি আপনাতে সাজে? ধর্ম্মে সহিবে কি?

বাস্তবিক কোন্ ধ্বনিমূলক theory-র উপর নির্ভর করিয়া আপনি "তারি", "এখনি", "তখনি", "আজো", "কালো" ইত্যাদি (আবার মুস্কিল, এ আবার কোন্ "কালো"? কৃষ্ণবর্ণ "কালো", না "কালও" "কালো"? সত্যই সংস্কারকের পথ কুসুমাস্তৃত নহে।) ব্যবহার করেন, তাহা আমি জানি না; কিন্তু সচরাচর যে লোকে ঐরূপ লিখিতে প্রয়াস পায়, সেটা নিতান্তই স্থান ও কাল ও শক্তির economy-র খাতিরে, ধ্বনিতত্ত্ব খতাইয়া নহে। তবে যে "ভাতি" লেখে না সেটা নেহাৎ সংস্কারে বাধে এবং রুচিতে ঠেকে বলিয়া; "যার", "তার", "এখন", "তখন", "আজ", "কাল" প্রভৃতি নেহাৎ আটপৌরে শব্দের উপর উৎপাত করিতে ততটা ঠেকে না শাব্দিক conscience-এ—ইহাই কারণ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখি। মনে পড়ে, বহু বৎসর পূর্ব্বে বরিশালের কবি ৺দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় একবার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় এই "ভাতি" ষ্টাইলে একটি প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন।

আশা করি, "তারই" এবং "ভাতই", "এখনই" এবং "মাখনই," ইত্যাদি শব্দদ্বয়ের emphasis যে একই প্রকার, তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি। কিন্তু আসলে প্রশ্নটা তদপেক্ষা গুরুতর। প্রশ্নটা হইল এই যে, ভাষার উচ্চারণে মৌখিক কথাবার্ত্তায় শব্দের উপরে যে নানাবিধ emphasis বা ঝোঁক পড়ে, ভাষার উপরে স্বরভঙ্গীর যে বিচিত্র লহরীলীলা বহিয়া যায়

তাহারও বাহন কি বাণানেরই হইতে হইবে? Only he can sing এবং He can only sing, এই বাক্যদ্বয়ের প্রথমটিতে he-এর উপরে, দ্বিতীয়টিতে sing-এর উপরে জোর (বা emphasis) পড়ে; অন্য শব্দের উপর পড়ে না; এই যে জোরের সদ্ভাব বা অভাব ইহাও কি বাণানের modification দ্বারা বুঝাইতে হইবে? I know what you are doing, এবং What are you doing? এই বাক্যদ্বয়ে what শব্দের উপরে শুধু emphasis নয়, intonation বা স্বরভঙ্গীরও যে তারতম্য, তাহাও কি বাণান দিয়া বুঝাইতে হইবে? তবে ত বাণান বেচারীর উপর আপনি নিতান্তই নির্মম হইয়াছেন বুঝিতে হইবে; এই নিরীহ বাহনটির উপরে এত গুরুভার চাপাইলে ত cruelty to animals-এর দায়ে পড়িবার সম্ভাবনা! তাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে ত আর phonetic spelling-এ কুলাইবে না, একখানা আস্ত phonograph-ই আবশ্যক হইবে দেখিতেছি। ইংরাজী দৃষ্টান্ত যদি আপনি পছন্দ না করেন তবে একটি বাঙ্গালা দৃষ্টান্ত দিই। ৺রজনী সেন মহাশয়ের স্বদেশী যুগের সেই গানের একাংশ নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে:

"তাই ভাল মোদের মায়ের ঘরের **শুধু** ভাত।"

সেই "শুধু ভাত" শব্দ দুইটির উচ্চারণ, আর "শুধু **ভাত** দিয়ে বসে রইলে কেন, ডাল দাও শাগ্‌গীর" এই বাক্যটিতে "শুধু ভাত" শব্দ দুইটির উচ্চারণে কত তফাৎ। একটিতে "শুধু"-র উপরে জোর, আর একটিতে "ভাত"-এর উপরে জোর। এই প্রভেদ কি বাণানের তারতম্য করিয়া বুঝাইতে হইবে? বক্তাদের ও পাঠকদের commonsense বা কাণ্ডজ্ঞানের উপর কি কিঞ্চিন্মাত্রও নির্ভর করা চলে না?

"কি"-"কী" সমস্যাতেও আমার একই বক্তব্য। এই দুইটি রূপ ব্যবহার করিয়া যে যে স্থলে আপনি প্রভেদ দেখাইতে চাহেন, তথায় প্রভেদ বাস্তবিক মাত্রা বা quantity-র প্রভেদ ততটা নহে, যতটা stress বা

intonation-এর প্রভেদ। আমি "প্রবাসী"-র প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, stress, intonation এবং quantity, ইহাদিগকে গুলাইয়া ফেলা ঠিক নহে। এখানে না হয় আপনি একখানি ঈ-কার পাইয়াছেন বলিয়া "কি"-কে "কী"-রূপে লিখিয়া প্রভেদ সূচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ("ঈ"-কারও তবে সময়ে সময়ে কাজে লাগে দেখিতেছি—এমন কি "প্রাকৃত বাংলা"-তেও); কিন্তু "কে রে হৃদয়ে জাগে শান্ত শীতল রাগে" এই পদটির "কে" এবং "রে"-র প্রভেদ কি প্রকারে সূচিত করিবেন? বস্তুতঃ এই সব প্রভেদ সূচিত করা বাণানের কর্ম্ম নহে।

তাছাড়া, কোন্ স্থলে আপনি "কি" লেখেন এবং কোন্ স্থলে আপনি "কী" লেখেন, এ বিষয়েও আপনি যে তফাৎ বা distinction দেখাইয়াছেন, তাহাতেও কিঞ্চিৎ গলদ আছে বলিয়া মনে হয়। আপনি বলিয়াছেন অব্যয়াত্মক "কি" শব্দ আপনি "কি" লেখেন, আর সর্ব্বনাম "কি" শব্দ "কী" লেখেন; যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, "তুমি কি বাড়ী যাবে?" এবং "তুমি কী খাচ্ছ?" কিন্তু "তুমি বল কিহে?" এস্থলে আপনি কি "কী" লেখেন? বোধ হয় না—অথচ এখানে "কি" সর্ব্বনাম। পক্ষান্তরে, "তুমি কি সুন্দর?" (How handsome you are!) "কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!" এ সব স্থলে "কি" কি সর্ব্বনাম? প্রথমটিতে adverb, দ্বিতীয়টিতে interjection—অর্থাৎ অব্যয়াত্মক। "কী রাম, কী শ্যাম, কী যদু, সবই সমান"—এ স্থলেও "কি" কি সর্ব্বনাম? এস্থলে ইহা conjunction—অর্থাৎ অব্যয়াত্মক। আমার ত মনে হয় যে প্রশ্নাত্মক particle "কি" ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ স্থলেই আপনি "কী" ব্যবহার করিয়া থাকেন; অথবা যেখানেই "কি"-র উপরে emphasis পড়ে সেখানেই আপনি "কী" লেখেন—সর্ব্বনাম-অব্যয় খতাইয়া লেখেন না। আপনি অদ্বিতীয় সাহিত্যস্রষ্টা, কিয়ৎপরিমাণে ভাষাস্রষ্টাও বটেন; কিন্তু বিশ্লেষণ বিষয়ে আমি আপনার যেন কিঞ্চিৎ অপাটব লক্ষ্য করিতেছি।

বোধ করি সৃষ্টি এবং বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভার আবশ্যক হয়।

আর এক কথা বলিয়াই আমি "কি"-"কী" প্রসঙ্গ শেষ করি। আপনি নিজে ত সাবধান লোক, ওজন করিয়া ঝোঁক মাফিক কোন কোন স্থলে "কি" শব্দকে "কী" রূপে লেখেন, কিন্তু আপনার দেখাদেখি যে অর্ব্বাচীনদের হাতে "কী"-রূপ প্রাকৃত বাঙ্গালাকে ছাইয়া ফেলিল। তাহারা যে "তুমি কি বাড়ী যাবে?" এখানেও "কী" লেখে! এমন কি "কী"-এর দেখাদেখি "কীসে" "কীসের" প্রভৃতিরও যে ছড়াছড়ি হইতেছে তরুণ-প্রগতি-অগ্রগতি সাহিত্যে! সাধে কি আমি এই পত্রের প্রারম্ভে আপনাকে warn করিয়াছি, যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ ইত্যাদি? এই ক-যুক্ত ঈ-কারের প্লাবনে যে "প্রাকৃত বাংলা" ডুবু ডুবু—ভাষা-বসুন্ধরাকে এই প্রলয়পয়োধি হইতে উদ্ধার করিতে নূতন করিয়া বরাহ-অবতারের আবশ্যক হইবে মনে হইতেছে—বাণান-সমিতির কর্ণধারদিগের কর্ম্ম নয়!

আর একটি ছোট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লই। আপনি আপনার চিঠির এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা সহরের প্রচলিত উচ্চারণ "কোল্‌কাতা", কিন্তু আমরা সে ভাবে লিখি না; অথচ ইংরাজীতে কলিকাতাকে লেখা হয় Calcutta এবং উচ্চারণও তদনুসারে করা হয় "ক্যাল্‌কাটা" ("ক্যাল্‌ক্যাটা" নহে)। তার পর এই কথাটিতে আমাদের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া যন্ত্রণন্ত্রের মেশীন গান, অঞ্জন চোখে দেওয়া হইবে না মুখে দেওয়া হইবে, ইত্যাদি রসিকতা করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু বোধ করি স্থূলবুদ্ধিবশতঃই আমি এই ব্যঙ্গটির point কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজরা কলিকাতাকে কি লেখে এবং তদনুসারে কি উচ্চারণ করে, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালাতে কলিকাতা কি ভাবে লিখিতে হইবে তাহার সম্পর্ক কি? ইংরাজরা গঙ্গাকে Ganges লেখে এবং তদ্রূপই বলে, তাহাতে "গঙ্গা" শব্দের বাণান বা উচ্চারণের কি আসে যায়? ফ্রান্সের

রাজধানী Paris (পারী) ; ইটালিয়ানরা এই সহরকে লেখে Parigi এবং উচ্চারণ করে পারীজী, ইংরাজরা লেখে Paris-ই কিন্তু উচ্চারণ করে প্যারিস্। ইটালীতে এক প্রসিদ্ধ সহর আছে Firenze (ফিরেন্‌ৎসে), আর এক সহর আছে Napoli (নাপোলি), আর এক সহর আছে Venezia (ভেনেৎসিয়া), আর এক সহর আছে Livorno (লিভর্ণো), ইংরাজরা সেই সহরগুলিকে যথাক্রমে লেখে Florence, Naples, Venice, Leghorn, এবং তদনুযায়ী উচ্চারণ করে। ইংলণ্ডের রাজধানী London ; তাহাকে ফরাসীরা লেখে Londres এবং তদনুযায়ী উচ্চারণ করে—ইটালিয়ানরা লেখে Londra এবং তদনুযায়ী উচ্চারণ করে—ইহাতে ভাষাতত্ত্বের কি প্রমাণ হইল? বিদেশীরা অনেক সময়ে ঠিক ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে না বা ধরিতে পারে না, এবং সেই জন্য নিজের মনগড়া মত উচ্চারণ করে এবং তদনুযায়ী লেখে—এই মাত্র। তাহাতে "কলিকাতা"-র লিখিত রূপ কি হইবে সে বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হইল? বোধ হয় আপনার ইঙ্গিত এই যে "প্রাকৃত" বাঙ্গালার বিশুদ্ধির নিদর্শনস্বরূপ বাঙ্গালার রাজধানীকে "কোলকাতা" লেখা উচিত। তাই যদি আপনার মত হয়, তবে এখন যেহেতু বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদেরও একটা ভোট লওয়া দরকার মনে করি। তাহারা আপনার "কোল্‌কাতা" (বা "কোল্‌কেতা") মানিবে না, তাহারা বলিবে যে বাঙ্গালার রাজধানীকে "কৈল্‌কাতা" লেখা উচিত, কারণ ইহাই পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণ, এবং তাহাদেরই সংখ্যাধিক্য—আজ গণ-তন্ত্রের যুগে ত আর সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের ভোট অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব আপনাদের ন্যায় সংস্কারকদিগের পক্ষেও এই উভয়-সঙ্কটের স্থলে "কলিকাতা" লেখাই নিরাপদ্ মনে করি। রহস্য ছাড়িয়া দিলেও, একথা এত সহজ যে এবিষয়ে আপনাকে কেন আমার বলিতে হইতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। মূলরূপ "কলিকাতা" (= কল্ + ই + কাতা) হইতে প্রথমে "কৈল্‌কাতা" (= কই + ল্ + কাতা)—ই-ধ্বনির

metathesis (বা বিশিষ্ট নাম epenthesis)-এর প্রভাবে ; তার পর "কোল্‌কাতা"—এখানে ই-কার লোপ পাইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বস্বর "অ"-কে "ও"-তে পরিণত করিয়াছে—ধ্বনিতত্ত্বের umlaut (বন্ধুবর সুনীতি বাবু যাহাকে বাঙ্গালাতে "অভিশ্রুতি" বলিয়াছেন) তাহারই প্রভাবে। এই তিন রূপের মধ্যে মূল রূপ "কলিকাতা"-ই ; দ্বিতীয় রূপ পূর্ব্ববঙ্গের মৌখিক উচ্চারণে পাওয়া যায় ; তৃতীয় রূপ আজকাল রাঢ়দেশের মৌখিক উচ্চারণে পাওয়া যায়। অতএব কি লিখিতে হইবে ? প্রকৃত মূল রূপ, না, চির-পরিবর্ত্তমান স্থানবিশেষের বা কালবিশেষের মৌখিক রূপ ? আমার ত মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তরে "কলিকাতা"-ই টিঁকিয়া যায়, যেমন London রূপই টিঁকিয়া আছে, Lundun হয় নাই। আরও যদি মৌখিক রূপ চাহেন ত দিতে পারি। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ সচরাচর "কলিকাতা"-কে বলে "কৈল্‌হাতা" ; সে রূপটি চালাইতে আপনি রাজী আছেন ?

মূল শব্দের মৌখিক বিকৃতি ক্রিয়াপদের বিভক্তি আলোচনার সময়ে অনেক দেখাইতে পারিব ; কিন্তু এই মৌখিক বিকৃতি শুধু ক্রিয়াপদেই আবদ্ধ নহে, বিশেষ্য বিশেষণেও যথেষ্ট আছে—অবশ্য যে সব শব্দ সদাসর্ব্বদা কথাবার্ত্তায় বেশী ব্যবহৃত হয়, তাহাতেই স্বভাবতঃ এই বিকৃতি বেশী ঘটে। মূলরূপ জুয়াচোর, পটুয়া, মাটিয়া, মাইয়া, মাছুয়া, বালিয়া, জালিয়া, প্রভৃতি শব্দের পশ্চিম বঙ্গে এখন উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে জোচ্চোর, পোটো, মেটে, মেয়ে, মেছো, বেলে, জেলে প্রভৃতি ; পূর্ব্ববঙ্গে কোথাও (যেমন বরিশাল অঞ্চলে) প্রায় পূর্ব্ব রূপই রহিয়াছে, কোথাও (যেমন ঢাকা অঞ্চলে) কোন কোনটির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যেমন পৌটা, মাইটা, মাউছা, বাইলা, জাইলা প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন মৌখিক রূপ সাধুভাষাতেও অবলম্বিত হইয়াছে, যেমন মেটে, মেয়ে, জেলে প্রভৃতি ; কোনটা বা ততটা "সাধুত্ব" প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এই সর্ব্ববিধ রূপই "খাঁটি বাংলা"-রই রূপ—

কোনটা লৈখিক, কোনটা মৌখিক—কোনটা "সাধু", কোনটা "অসাধু"—কিন্তু প্রবঞ্চনার দায়ে পড়িবার মত দোষী কেহই নহে, কারণ কোনটাই সংস্কৃতের মুখোস পরিয়া নাই।

এখন শেষ প্রশ্নে আসিতেছি—বাঙ্গালাতে সাধুভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের রূপ। এই প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য এই যে, "বর্তমান সাধু বাংলাগদ্য ভাষার ক্রিয়াপদগুলি গড়-উইলিয়মের পণ্ডিতদের হাতে ক্ল্যাসিক ভঙ্গীর কাঠিন্য নিয়েছে," "গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন, তাতে বাংলার ক্রিয়াপদগুলিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোস পরিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন ; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে কিন্তু তেমনি প্রাকৃতও নয়" ; এবং আপনার এই চিঠিতেও লিখিয়াছেন, "এক কালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলুম। সেই সাহিত্যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ্য করেছিলুম। হয়তো ভুল করেছিলুম। দয়া করে দৃষ্টান্ত দেখাবেন।"

আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। দৃষ্টান্ত দেখাইব। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় ; সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীনকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেই বোধ করি আপনার আদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করা হইবে।

প্রথমে গদ্য সাহিত্য বা গদ্য রচনা হইতে দেখাইব, কারণ গদ্যেই সব রকম ক্রিয়াবিভক্তি পাইবার সুযোগ বেশী—যেহেতু করিয়াছিলাম, করিতেছিলাম, ইত্যাদি প্রকাণ্ড পদ ত পদ্যচ্ছন্দে সচরাচর ব্যবহৃত হইবার কথা নহে।

প্রথম, ১৪৭৭ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) লিখিত একটি চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। এই পত্রখানি কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ আহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে লেখেন। ইহাতে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের এবং আসামের কিছু কিছু অপভাষা বা উপভাষাও দেখিতে

পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিবেন, পত্রখানির রচনারীতি প্রায় বর্ত্তমানের সাধু ভাষার ন্যায়। আর রেফের পরে বর্ণদ্বিত্বও লক্ষ্য করিবেন :

"লিখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক।...সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধূমার্সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউলিয়া শ্যামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।"

ভূষণার রাজপুত্র খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত দোম্ আন্তোনিও (Dom Antonio) প্রণীত "খৃষ্টানধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তরমালা" হইতে কিছু দেখাইতেছি (এই পুস্তকখানির রচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে) :

"বিস্তর মস্তক দেখিয়াছি কারো কপালে শুদা লিখন দেখি নাহি আমিও এহাতে সন্দে করিতাম, এহার কারণ কি ? কারণ এই কারো কপালের হাড় জোড়া থাকে, তাহাতে লিখনের মত দেখি, এ কথা কপালের হাড়ের জোড়া কসাইয়া চাও এইখনে খসিবেক, আরবার লাগাইলে লাগে ; তিনি এমত গড়িয়াছেন।"

পাদ্রী মানোয়েল দা আসুম্পসাও (Manoel da Assumpçao) রচিত "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি —এই পুস্তক লিস্‌বন সহর হইতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রোমক অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল (ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক) :

"হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ সহরে দুই কুলীন পুরুষ শত্রু আছিল; বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর একজনেরে তালাস করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ।...পরাজয় হইয়া শত্রুকে মাফ চাহিয়া কহিল:

ঠাকুর পরাজয় হইয়াছি, আমারে জিনিলা, আর কি চাহ?...বৃদ্ধকালে পুণ্যে পূর্ণিত করিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে।"

বাঙ্গালার নবাব জাফর খাঁ (মুর্শিদ কুলি খাঁ)-এর সময়ে লিখিত একটি দলীলের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি—ইহার তারিখ ১১২৫ বঙ্গাব্দের (১৭১৭ খৃষ্টাব্দের) ১৭ই ফাল্গুন—স্বকীয়া ও পরকীয়াতত্ত্ব অবলম্বী দুই দল বৈষ্ণবের এক বিচার সভা বসিয়াছিল, তাহাতে একপক্ষ পরাজিত হওয়ায় এই দলীল সম্পাদিত হয়:

"...ভাগবত সাস্ত গ্রন্থ করিয়াছিলেন...শ্রী৺জমুনায় সমার্পন করি আছিলেন...পদ্মাসন খুদিয়া সেই একলক্ষ গ্রন্থ আনীয়া...সকল গ্রন্থ বিচার করিয়া সকিয়া ধর্ম্ম প্রেধান করিয়াছিলা সকলে কহিলেন সকিয়া ধর্ম্ম স্থাহি শ্রীশ্রী৺ স্থানে সকীয়া ধর্ম্ম প্রেকাষ করিবেন...বিচার করিবেক ...প্রেয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম...তাহারা জে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন...আগে দস্তখত করাহ তবে আমরাহ দস্তখত করিআ দিব...এইমত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবার জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিহোঁ কহিলেন... ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন...দস্তখত পরকিয়ার ধর্ম্মের পর করিয়া দেসকে গেলেন এখানে জে সকল সাস্তগ্রেন্থ লইয়া বিচার হইল...আমরা পঞ্চ পরিবারের মধ্যে থারিজ হইলাম তোমরা আপন ২ পরিবারে বিলাতে দখল করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ...এতদর্থে বিচার পরাভব হইয়া ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ১৭ ফাল্গুন।"

মহারাজ নন্দকুমার ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে তদীয় কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়ের নিকট একখানি পত্র লেখেন; তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম:

"অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকরর মকরর

জানিবা। নাগাদি ওরা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌছে তাহা **করিবা**. এ বিষয়ে এক পত্র **লক্ষ হইতে** অধিক **জানিবা**।”

১৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত একখানি সহজিয়া মতের বৈষ্ণব গ্রন্থ “জ্ঞানাদিসাধনা” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি :

“সাধু **জিজ্ঞাসেন** তুমি পূর্ব্বে **শুনিয়াছিলায়** পরমেশ্বরের মুখ হইতে বেদাদি শাস্ত্র **জন্মিয়াছে** এবং সেই বেদাদি শাস্ত্র ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম **কহিয়াছে** **সেই** বেদাদিশাস্ত্র কি মিথ্যা সত্য **কহ**। অজ্ঞানী জীবে **কহেন** যখন আমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা **হইয়াছেন** এখন **বুঝিলাম** ঐ বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা **হইয়াছে** এবং ঐ শাস্ত্রেতেই **লিখিয়াছেন** যে ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্মহ মিথ্যা এবং আমার কথাহ মিথ্যা। এখন আপনার শ্রীমুখের কথা **শুনিয়া** আপনার শ্রীচরণের নিকট আমি নিঃশব্দ **হইলাম**।”

এখন পদ্যসাহিত্য হইতে কিছু দৃষ্টান্ত দিই। প্রথমে মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক নেপাল হইতে আনীত বাঙ্গালা রচনার আদিমতম আবিষ্কৃত উদাহরণস্বরূপ “চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়” হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করি। দেখিতে পাইবেন যে উহার বাঙ্গালা প্রায় অবোধ্য (অন্ততঃ দুর্ব্বোধ্য)—কিন্তু ক্রিয়াপদের বিভক্তির রূপ তখন হইতেই অনেকটা পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহার রচনা একাদশ শতাব্দীর কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীর :

দশমি দুআরত চিহ্ন **দেখইআ**
আইল গরাহক অপণে **বহিয়া** ॥ ৩ ॥
কাহ্নু কহিঁ গই **করিব** নিবাস ॥ ৭ ॥
বাটত **মিলিল** মহাসুহ সঙ্গা ॥ ৮ ॥
মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী
মাঅ **মারিআ** কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥ ১১ ॥

সদ্‌গুরু বোহে **করিহ** সো নিচ্চল ॥ ২১ ॥

জীবন্তে মঅলেঁ **ণাহি** বিশেসো ॥ ২২ ॥

করুণ মেহ নিরন্তর **ফরিআ**

ভাবাভাব দ্বন্দল **দলিয়া** ॥ ৩০ ॥

দুহিল দুধ্‌ কি বেণ্টে ষামায় ।

বলদ **বিআএল** গবিআ বাঁঝে ॥ ৩৩ ॥

এতকাল হাঁউ **অচ্ছিলেঁ** স্বমোহেঁ ।

এবেঁ মই **বুঝিল** সদ্‌গুরুবোহেঁ ॥ ৩৫ ॥

জই মনে **অছিলে** স তইছন অচ্ছ ॥ ৩৭ ॥

ঘারেঁ পারেঁ কা **বুঝ্‌ঝিলে**

মরে **খাইব** মই দুধ কুণ্ডবাঁ ॥ ৩৯ ॥

ভণই কঙ্কণ কলএল সাদেঁ

সর্ব্ব **বিচ্ছরিল** তবতানা দেঁ ॥ ৪৪ ॥

আজি ভূসু বঙ্গালী **ভইলী**

ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ।

চউকোড়ি ভণ্ডার মোর **লইআ** সেস

জীবন্তে **মইলেঁ নাহি** বিশেষ ॥ ৪৯ ॥

ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ **ফুলিআ** ॥ ৫০ ॥

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একখানি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই একটি পদ উদ্ধৃত করি :

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন ।

বাঁশীর শবদেঁ মো **আউলাইলোঁ** রন্ধন ॥

দাসী **হআঁ** তার পাএ **নিশিবোঁ** আপনা ॥

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী ।

বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি **হারায়িলোঁ** পরাণী ॥

আকুল **করিতেঁ** কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
মেদনী বিদার দেউ **পসিআঁ** লুকাওঁ ॥
বাসলী শিরে বন্দী **গাইল** চণ্ডীদাসে ॥

৯৮৫ বঙ্গাব্দে লিখিত একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি-পূর্ব্বের পুঁথি হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কিছু উদ্ধৃত করি :

তবে পক্ষরাজ বির বরূনে **লইয়া**।
আদিত্যের রথে তারে **বসাইল লঅা** ॥
বিসম সুর্জ্জের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরূনের আৎসাদনে **হৈল্য** নিবারণ ॥
হেনকালে সুর্য্যে **বৈল** দেব নারায়ন।
চক্রেতে অসুরমুণ্ড **করিল** ছেদন ॥

"শূন্যপুরাণ" হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করি—ইহার কোন কোন অংশ অতি পুরাতন, এবং কোন অংশই সপ্তদশ শতাব্দীর পরের লেখা নহে :

মহাসুন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।
তাহা **হইতে জনমিল** অনিল দুই জন ॥
আসন **ছাড়িআ** পরভু **বৈসেন** চুমুক উপরে।
পরভুর আসন বিষ্ণু সহিতে না পারে ॥
দআর আসনে ধর্ম্ম **বসিল** আপনে।
চৌদ্দ যুগ গেল পরভুর এক বস্তু জানে ॥
কিবা আজ্ঞা মহাপরভু **বলিবা** সত্তর।
কি **লাগিআ** আহ্মারে ডাকিলা মাআধর ॥

কাটিয়া ছিড়িয়া মাপিয়া জখিয়া
সত হাতে **হইল** পোতা ॥
ব্রহ্মা **হইলেন** পণ্ডিত বিষ্টু **হইলেন** কম্নি
পার কর ধর্ম্মরাজা **লইলাম** স্মরণ ॥
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় **বলিয়া** এক নাম ॥
যতেক দেবতাগণ সভে **হয়্যা** একমন
আনন্দেতে **পরিল** ইজার ॥
গণেশ **হইআ** গাজী কাত্তিক **হৈল** কাজি
ফকির **হইল্যা** জত মুনি ॥
জতেক দেবতাগণ **হয়্যা** সভে একমন
প্রবেশ **করিল** জাজপুর ॥
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥

মালাধর বসুকে হুসেন শাহ "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দিয়াছিলেন; তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" রচনার গোড়া হইতেই একটি পদ উদ্ধৃত করি:

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে **বান্ধিয়া**।
লোক **নিস্তারিতে** যাই পাঁচালী **রচিয়া** ॥

বিস্তৃত পদাবলী সাহিত্য হইতে দুই চারিটি মাত্র পদ দিই:

মরিব মরিব সখি নিচয় **মরিব**।
কানু হেন গুণনিধি কারে **দিয়া** যাব ॥

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে **নাহিক** দুখ।
বঁধু তোমার **লাগিয়া** কলঙ্কের হার গলায় **পরিতে** সুখ।

সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ ॥

তুমি কোনদিনে যমুনা সিনানে **গিয়াছিলা** নাকি একা।
শ্যামের সহিতে কদম্ব তলাতে **হৈয়াছিল** নাকি দেখা ॥

সই কেবা **শুনাইল** শ্যাম নাম
কাণের ভিতর **দিয়া** মরমে **পশিল** গো
আকুল **করিল** মোর প্রাণ।

বঁধু কি আর **বলিব** আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ **হৈও** তুমি ॥

তোমার চরণে আমার পরাণ
বাঁধিব প্রেমের ফাঁসি।
সব **সমর্পিয়া** একমন **হৈয়া**
নিচয় **হইলাম** দাসী।

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে ॥

দুখের **লাগিয়া** এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে **পুড়িয়া** গেল।

অমিয়া সাগরে সিনান **করিতে**
সকলি গরল ভেল ॥

পিরীতি **বলিয়া** এ তিন আখর
ভুবনে **আনিল** কে।
মধুর **বলিয়া** **ছানিয়া** খাইনু
তিতায় **তিতিল** দে॥

শুন লো রাজার ঝি আমি **কহিতে আসিয়াছি**।
কানু হেন ধন পরাণে **বধিলি** এ কাজ **করিলি** কি ?

চাহেন ত সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরণ নন্দী, কৃত্তিবাস, আলাওল, বিজয় গুপ্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ইত্যাদি হইতেও উদ্ধৃত করি। আর কত উদ্ধৃত করিব ? বাঙ্গালার সাধুভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের রূপের প্রয়োগ সমস্ত উদ্ধৃত করিতে গেলে যে সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্য exhibit করিতে হয়। আশা করি আপনার বিশ্বভারতীতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের অভাব নাই ; আপনি অবসরমত তন্মধ্যে যে কোন একখানি নাড়াচাড়া করিলেই ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন। পদ্যে অবশ্য ছন্দের খাতিরে পূর্ণ ক্রিয়াপদটির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ, বিকৃত রূপ এবং মৌখিক রূপও দেখা যায়—যেমন, "করিয়া" স্থলে "করি," "করিলাম" স্থলে "করিনু", "করিয়াছিলাম" স্থলে "করেছিনু", "করিল" স্থলে "করিলা", "হইল" স্থলে "ভেল", "দিব" স্থলে "দিমু", "দেখিয়া" স্থলে "দেখে", ইত্যাদি—কিন্তু সাধুরূপেরই প্রয়োগবাহুল্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকবর্গের উপরে আপনি বাঙ্গালা সাধু ক্রিয়াপদ রচনার দায়িত্ব কি প্রকারে চাপাইলেন, তাহা সত্যই আমি ভাবিয়া পাই না—এই ক্রিয়াপদটিতেই তাঁহারা মোটেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুনীতিবাবুর "বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা" বই হইতেও এবিষয়ে একটু উদ্ধৃত করি—তিনি ত আপনার নমস্য পণ্ডিতবর্গের একজন :

"প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা, তথা আধুনিক সাধুভাষা, হইতে চার পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা ভাষার একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারা যায়। মৌখিক ভাষায় বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা বলি 'রেখে, রেখ্যে, রেখ্যা, রাখ্যে, রাইখ্যা' প্রভৃতি; আধুনিক সাধুভাষার রূপ 'রাখিয়া' (এই পূর্ণরূপ কোনও কোনও মৌখিক ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়), এবং প্রাচীন সাহিত্যের রূপ 'রাখিঞা, রাখিয়া, রাখি,'—এইগুলিই হইতেছে আধুনিক মৌখিকরূপগুলির মূল; পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক কথিত রূপগুলির উদ্ভব হয় নাই, লোকে তখন 'রাখি' 'রাখিয়া' বা 'রাখিঞা' বলিত। **আধুনিক সাধুভাষার ক্রিয়া সর্ব্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত রূপসমূহ অপেক্ষা পূর্ণতর এবং উহাদের মূলস্থানীয়।** প্রাচীনকালে মৌখিক ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণঘটিত পার্থক্য তত বেশী ছিল না। এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ধারাটিকে অনেকটা অবিকৃত রাখিয়াই আধুনিক সাধুভাষার উদ্ভব। **প্রাচীন রূপটী বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে ও সর্ব্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধুভাষায় অপরিবর্ত্তিত আছে।** কেবল মাত্র গত একশত পঁচিশ বৎসরের কিছু অধিক হইল, সাধুভাষায় বা আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতিবাহুল্য ঘটিয়াছে।"

অলমতিবিস্তরেণ। আশা করি, অতঃপর সেই বেচারী গড়-উইলিয়ামের পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা ক্রিয়াপদগুলিকে মুখোস পরাইবার বা জাল করিবার বিষম অপরাধের চার্জ্জ হইতে বেকসুর খালাস পাইবেন।

এত প্রমাণপ্রয়োগের অবশ্য কিছুই দরকার ছিল না। এ যেন লণ্ঠন লইয়া সূর্য্যদেবকে দেখাইবার চেষ্টার মত হইয়াছে। তবে স্বয়ং রবি যখন বাম, তখন অগত্যা লণ্ঠনের শরণাপন্ন হইতে হইল। বাস্তবিক পক্ষে বাঙ্গালার সাধু ক্রিয়াপদের গঠন পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা কোন পণ্ডিতমণ্ডলীর রচনা নহে; ঐ সব পদে কোন কৃত্রিমতা নাই, ভাষার

স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের নিয়মেই ঐ সব রূপ আসিয়াছে—যেমন অন্য ভাষাতেও আসিয়াছে। যেমন,

করিতেছি = করিতে + আছি = I *am* doing ;

করিতেছিলাম = করিতে + আছিলাম = I *was* doing ;

করিয়াছিলাম = করিয়া + আছিলাম ; ইত্যাদি।

এই সবই ত স্বাভাবিক পদ। তবে এত বড় বড় পদ উচ্চারণে নানারূপ ধারণ করে, বিকৃত হয়, সংক্ষিপ্ত হয় ; যেমন,

করিতেছি = কর্‌তে আছি কিংবা কর্‌তেছি (বরিশাল অঞ্চলে) ; কোইত্তেছি (চট্টগ্রাম) ; কর্‌ছি (শ্রীহট্ট) ; কোর্‌ছি বা কোর্‌চি বা কোচ্ছি বা কোচ্চি (পশ্চিম বঙ্গে)। (তাছাড়া, পূর্ব্ববঙ্গের "ছ"-এর উচ্চারণ ইংরাজী "s"-এর মত, অর্থাৎ "কর্‌ছি" পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চারিত হয় "korsi"।)

করিতেছিলাম = কর্‌তে আছিলাম বা কর্‌তেছিলাম (বরিশাল) ; কোইত্তেছিলাম (চট্টগ্রাম) ; কোইত্তিলাম (খুলনা-সাতক্ষীরা) ; কোর্‌ছিলাম, লুম, লেম বা কোর্‌চিলাম, লুম, লেম (পশ্চিমবঙ্গে) ; ইত্যাদি।

করিয়াছিলাম = কর্‌ছিলাম (বরিশাল) ; কোইর্‌গিলাম (চট্টগ্রাম) ; কোরেছিলাম, লুম, লেম, বা কোরেচিলাম, লুম, লেম (পশ্চিমবঙ্গে) ; ইত্যাদি।

ভাষাতত্ত্বের ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের নানা নিয়মের দরুণ—Vocal Harmony, Epenthesis, Umlaut, Ablaut-এর ধাক্কায় এবং সংক্ষিপ্ত উচ্চারণের মৌখিক প্রয়োজনে সাধুভাষার মূলরূপ হইতে নানাবিধ মৌখিক বিকারের উৎপত্তি। লিখিত ভাষাতে এই সাধু মূলরূপই প্রচলিত থাকিলে ভাষা সর্ব্বজনবোধ্য হয়, কিন্তু এই মূলরূপ artificial নহে কৃত্রিম নহে, ইহা ভাষার বিকাশেরই স্বাভাবিক পরিণতি। এই শিষ্ট সাধু সুপ্রচলিত রূপ পরিত্যাগ করিয়া লিখিত ভাষাতে সৎসাহিত্যে নানা অঞ্চলের লেখকদের খেয়াল মত তাঁহাদের উচ্চারিত নানাবিধ মৌখিক রূপ আমদানী করিলে যে

কাণ্ডটি হইয়া দাঁড়ায়—সেটি একেবারেই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—তথায় কপিকুলের কিলকিলাধ্বনিতে কর্ণকুহর ক্লিষ্ট হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আমার নিজের কিলকিলাধ্বনি সংবরণ করিবারও এখন সময় আসিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আলোচনায় আহ্বান করিয়াছিলেন; সেই সুযোগ লইয়া পত্র লিখিবার ব্যপদেশে একখানি রচনাই লিখিয়া ফেলিয়াছি। ভয় হয় যে, বোধ হয় আপনার সৌজন্যের অপব্যবহারই আমি করিয়া ফেলিয়াছি। যদি করিয়া থাকি, তবে আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আমি অব্যবসায়ী; অঙ্কের মাষ্টারী করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে ওকালতী করি, মনের আনন্দে নানা ভাষার কিছু কিছু চর্চ্চাও করি, সেই পুরাতন জার্ম্মাণ প্রবচনটি আমার বড় ভাল লাগে তাই—Mit jeder neuerlernten Sprache gewinnt man eine neue Seele—প্রত্যেকটি নব-ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেন নব-প্রাণের সঞ্চার হয়; অবসরমত রাজনীতি-চর্চ্চাও যে না করি এমন নহে; তবে যে চর্চ্চাতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়া থাকি, তাহা হইল অনধিকারচর্চ্চা। তাহারই একটি নিদর্শন আপনার সহিত এই কয় দিন আমার পত্র-ব্যবহারে আপনি পাইলেন। আমার সামান্য প্রথম পত্রখানি ও প্রবন্ধটিকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনি যে এতটা সময় ব্যয় করিয়া এবং কষ্টস্বীকার করিয়া এতখানি আলোচনা উত্থাপন করিলেন, তাহাতে আমি নিজেকে সাতিশয় সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

আপনি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি

প্রণত

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

স্বাস্থ্যের এবং সময়ের অভাববশত আপনার সঙ্গে বাংলা বানান নিয়ে দীর্ঘ তর্কবিতর্ক আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আপনার হাতের অক্ষরেও আমি অনভ্যস্ত এ কারণেও পত্রযোগে এই আলোচনায় আমার স্বল্প অবকাশকে পীড়িত করতে আমি নিরস্ত হলুম। এখনো আপনার এবারকার সুদীর্ঘ পত্র পড়তে আমি সাহস করিনি, কোনো একসময়ে সুযোগ হলে পরে চেষ্টা করব। কিন্তু আমার পক্ষে এ নিয়ে উত্তরপ্রত্যুত্তর অনাবশ্যক, কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই বানান নির্দ্দেশের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। ইতি ২১ শ্রাবণ ১৩৪৪

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এইমাত্র আপনার ছোট্ট চিঠিখানা পাইলাম। বাস্তবিকই আমার হস্তাক্ষর একেবারেই দেবাক্ষর—আমার আগের চিঠিগুলি আপনি কষ্ট করিয়া পড়িলেন কেমন করিয়া তাহা ভাবিয়া আমিই আশ্চর্য্য হই। এবারকার চিঠিখানি—অথবা চিঠির অছিলায় দীর্ঘ রচনাখানি—হস্তাক্ষরে পড়িবার কষ্টস্বীকার করিবার আপনার দরকার নাই; আমি উহা "মাসিক বসুমতী"-তে ছাপিতে দিয়াছি, ছাপা হইবামাত্র আপনাকে এক কপি আমি পাঠাইয়া দিব, আপনি অবসর মত পড়িলেই আমি অনুগৃহীত হইব।

এবারকার চিঠিখানিতে কি আছে তাহার সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র আপনাকে লিখিতেছি। প্রথম, বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলীর কিছু বিস্তৃত আলোচনা; দ্বিতীয়, ইলেক্, "ভারি"-"ভাতি", "কি-কী", "কলিকাতা"-"কোল্‌কাতা" প্রসঙ্গ; এবং তৃতীয়, বাঙ্গালা সাধুভাষার ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত (যাহা দেখাইতে আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন)। এই সব বিষয়ে কিছু বিশদভাবে আলোচনা করাতেই পুঁথি বাড়িয়া গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বাণানের পরিবর্ত্তনগুলি বা বিকল্পগুলি সম্বন্ধে উত্তরপ্রত্যুত্তর এখন অনেকটা অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে আমারও মনে হয়; কারণ, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ হইতে ঘোষণা হইয়া গিয়াছে যে, প্রচলিত বাণান চলিবে পাঠ্য-পুস্তকে, এবং কমিটির পুস্তিকাতেও মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, উঁহাদের প্রস্তাবিত বাণান অবলম্বন করিবার জন্য কোন প্রকার পীড়াপীড়ি করা হইবে না। জোর করিয়া চালাইবার প্রস্তাব যখন আর নাই, তখন ত সে বিষয়ে বলিবার আর কিছু নাই—ধীরে ধীরে কালের ও ব্যবহারের সহজ গতিতে ভাষার যে রকম বিবর্ত্তন স্বাভাবিক তাহাই হইতে থাকুক—ইহাই ত আমি চাহিয়াছিলাম।

কিন্তু বাণানের বিষয় যাহাই হউক, বাঙ্গালা সাধুভাষার রূপ সম্বন্ধে আপনি যে ব্যাপকতর প্রশ্ন তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি এই চিঠিতে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা আপনি অবসর মত পড়িয়া যদি আপনার মতামত সংক্ষেপে জানাইতে পারেন, তবে সাতিশয় উপকৃত হইব। আপনি যে এই আলোচনায় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আশা করি আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

২রা ভাদ্র, ১৩৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আশা করি আমার পূর্ব্বের চিঠিখানি আপনি পাইয়াছেন। তদনুসারে আমি এতৎসঙ্গে "মাসিক বসুমতী"-তে প্রকাশিত আপনার সহিত আমার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান"-সম্বন্ধীয় সমুদায় পত্রালোচনাই পাঠাইলাম। শেষ চিঠিখানি আপনি অবসর মত পড়িয়া আপনার মতামত জানাইলে সাতিশয় আনন্দিত হইব।

শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বাঙ্গালা ভাষার রূপ লইয়া এই যে আলোচনা ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—বহু বিদ্যোৎসাহী বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তির নিকট হইতে এবিষয়ে আমি চিঠি পাইতেছি। তন্মধ্যে এই সেদিন মাত্র বন্ধুবর সুনীতি চাটুয্যে মহাশয়ের পূজনীয় পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া বাস্তবিকই উৎসাহিত বোধ করিতেছি। পত্র খানি হইতে দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করি :

"আমার সংবর্দ্ধনা জানিবেন। আপনার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই। আমার এই শেষজীবনে ৭৬ বৎসর বয়সে আর পরিচয়ের অপেক্ষাও নাই।...

"আমি সাহিত্যসেবী নহি, আজীবন সওদাগরী অফিসের কেরাণী, এখন পেন্‌সনের উপর নির্ভর। তথাপি আপনার পত্র দুইখানি পড়িয়া ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকিলেও পত্রের উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি; সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।...

"অসহায়া বঙ্গভাষার অঙ্গে যে সে ইচ্ছামত শল্য প্রবেশ করাইবে, অঙ্গচ্ছেদ করিবে, সে অত্যাচার দেখিয়া রক্ষা করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ আক্ষেপ ভিন্ন আর কি করিতে পারে? তবে সুধীগণ ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, শুনিলে আহ্লাদ হয়। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভাষা-জননীকে রক্ষা করুন, আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।"

তাই মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষার রূপের উপর অযথা হস্তক্ষেপের বিষয়ে এই যে আলোচনা আজ উত্থিত হইয়াছে, ইহা ভালই হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষাভাষী সুধীগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে পরিণামে ভাষার মঙ্গলই সাধিত হইবে।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার সাতাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। প্রার্থনা করি আপনি অচিরে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় হইয়া উঠুন।

গতবৎসর বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান লইয়া আপনার সহিত আমার পত্রালোচনার অব্যবহিত পরেই আপনার গুরুতর অসুখ হইয়া পড়ায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে দিন কাটাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর অমল হোম মহাশয়ের* নিকট আপনার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতাম; চিকিৎসা-প্রণালী বিষয়ে তাঁহার নিকট কিছু কিছু "Home"-truth-ও যোগাড় করিতাম; আপনার প্রিয় বায়োকেমিক ঔষধ Kali Phos-এর গল্পও তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। আবার এই দিন কয়েক হইল শুনিলাম যে কিছুদিন যাবৎ নাকি আপনি চক্ষুঃপীড়ায় একটু কষ্ট পাইতেছেন। ইহাতে একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। পত্রোত্তরে আপনার কুশল-বার্ত্তা জানিলে আনন্দিত হইব।

---

* "কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম।

এতৎসঙ্গে আমার লেখা কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ আপনার নিকট পাঠাইলাম। ঐগুলি কোন কোন সভায় পঠিত হইয়াছিল। শিক্ষাবিষয়ক আলোচনায় আপনার যথেষ্ট আগ্রহ আছে জানিয়াই এগুলি আপনাকে পাঠাইতে সাহসী হইলাম। যদি অবসরমত পাঠ করিতে পারেন ত সুখী হইব। প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি প্রাথমিক শিক্ষা, একটি মাধ্যমিক শিক্ষা, ও একটি উচ্চশিক্ষাবিষয়ক।

আমি এক প্রকার ভালই আছি। প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র)

ওঁ

কালিম্পং

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শিক্ষাসম্বন্ধে আপনার পুস্তিকাগুলি পড়ে দেখ্‌লুম, আলোচ্য বিষয় অনেক আছে। দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষাসম্বন্ধে আপনাদের মত স্বীকার করে নিলেও একথা নিশ্চিত জানি শিক্ষা দেবার লোকের অভাবে তাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না। মনের আলস্য এবং কর্ম্মীর অভাব থাকাতে, এবং অভ্যস্ত পথকেই শ্রেয়ের পথ বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করাতেই শিক্ষারীতির সুসম্পূর্ণ আদর্শ ব্যর্থ হয়ে যায়। মতের পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে মনঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইতি ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত]

(শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের মহাশয়ের পত্র)

শ্রীঃ ৩নং সুকিয়াস্ রো, কলিকাতা

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৪ সাল

মহাশয়,

আমার সংবর্দ্ধনা জানিবেন। আপনার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই। আমার এই শেষ জীবনে ৭৬ বৎসর বয়সে আর পরিচয়ের অপেক্ষাও নাই।

"বাণান-সংস্কার" সম্বন্ধে আপনার সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল, তাহা আষাঢ় মাসের "মাসিক বসুমতী"-তে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু ঐ পত্র তিনখানি পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে এই অবশ্যপাঠ্য পত্রগুলি পড়িবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। ধারাবাহিক কিছুই পড়িতে পারি না। আমি সাহিত্যসেবী নহি, আজীবন সওদাগরী অফিসের কেরাণী, এখন পেন্‌সনের

উপর নির্ভর। তথাপি আপনার পত্র দুইখানি পড়িয়া ব্যাকরণজ্ঞান না থাকিলেও পত্রের উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি, সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার পত্রের উত্তরে রবিবাবু—সরলভাবে নয়—কারে পড়িয়া স্বীকার করিয়াছেন—তিনি ভাল ব্যাকরণ জানেন না। তিনি কোথাও যেন লিখিয়াছিলেন:

"একটুখানি মোহ তবু মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারে জবাব দিয়ো নাকো।"

তিনি এই অজুহাতে অনুযোগের জবাব দেন না। কিন্তু আপনার পত্রের জবাব অন্যের স্কন্ধে কিছু ভর দিয়া কৌশলে দিয়া ফেলিয়াছেন। মিথ্যা বলিয়া, নিরুত্তর থাকেন নাই।

অসহায়া বঙ্গভাষার অঙ্গে, যে সে ইচ্ছামত শল্য প্রবেশ করাইবে, অঙ্গচ্ছেদ করিবে, সে অত্যাচার দেখিয়া রক্ষা করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ আক্ষেপ ভিন্ন আর কি করিতে পারে? তবে সুধীগণ ইহার বিরুদ্ধে লেখনী-ধারণ করিয়াছেন শুনিলে আহ্লাদ হয়। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভাষা-জননীকে রক্ষা করুন। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ। "আত্মকথা" নামে আমার একখানি পুস্তিকা আপনাকে অর্পণ করিতেছি; ইহাতে আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। অনুগ্রহ করিয়া অবসর মত পড়িয়া আমার স্বর্গীয়দের বিষয়ে আপনার অভিমত দেন এই আমার প্রার্থনা। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীহরিদাস

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা,

৫ই ভাদ্র, ১৩৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার আশীর্ব্বাদ-পত্রখানি পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রণাম জানিবেন।

আপনার উপহৃত "আত্মকথা" বইখানি আমি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি; এবং উহাতে আপনার পারিবারিক জীবনের নানা বিয়োগবেদনার মর্ম্মস্পর্শী বিবরণে বাস্তবিকই ব্যথিত হইয়াছি। ভরসা করি এতদিন কালক্ষেপের পর আপনার অন্তর-ব্যথার কতকটা উপশম হইয়াছে, এবং আপনি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অন্ততঃ চিত্ত স্থির করিতে পারিয়াছেন। আপনি আমার আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জানিবেন।

আপনার পুস্তিকাখানি পাঠে জানিতে পারিলাম, আপনি সুহৃদ্বর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পূজনীয় পিতৃদেব। এই সংবাদে আপনার উৎসাহবাক্য এবং আশীর্ব্বাণী আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছে। কারণ, বাঙ্গালা ভাষার বাণান-আলোচনা ব্যাপারে সুনীতি বাবু ও আমি একরূপ প্রতিপক্ষ। সুনীতি বাবু ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত বাণান-সমিতির অপরাপর সভ্যগণ, সম্ভবতঃ কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৃষ্টান্তে ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বাণান-সংস্কারের নামে বাঙ্গালা ভাষার রূপে সাতিশয় বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা আনিয়া ফেলিতেছেন; এবং এই অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় এবং অনাবশ্যক বাণান-বিভ্রাট ও বিকারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই আমার সামান্য যেটুকু শক্তি, তদনুযায়ী প্রয়াস করিতেছি।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত এবিষয়ে আমার যে পত্রালোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা যে আপনার ন্যায় প্রবীণ বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। আশা করা যায় যে, বঙ্গীয় সুধীগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে অবিমৃশ্যতামূলক এই সমস্ত দুশ্চেষ্টার প্রকোপ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে, এবং আমাদের ভাষা-জননী তাঁহার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে আপনার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিতে পারিবেন।

আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। পুনরায় আপনাকে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি। ইতি

প্রণত

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত]

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র)

কালীঘাট

২৫শে জুলাই, ১৯২৭

প্রিয়বরেষু,

বহুদিন আপনার সংবাদ অবগত নহি। কিছুদিন যাবৎ আপনার নিকট পত্র লিখিব ভাবিতেছিলাম। গত আষাঢ়ের "বসুমতী"-তে বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান সম্পর্কে আপনার ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পত্রসমূহ পাঠ করিয়া ঐ ইচ্ছা আরও প্রবল হইল, ফলে এই পত্র লিখিতেছি।

প্রথমে উক্ত পত্র সম্পর্কে দু'এক কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। ব্যাকরণে আমার অধিকার নাই, তবে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা ভাষার অল্পবিস্তর চর্চ্চা করিতে হইয়াছে এবং উহার প্রতি কিঞ্চিৎ মমত্ববোধেরও দাবী করি, তাই দু'এক কথা বলিতে সাহসী হইলাম।

আপনার সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আলোচনাতেও বুঝিয়াছি এবং উক্ত পত্র হইতেও প্রতীতি হইল যে, ভাষার বা বাণানের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আপনি হঠকারিতার বিরোধী। এবিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। পত্র তিনখানার মর্ম্ম যেরূপ বুঝিয়াছি জানাইতেছি।

আপনার পত্র হইতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাংলা বানানের নিয়ম"-এর ভূমিকা হইতেও দেখিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বাণান-সংস্কারের প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ। কবিগুরুর পত্রে এবং উল্লিখিত ভূমিকায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বক্তব্য এই যে প্রাকৃত বাঙ্গালায় বাণানের স্বেচ্ছাচার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ উচ্চারণে স্বেচ্ছাচার। শব্দের উচ্চারণ বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বভাবের নিয়মে এই পার্থক্য বাড়িয়া যাইবেই। ইহা নিয়ন্ত্রণের উপায় নাই, অথচ উচ্চারণের সহিত বাণানের মিল থাকার প্রয়োজন। ফলে বাণানের উচ্ছৃঙ্খলতাও ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা নিয়ন্ত্রণের দরকার। আবার, অনেক স্থলে আমরা উচ্চারণের বৈষম্য মানি না, অথচ তিন "স" দুই "ন্ন" প্রভৃতি দ্বারা এবং অক্ষরের দ্বিত্ব প্রভৃতি দ্বারা ঐ বৈষম্যের ঠাট বজায় রাখিবার ভাণ করি, সুতরাং দ্বিত্ববর্জ্জন প্রভৃতি দ্বারাও বাণান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। ইহার ফলে অনেক অনাবশ্যক অক্ষর ও চিহ্ন বাদ যায় এবং ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হয়। এ সকল বিষয়ে নিয়ম প্রবর্ত্তনের জোর খাটাইতে পারেন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, সমস্যাও কঠিন, সুতরাং আবেদন করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটই করিতে হয়।

অন্যপক্ষে, উচ্চারণ ও বাণানের মধ্যে অনৈক্যকে আপনি অত বড় করিয়া দেখিতে চান না। যেটুকু অনৈক্য আছে বা হইতে পারে, ভাষার উপর তাহার কুফল যতটা, আপাত-সুবিধাবাদমূলক নিয়ম প্রবর্ত্তন দ্বারা উহা দূর করিবার প্রচেষ্টার কুফল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী, ইহাই

আপনার মত বলিয়া বুঝিলাম। অনুরূপ কারণে অক্ষরের প্রাচুর্য্য দূর করাও আপনার মতে অবিধেয় বলিয়া বুঝিলাম।

আপনি বলিয়াছেন, স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল উচ্চারণকে বাণান সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিবে অথচ নিজে সংযত থাকিবে, এরূপ নিয়মের নিগড় আবিষ্কার করা চলে না, বড় জোর উভয়ের মধ্যে একটা রফা হইতে পারে। রফা করিতে হইলেই আমাদের প্রধান অবলম্বন হইবে ব্যাকরণসম্মত সাধু ভাষা, কারণ বিভিন্ন dialectical form-এর সম্মানিত সমন্বয়ক্ষেত্র উহাই এবং উহাকে ভিত্তি করিয়াই ঐ সকল বিভিন্ন form-এর উদ্ভব হইয়াছে। আপনার মতে এই রফার প্রধান সর্ত্ত হইবে এই যে, উচ্চারণ বাণানকে উহার চেহারা বদলাইবার জন্য পীড়িত করিবে না এবং বাণান ব্যাকরণসম্মত নিজের আকার বজায় রাখিয়াই ইঙ্গিত বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা উচ্চারণের সহযোগিতা করিবে। কারণ,

(১) অনেক স্থলেই context হইতে প্রকৃত উচ্চারণ বুঝা যায়, সুতরাং বাণানের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না।

(২) বাণানকে উচ্চারণের সঙ্গে অত দ্রুত বদলাইতে দিলে ভাষার মধ্যে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হইবে, কারণ তাহা হইলে "ক্যাবোল ভাবি কাওোডা হইলে ক্যামোন ?" এইরূপ ভাষা বাড়িয়া চলিবে। ফলে, উচ্চারণের অনুযায়ী বাণানের mania একবার পাইয়া বসিলে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে।

(৩) বর্ণমালার ধ্বনিবিকারের উদাহরণ যে শুধু বাঙ্গালাতে আছে এমন নহে, সমস্ত জীবন্ত ভাষাতেই আছে। কিন্তু সে জন্য ইংরাজীতে action-এর পরিবর্ত্তে aktion, civilization-এর পরিবর্ত্তে sivilization প্রভৃতি বাণান প্রচলনের প্রয়োজন হয় নাই।

(৪) বাঙ্গালা ভাষার শব্দের রূপ ও ধ্বনিতে এপর্য্যন্ত মারাত্মক প্রভেদ দাঁড়ায় নাই, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে সংস্কৃত বর্ণমালা ও ব্যাকরণের উপরই বাঙ্গালা ভাষা এপর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে।

(৫) সাধু বাঙ্গালাই বঙ্গভাষাভাষীদের প্রাকৃত বুলির মধ্যে একটা সাধারণ form রক্ষা করিয়া চলিয়াছে; সুতরাং ইহাকে না মানিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলে স্বেচ্ছাচার আরও বাড়িয়া যাইবে।

(৬) অক্ষর-বর্জ্জন সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ "ই" এবং "ও" বর্জ্জনের পক্ষপাতী, কিন্তু উহাদের বর্জ্জন করিলে লিখিতে হয় "ভাতি বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য এবং ডালি উহার প্রধান উপকরণ তবে তাহারা মাছো খায়, তরকারিো খায়, দুধো খায়", ইত্যাদি। এ সকল চলিতে পারে না।

(৭) বাঙ্গালায় অক্ষর-সংখ্যার অথবা আ-কার, ই-কার, য-ফলা ম-ফলা প্রভৃতির প্রাচুর্য্য যাঁহারা বাহুল্য মনে করেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই প্রাচুর্য্যের জন্যই বাঙ্গালা শব্দের বাণানের সহিত উচ্চারণের এতটা সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব হইয়াছে; অন্য পক্ষে ইংরাজীতে পাঠ আরম্ভ করিতে যাইয়াই শিক্ষার্থীকে but ও put-এর উচ্চারণ-বৈষম্যে ধাঁধাঁয় পড়িতে হয়। বাঙ্গালাতে সেরূপ আশঙ্কা নাই, অন্ততঃ বহু পরিমাণে কম।

(৮) উচ্চারণে জোর দিবার জন্য "কি"-কে "কী" লেখারও প্রয়োজন নাই; কারণ তাহা হইলে এবং "ই" প্রভৃতি বর্জ্জন করিলে লিখিতে হয়, "ভাতী বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য"; ইত্যাদি।

(৯) ভাষার রূপের চরম প্রামাণ্য হইতেছে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা। প্রচলনের খাতিরে অনেক অশুদ্ধ রূপও ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। উহাদিগকে সরাইবার উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই। নূতন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের ফলে আরও নূতন নূতন রূপ প্রচলিত হইয়া বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হইবে।

(১০) সুপ্রতিষ্ঠিত বাণানের পরিবর্ত্তন অবাঞ্ছনীয়, ইহা কবিগুরুও স্বীকার করিয়াছেন সুতরাং উহা ব্যাকরণসম্মত হইলে পরিবর্ত্তন আরও অবাঞ্ছনীয় হয় ইহা স্বীকার্য্য। (সংস্কৃত শব্দের বাণানে হস্তক্ষেপ অবিধেয় ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বীকার করিয়াছেন।)

তর্কের মূল কথাগুলি যেরূপ বুঝিয়াছি লিখিলাম। পত্রের ভাষা স্পষ্ট সুতরাং আশা করি ভুল করি নাই। আপনি কবিগুরুর যুক্তিখণ্ডনে সাহসী হইয়াছেন এবং দু'একটি ভুলের উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ইহাতে আপনার সৎসাহসের পরিচয় পাই। অন্য পক্ষে কবিগুরু ক্ষেত্রবিশেষে ভুল স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, বরং তাহা প্রকাশেরই অনুমতি দিয়াছেন, জনসাধারণ ইহাকে অবশ্য তাঁহার মহত্ত্ব ও সত্যনিষ্ঠার উদাহরণস্বরূপই গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনার সহিত আমি একমত। আপনার যুক্তিগুলি মানিয়া লইতেছি এই জন্য যে উহারা ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষার অনুকূল ইহা আমারও দৃঢ় বিশ্বাস। আশা করি অনেককেই আপনার মতাবলম্বী পাইবেন।

একথা সত্য যে জীবন্তভাষা ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবেই, তবে যথাসম্ভব তাহাকে স্বভাবের নিয়মে আপন পথ খুঁজিয়া অগ্রসর হইতে দেওয়াই সঙ্গত। কারণ, পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম একথা যেমন ঠিক, জগতের একটা খাঁটি মূর্ত্তি রহিয়াছে যাহা পরিবর্ত্তনসহ নহে, ইহাও সেইরূপ সত্য। পরিবর্ত্তন মাত্রই কারণ খোঁজে এবং একান্ত আকস্মিক পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়ম নহে। এ সকল কথা আপনার ভালরূপেই জানা আছে। বর্ত্তমান বাণান-সমস্যায় এই উপলব্ধিটার প্রয়োগে অন্ততঃ একজনকে উৎসুক দেখিয়া সুখী হইয়াছি। মানুষের গড়া নিয়মও স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলেই মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। সামান্য কারণে বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে গেলে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। প্রতিমাকে আরও সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই অলঙ্কার পরানো, উহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য নহে। অলঙ্কারের ভারে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া না যায়, সে বিষয়েও আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণের

সাধনার ফলে বঙ্গভাষা একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে—যাহা বিশ্বের দরবারে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সাজাইবার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় উহাকে আমাদের ভাঙ্গিবার অধিকার নাই, একথাটা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার জন্য আপনি ধন্যবাদার্হ। বাস্তবিক আশঙ্কা হয় আপাতসুবিধামূলক নিয়ম প্রবর্ত্তনের ফলে গতিটা হইবে ভাঙ্গিবার দিকেই।

কবিগুরু নিজের হাতে গড়া জিনিষ নষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে রুগ্ন শিশুকে তাড়াতাড়ি সুস্থ ও সবল করিতে গিয়া বুদ্ধিমতী মাতাও অনেক সময় হাতুড়ে চিকিৎসার শরণাপন্ন হন। মাতার স্নেহাতিশয্যই অনেক ক্ষেত্রে কাল হইয়া থাকে। আমার বাল্যকালের একটা ঘটনা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইত। কাকা কর্ত্তা, তিনি নিজের হাতে প্রতিমাকে তৈল মাখাইতেন—উদ্দেশ্য উহাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা। সরস্বতীর শাদা মুখে নাকি তৈল মাখাইতে নাই, তাহাতে মুখ কালো হইয়া যায়—কেবল চোখ দু'টাতে তৈল মাখাইয়া চক্‌চকে করিতে হয়। সরস্বতীর বাঁ চোখে তৈল মাখাইতে যাইয়া অনবধান-বশতঃ খুড়া মহাশয় উহার আশে-পাশেও মাখাইয়া ফেলিলেন। ফলে, ঐ সকল অংশ কালো হইবার আশঙ্কা করিয়া, সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, তাঁহাকে ডানচোখের আশে-পাশেও মাখাইতে হইল। কিন্তু সেদিকেও মাত্রা ছাড়াইয়া গেল, সুতরাং আবার বাঁ দিকে ঝুঁকিলেন। এইরূপে সমস্ত মুখটাই কালো করিয়া ফেলিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই analogy খাটে কিনা জানি না; না খাটিলেই মঙ্গল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা এবং সম্ভবতঃ প্রবলতর আশঙ্কার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। কেবল কাব্যে উপন্যাসে নহে, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বর্ত্তমান যুগের বঙ্গভাষা সম্পূর্ণরূপে ভাব প্রকাশের দাবী করিতে পারে। যাঁহারা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের এবং তৎপরবর্ত্তী লেখকগণের

বিজ্ঞান ও দর্শনসম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের কাঠামো গড়িয়া গিয়াছেন রামেন্দ্রসুন্দরই। বর্ত্তমানে প্রয়োজন, কেবল সুনির্ব্বাচিত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অবতারণা। ঐ কাঠামোকে ভিত্তি করিয়াই এবং সাঙ্কেতিক চিহ্নের জন্য একটি মাত্র ইংরাজী অক্ষরও ব্যবহার না করিয়া, বিজ্ঞানে, মায় formula শুদ্ধ এম্-এ ক্লাসের উপযোগী সুন্দর ও সরল পাঠ্য-পুস্তকসমূহ রচিত হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু আশঙ্কা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকে ইংরাজী অক্ষর, সাঙ্কেতিক চিহ্ন, ও অঙ্ক প্রবর্ত্তনের নিয়ম করিয়া text-book-এর ভাষাকে জনসাধারণের ভাষা হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিতেছেন এবং এমন একটা ভাষার সৃষ্টি করিতেছেন যাহাকে না বলা যায় বাঙ্গালা, না বলা যায় ইংরাজী। উক্ত নিয়মসমূহ চলিতে থাকিলে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হইবে, বিজ্ঞানের ভাষার প্রচলিত সৌম্যমূর্ত্তি নষ্ট হইয়া উহা মিশ্র-ভাষায় পরিণত হইবে, গণিত-শিক্ষা ইংরাজী প্রণালীতেই সম্পন্ন হইতে থাকিবে। কারণ বীজ-গণিতে ও পাটীগণিতে যা' কিছু কারবার তাহা কতগুলি সংখ্যা ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন লইয়া। জ্যামিতিতেও সাঙ্কেতিক চিহ্নেরই প্রাধান্য। সুতরাং উহা-দিগকে 1, 2, 3 এবং A, B, C প্রভৃতি আকারে উপস্থিত করার অর্থ গণিতে ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া—বঙ্গভাষাকে নহে। এই সহজ কথাটা নিয়মপ্রণেতারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁহারা এই সকল কৃত্রিম নিয়ম কখনই অনুমোদন করিতে পারেন না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্গভাষাকে আরও সজীব ও প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার জন্য হাতে এখনও যথেষ্ট কাজ রহিয়াছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার দৈন্য রহিয়াই যাইতেছে। ইহা দূর করিতে হইলে প্রয়োজন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অর্জ্জিত জ্ঞান প্রচলিত বঙ্গভাষার সাহায্যেই

প্রকাশ করা ; নতুবা স্কুল ও কলেজের বাহিরে তাঁহাদের রচিত পুস্তকের পাঠক জুটিবে না, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে প্রীতির বন্ধনও স্থাপিত হইবে না। হিত্ববর্জ্জনে বা বাঙ্গালাভাষায় কতকগুলি ইংরাজী অক্ষরের প্রবর্ত্তনে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অনাবশ্যক বোধে সিদ্ধিদাতার শুণ্ড কাটিয়া ফেলা অথবা অত্যাবশ্যক বোধে টাকের উপর চুল বসাইয়া দেওয়া সহজ কাজ কিন্তু উহাতে মূর্ত্তি সজীব হইয়া ওঠে না। প্রাণপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন কাজ, এবং সাধনা-সাপেক্ষ। আপনি ভুক্তভোগী, সুতরাং অধিক লেখা বাহুল্য ; তবে এদিককার বিশৃঙ্খলার প্রতিও কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইবেন, অনুরোধ করিতেছি। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠিখানি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম ; অতোধিক আনন্দিত হইলাম বাঙ্গালা ভাষার ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখিবার জন্য আমার এই সামান্য চেষ্টা আপনার ন্যায় চিন্তাশীল লেখকের সমর্থনলাভ করিয়াছে দেখিয়া। বাস্তবিকই, এবিষয়ে আপনার এবং আরও অনেকের সমর্থনে আমি খুবই উৎসাহিত বোধ করিতেছি। সত্যই আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে বাঙ্গালার শিক্ষিত সাধারণের জনমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত। জনমত যদি জাগরিত হয়, তাহা হইলেই অবিমৃশ্যকারিতা এবং হঠকারিতা-প্রসূত এই সব প্রচেষ্টা দমিত হইয়া প্রকৃত সংস্কারের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

গণিত-পুস্তকে ইংরাজী অক্ষর ও চিহ্ন ব্যবহারের বিসদৃশতার কথা আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে সেবিষয়ে পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটন করাইতে আমায় কতখানি খাটিতে হইয়াছিল, তাহার কথা সংক্ষেপে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম। তবুও বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা-কমিটির কর্ত্তাদের একগুঁয়েমির ফলে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হই নাই, বিকল্পে বাঙ্গালা অক্ষর ও চিহ্নাদির ব্যবহারে সম্মত করাইতে পারিয়াছি মাত্র ; অর্থাৎ দুই-ই চলিবে—1 টাকা 5 আনা 6 পাইও চলিবে এবং টাকা ১।/৬ পাইও চলিবে ; ত্রিভুজ A B C-ও চলিবে এবং ত্রিভুজ ক খ গ-ও চলিবে। যাহা হউক, যথালাভ—সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

আসল কথা আমার মনে হয় কি জানেন ? সংস্কারের নামে যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা আজকাল হইতেছে, ইহার পশ্চাতে কোন গভীর চিন্তা, কোন দায়িত্বজ্ঞান, ভাষার অতীত কিংবা ভবিষ্যতের প্রতি কোন মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে বলিয়া গিয়াছিলেন "একটা নতুন কিছু করো"—সেই craze যেন এই সব "সংস্কারক"-দিগকে পাইয়া বসিয়াছে— যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে—এবং কবি শেক্‌স্‌পীয়রের ভাষায়, "dressed in brief little authority" হইয়া শুধু "জোরের জোরে" তাহা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমার ত ইহাই diagnosis—জানি না, এবিষয়ে আপনার কি ধারণা। আশা করি কুশলে আছেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

[রায় বাহাদুর ৺যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সহিত]

(৺যতীন্দ্রমোহন সিংহের পত্র)

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম

ফরিদপুর
২৩।৭।৩৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

নমস্কারপূর্ব্বক বিনীত নিবেদন—

মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, বাণান-সমস্যা ও সাধুভাষাসম্বন্ধে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা "মাসিক বসুমতী"-তে পাঠ করিয়া, "বসুমতী"-র সম্পাদক সতীশ বাবুর নিকট হইতে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। ইতিপূর্ব্বে আপনি রাঁচির সাহিত্য-সম্মিলনীতে ও চন্দননগর বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীতে যে সকল প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাহারও কিছু কিছু সংবাদ খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে সকল প্রবন্ধ পাঠ করা হয় নাই।

আমিও দীর্ঘকাল যাবৎ এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম, সুতরাং এ সকল বিষয়ে যিনি লেখেন তাহা পড়িবার কৌতূহল আমার যথেষ্ট আছে। আর প্রথমেই আপনাকে বলিয়া রাখি, আমিও এসকল বিষয়ে আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমতাবলম্বী। বোধ হয় ২০ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত পি. এন. চৌধুরী "সবুজ পত্র" বাহির করিয়া যখন কলিকাতার কথ্য ভাষা সাহিত্যে চালাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করি। আমার সেই সকল প্রবন্ধ "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। পরে ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত "ভারতী"-তেও যখন সেই চলতি ভাষা সাহিত্য-সম্রাটের হুকুম বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হয়, তখন আমি তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। যখন উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদ ঘোরতর হইয়া উঠিল, তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটা "রফা" করিবার অভিপ্রায়ে একটা প্রবন্ধ লেখেন, তাহা উক্ত "ভারতী"-তে বাহির হয়। আমি তাঁহার সেই "রায়"-এর সমালোচনা করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখি। তাহা আমার "তোড়া" পুস্তকে "একটা মোকদ্দমার রায়"-নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন। আমি আমার দুইখানা ক্ষুদ্র পুস্তক "তোড়া" ও "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" আপনাকে উপহারস্বরূপ পাঠাইলাম; অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন রবীন্দ্রনাথ শব্দের উচ্চারণানুসারে বাণান চালাইবার অভিপ্রায়ে প্রথম "বাঙ্গালা"-কে "বাংলা" আকার প্রদান করেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ঢাকার মনীষী ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নবপর্য্যায়ের "বান্ধব পত্রিকা"-তে ছাপিতে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি অতি আদরের সহিত আমার সেই প্রবন্ধটিকে তাঁহার পত্রিকার প্রথম স্থানে ছাপিয়াছিলেন। সেই অবধি আমি সাহিত্য-সম্রাটের এই হুকুমের বিদ্রোহাচরণ করিয়া আসিতেছি। আপনার চিঠিগুলি পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আপনি এবিষয়েও আমার একমতাবলম্বী।

কথ্য ভাষা যে লিখিত ভাষার অনুরূপ হইতে পারে না, হওয়া যুক্তিসঙ্গতও নহে, এ কথা আপনি অনেক ভাষার নজির তুলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমার বিদ্যা অতি সামান্য, তবে সহজ জ্ঞান হইতে আমি আমার মত প্রতিপন্ন করিয়াছি।

সাধুভাষার "করিতে, করিতেছিলাম, করিয়াছি," ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যে ফোর্ট উইলিয়ামের গোরাদিগের পণ্ডিতগণ কর্তৃক সৃষ্ট নহে, প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, ইহা আপনি অনেকানেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। বহু-আকারবিশিষ্ট কলিকাতা অঞ্চলের "করলুম", "খেলুম", ইত্যাদি কথ্য ভাষা সাহিত্যে চালাইতে যাইয়া এখন নানা বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই বিশৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণান-কমিটির সৃষ্টি। কিন্তু কর্তাদের আগেই বুঝা উচিত ছিল, "If you sow the wind, you will reap the whirlwind."

সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে যে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানা আবশ্যক, এ কথা অনেক বড় বড় লেখকই স্বীকার করেন না। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের এদিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার পাঠাগারে তিনি যেখানে বসিতেন, তাহার চারিপাশে নানাপ্রকার ব্যাকরণ সজ্জিত থাকিত। তিনি যেন ব্যাকরণের সিংহাসনে বসিয়া থাকিতেন। তিনি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন, অনেক বড় লেখক 'গাহ্' ধাতুর অর্থ জানেন না। তাঁহারা লেখেন 'গাহ রে তাঁহার নাম'। কিন্তু 'গাহ্' ধাতুর অর্থ অবগাহন করা, আর 'গৈ' ধাতুর অর্থ গান করা। 'গাও রে তাঁহার নাম,' ইহাই শুদ্ধ প্রয়োগ।" "চলন্তিকা" অভিধানে দেখিলাম বড় লেখকদের খাতিরে, "গাহ্" শব্দের অর্থেও "গান করা" লেখা হইয়াছে।

আর একটা শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আপনাকে জানাইতেছি, সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ আছে। "উপলক্ষ" শুদ্ধ, না "উপলক্ষ্য" শুদ্ধ? রবীন্দ্রনাথ "উপলক্ষ্য" লেখেন।

"সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" পুস্তকখানি বাহির হইলে আমাকে চারিদিক্ হইতে অনেক আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল—এমন কি কেহ কেহ আমার নাম দিয়াছিলেন, "Sanitary Inspector of Bengali Literature"। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সাহিত্য-সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকলেই আমার মতাবলম্বী হইয়া অতি-আধুনিক সাহিত্যের নিন্দা করিতেছেন। আপনি এ বিষয়ে কি লিখিয়াছেন, যদি ছাপা হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইবেন।

আমার শরীর অসুস্থ। আজ এই পর্য্যন্ত। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। ইতি

বিনীত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

পুঃ। "সম্মিলনী" হইবে, না "সম্মেলনী" হইবে?

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রখানি এবং আপনার উপহৃত বই দুইখানি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন। আপনার ন্যায় প্রবীণ, সাহিত্যসেবী এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও ঔপন্যাসিকের নিকট হইতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাণানের বিশুদ্ধিরক্ষা সম্বন্ধে আমার এই যৎসামান্য প্রচেষ্টা যে এতটা সমাদর এবং সহানুভূতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমি বাস্তবিকই উৎসাহ অনুভব করিতেছি।

আপনি যে এই সমস্ত বিষয়ে এবং সাহিত্যের শালীনতা রক্ষাকল্পে বহুকাল ধরিয়া অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমার মোটেই অজানা নাই—তথাপি আপনি যখন স্নেহভরে আপনার বই দুইখানি আমাকে উপহার দিয়াছেন তখন আমি পুনরায় ভাল করিয়া উহা পড়িব। ছেলেবেলায় পঠদ্দশায় আপনার "উড়িষ্যার চিত্র" দেখিয়াছি এবং উপভোগ করিয়াছি, আপনার "ধ্রুবতারা"-র জ্যোতির্ম্ময়ী দ্যুতিতে চমৎকৃত হইয়াছি, আপনার "অনুপমা"-র চরিত্রচিত্রণ আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার দানের পরিমাণ কতটা, সে সম্বন্ধে—আধুনিক তরুণ-মহলে জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাব থাকিলেও—আমার অতি সুস্পষ্ট জ্ঞানই রহিয়াছে। আপনি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

দুই একটি বাঙ্গালা শব্দের বাণান সম্বন্ধে আপনি যে জানিতে চাহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে লিখিতেছি।

"উপলক্ষ", "উপলক্ষ্য": প্রকৃতিবাদ অভিধান এবং Monier-Williams-এর সংস্কৃত অভিধানে দুইটি রূপই আছে। Monier-Williams-এ একটু অর্থভেদ করা হইয়াছে, যেমন, "উপলক্ষ"—distinction, distinguishing; "উপলক্ষ্য"—to be implied or understood by implication, inferable (ভাগবতপুরাণে "উপলক্ষ্য" পদ পাওয়া যায়)। প্রকৃতিবাদে দুইরূপই একস্থলে লিখিয়া বুৎপত্তি করা হইয়াছে—"উপ" সমীপে "লক্ষ্য" দ্রষ্টব্য বা উদ্দেশ্য—অবলম্বন, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য। প্রকৃতিবাদে যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, "উপলক্ষ্য"-ই ভাল বাণান; তবে উপ+লক্ষ্‌+অ প্রত্যয় করিয়া "উপলক্ষ" পদ সাধিত হইবার কোন বাধা নাই। প্রয়োগ দেখিতে গেলে বোধ হয় সংস্কৃতে "উপলক্ষ্য"-এরই বেশী প্রয়োগ, এবং বাঙ্গালাতে "উপলক্ষ"-এর বেশী প্রয়োগ।

"মেলন", "মিলন": প্রকৃতিবাদে "সম্মিলন" পদটি শুধু আছে। শব্দকল্পদ্রুমে "মিলন" রূপটি শুধু আছে—উদাহরণস্বরূপ জয়দেব হইতে উদ্ধৃত

হইয়াছে "তেন কালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্"। Monier-Williams-এ দুই রূপই দেওয়া আছে, একই অর্থ ; তবে "মিলন" পদটি অমরকোষে পাওয়া যায়। সুতরাং উভয়বিধ পদই যে সংস্কৃতে পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহ ; বাঙ্গালাতে "মিলন" "সম্মিলন" এই সব পদই চল্‌তি ; শুধু সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া "সম্মেলন"-এর ছাড়াছাড়ি হইতেছে। তবে ব্যাকরণের একটু খট্‌কা আছে। অনট্ প্রত্যয়যোগে আদ্য লঘু স্বরের গুণ হইয়া—মিল্ + অনট্—"মেলন" হইবার কথা, এবং হয়ও ; কিন্তু "মিলন" হইল কিরূপে? এ বিষয়ে সুপদ্মব্যাকরণে একটি সূত্র আছে, "কুটাদিত্বমিষ্যতে" অর্থাৎ মিল্ লিখ্ ধাতুতে কুটাদি ধাতুর ন্যায় হইবে, অর্থাৎ গুণ হইবে না। এই মতানুসারে কিন্তু শুধু যে "মিলন" "লিখন" হয় তাহা নহে, "মেলন" "লেখন" হয় না ; কিন্তু পাণিনিতে একস্থলে আছে "শকুনিষু আলেখনে", সুতরাং পাণিনিমতে "লেখন" পদ সিদ্ধ ; তদ্রূপ "মেলন" পদও সিদ্ধ। কাজেই মোট দাঁড়াইল এই যে, "মিলন" "মেলন" উভয় পদই ব্যাকরণসিদ্ধ, এবং প্রয়োগসিদ্ধ ত বটেই।

আমার লেখার বিষয় আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। আমার রাঁচির বক্তৃতাটি সংক্ষিপ্ত আকারে ফাল্গুনের "মাসিক বসুমতী"-তে প্রকাশিত হইয়াছিল ; চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীতে এবং বাগেরহাটে অধ্যাপক-সঙ্ঘের অধিবেশনে আমি মুখে বলিয়াছিলাম, লিখিত বক্তৃতা দিই নাই। আমি আপনাকে রাঁচির বক্তৃতার একখানি reprint-copy এবং মৎপ্রণীত "হিন্দু কোন্ পথে?" নামক পুস্তকখানি পাঠাইতেছি। "বাঙ্গালা বাণান"-বিষয়ক আমার প্রবন্ধ জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী"-তে প্রকাশিত হইয়াছে।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

প্রণত

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(৺যতীন্দ্রমোহন সিংহের পত্র)

শ্রীশ্রীদুর্গা বাউষখালী
শরণম্ জিলা ফরিদপুর
১৯শে আশ্বিন, ১৩৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার আন্তরিক স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম। আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়, সে জন্য আমাকে প্রণাম করিতে পারেন। কিন্তু "গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু, ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ"—সে জন্য আপনিও আমার নমস্য। আপনি এক জন বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত, ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেজন্য আপনি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। আপনি বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্রাটের খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য আপনি আপনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যে সাধুভাষার পরিবর্ত্তে কলিকাতার কথোপকথনের ভাষার প্রবর্ত্তন এবং উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাস, এই দুইটি অনাচারের বিরুদ্ধে আপনি যে যুদ্ধযাত্রা (campaign) আরম্ভ করিয়াছেন, আমি প্রার্থনা করি, আপনার সেই campaign জয়যুক্ত হউক। আশা করি, অনেক সাহিত্যিকই আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া আপনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন।

আপনি আমার কয়েকখানি বই পড়িয়া আমার সামান্য সাহিত্য-সেবার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাহার যোগ্য নহি। আমি এক জন old-fashioned ("সেকেলে") লেখক, বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজে এখন একরূপ অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছি, তবুও আপনি আমাকে মনে রাখিয়াছেন জানিয়া আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমার "তোড়া" পুস্তকে "সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা" লেখাটি আর একবার পড়িয়া দেখিবেন, অনুরোধ করি ; কারণ উহাতে সাহিত্য-সম্রাটের নিজের অনেক স্বীকারোক্তি দেখিতে পাইবেন।

আশা করি, আপনি কুশলে আছেন। আমার শরীর সুস্থ নহে, blood pressure-এ সময় সময় কাতর হইয়া পড়ি। ইতি

অনুরক্ত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

———

[শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত]

(শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পত্র)

শ্রীহরি

আজিমগঞ্জ
জিলা মুর্শিদাবাদ
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই ; কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না বলিয়া এই পত্র লিখিতেছি ; ইহা বর্ত্তমান সভ্যতা-বিরুদ্ধ জানিয়াও লিখিলাম—ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ব্যাবহারিক পত্র, তাছাড়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি, কাজেই মানসিক চাঞ্চল্যও উপস্থিত হইয়াছে ; একারণে হয়ত শিষ্টাচার রক্ষিত হইবেনা, মার্জ্জনা করিবেন।

কোন দুর্ব্বল পঙ্গু মাতৃভক্ত ব্যক্তি মাতাকে উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতাদের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে দেখিলে যেমন কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া অন্তরে ভীষণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে, বঙ্গভাষার উপর অত্যাচার দেখিয়া

আমারও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে বঙ্গভাষা বুঝি আর রক্ষা পায়না, যত শিক্ষিতাভিমানী কুশিক্ষিত মায়ের সন্তানগণ মায়ের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত না করিয়া ছাড়িবেনা। কিন্তু গত আষাঢ় মাসের "বসুমতী"-তে রবিবাবুর সহিত আপনার পত্রালাপের বিষয় পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, এবং আশান্বিতও হইয়াছি যে অপর এক শক্তিশালী ভ্রাতা যখন মাতাকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তখন মাতা রক্ষা পাইবেনই।

খুব সম্ভব আপনি আমার চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ। কেবল মাত্র বয়সের দাবীতে আপনাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন আপনি সুস্থদেহে পরমশান্তিতে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মায়ের সেবায় আপনার জীবনের অধিকাংশ নিয়োগ করিতে পারেন।

বাঙ্গালা ভাষা বিশেষতঃ বাণান সম্বন্ধে আপনার যে পত্রগুলি "বসুমতী"-তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর আমার আর বলিবার কিছু নাই। তবে গত আষাঢ় মাসের "শনিবারের চিঠি"-র ৪২৩ ও ৪২৪ পৃষ্ঠায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।* উহাতে রবিবাবুর বাণান ও উচ্চারণ সম্বন্ধে যে

---

* "রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে নিজের লেখার প্রুফ সংশোধনকালে বাংলা বানানের অরাজকতায় উত্তেজিত হইয়া নানা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন। আষাঢ়ের 'প্রবাসী'-তে 'বানান-বিধি' নামক প্রবন্ধে তিনি এই ধরণের একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

'আপাতত জানিয়ে রাখছি কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আমি উচ্চারণ অনুগত করে ক্যোনো, কখনো, যখনি, তখনি লিখব।'

এই প্রবন্ধে তিনি উচ্চারণ-গত বানানের পক্ষে ভীষণভাবে ওকালতী করিয়াছেন, এবং এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিবার জন্য বাংলার 'সাধারণ মেয়েদের' শরণাপন্ন হইয়াছেন। উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বাংলা বানান হয় না বলিয়া বাংলা 'সাধুভাষা'-কে তিনি 'dishonest' বলিয়াছেন। কিন্তু নিজের প্রবন্ধটি তিনি 'অসাধু ভাষা'-য় লিখিয়াও 'honesty' দেখাইতে পারেন নাই—উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সামঞ্জস্য নাই। যেমন,

আলোচনা হইয়াছে, আমি তাহাতে সায় দিয়া আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, কবিবর তাঁহার নিজেরই লিখিত কোন অংশ honesty রক্ষা করিয়া কিরূপে আবৃত্তি করেন এবং উচ্চারণ অনুগত করিয়া কিরূপে তাঁহার নিজের উক্তি বাণান করিয়া লিখেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে একবার অনুরোধ করুন। তিনি উচ্চারণ অনুগত বাণান করিবার জন্য "যখনই" "তখনই"-কে "যখনি" "তখনি" লিখিতেছেন; অথচ রেফের পর বর্ণের দ্বিত্বকে (যাহা ব্যাকরণসঙ্গত ও চিরপ্রচলিত) বিসর্জ্জন দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। রেফের পর বর্ণদ্বিত্ব না হইলে, উচ্চারণ অনুগত হইবেনা। তিনি যে কোন্ পথাবলম্বী, তাহা স্থূলবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা দায়।

তাছাড়া, তিনি "সৃজন" "ইতিমধ্যে" ইত্যাদি যে সমস্ত ভুল শব্দ চলিত হইয়া গিয়াছে তাহা চালাইবার পক্ষপাতী, অথচ যে সমস্ত ব্যাকরণসঙ্গত শব্দ

'মাঝ শব্দটাও এই জাতের, বলি মাঝখানে, মাঝদরিয়া, এ হোলো সমাস, আর বলি মাঝ থেকে…অধিকাংশ স্থলে…মনে পড়ছে…অক্ষরের হসন্ত বাংলা…মিলিয়ে রাখব…কেন…অনুসরণ করে…কর্তৃপক্ষেরা…এমন চিঠি পাই যাতে লেখক শনিবার…লক্ষণ প্রকাশ…'।

'প্রোবাসী'-র্ 'বানান্-বিধি' প্রোবোন্ধে রোবীন্দ্রনাথের্ লেখা উচিৎ ছিলো :

'মাঝ শব্দোটাও এই জাতের্, বোলি মাঝ্খানে, মাঝ্দোরিয়া, এ হোলো সমাস্, আর বোলি মাঝ্থেকে…ওধিকাংশো স্থলে…মোনে পোড়্চে…ওক্ষোরের্ হসোন্তো বাংলা…মিলিয়ে রাক্বো…ক্যানো…অনুসরোণ্ কোরে…কোর্তৃপোক্ষেরা…য়্যামোন্ চিটি পাই যাতে লেখোক্ শোনিবার্…লোক্ষোণ্ প্রোকাশ্…' :

এবোং তাঁহার্ উপরোক্তো প্রোতিজ্ঞাটি এইরূপ্ হওআ উচিৎ ছিলো :

'আপাততো জানিয়ে রাক্চি কেবোল পোদ্দে নয়, গোদ্দেও উচ্চারোণ্ ওনুগতো কোরে কোনো, কখোনো, যখোনি, তখোনি লিক্বো।'

পোন্ডিতেরা ইহার্ বিচার্ করিবেন্।" ("শনিবারের চিঠি," আষাঢ়, ১৩৪৪।)

এতকাল বঙ্গভাষায় সুপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে সে সকলের বিরোধী। তাঁহার এই আজগুবি খেয়ালের কারণ যে কি, তাহা তিনিই জানেন। এই খেয়ালের অনুমোদনকারীও অনেক। আমার মনে হয় ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত যে সকল বাঙ্গালী ভ্রাতা বাঙ্গালা ভাষা কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়াই পণ্ডিতম্মন্য হইবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁহারই ঐ প্রকার স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে ঐ স্বেচ্ছাচারিতা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিলে, বাঙ্গালা ভাষা বহুরূপিণী হইয়া পড়িবে। কবি অনেক প্রকার হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ভাষার একটা standard থাকা বাঞ্ছনীয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরা নিজেদের ভাষায় গান রচনা করিয়া "আলকাপের দলে" গাহিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত, "চোত্যা বঁধের পোলু পুষ্যা ঘোট্‌লো বিষুম দায়রে। মগোর্‌য়া মস্তান্যা পুঁকা ডালা বেছ্যা যায়রে"; "ঠাকুরাইন চট্‌কোইরা দ্যাও বিস্থায় কোইরা প্যাখ্‌না কোরোনা,..............ছেড়্যা যাবোনা;" "আবার দেখেছিস.........হাতের পাইনা বাড়িয়্যা তুমার জান থুবোনা;" ইত্যাদি।

নদীয়া জেলায় শীকারপুর অঞ্চলের মুসলমানদিগের কথ্য ভাষার একটা দৃষ্টান্ত: "হিঁদুর গরের যে মাংস, খাইক্যা পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তো গী—ঈ দিয়্যা বড়ো ত্যাল পিচ্‌ট্যা করে"।

যদি এইরূপ ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় স্থান দেওয়া যায় তাহা হইলে এক এক জেলায় ৮।১০ প্রকারে বাঙ্গালা ভাষাকে রূপধারণ করিতে হইবে। যদি বিশ্বকবি বলিয়া রবিবাবুর খেয়ালী ভাষা চলে তাহা হইলে উক্ত কবিগণের ভাষাই বা চলিবেনা কেন? কথ্য ভাষা সাহিত্য হইতে পারেনা। যাঁহারা সাহিত্যিক হইয়াও ইহার সমর্থন করেন, তাঁহারা কিরূপ সাহিত্যিক, বুঝিনা।............

আমি বাঙ্গালা ভাল জানিনা, কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে লইয়া কেহ ফুটবলের মত ক্রীড়নক করিয়া ক্রীড়া করে তাহাও সহ্য করিতে পারিনা। তবে আমি অক্ষম, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আপনি মায়ের কৃতী সন্তান। ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।............

আশা করি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আপনি আমাকে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা পাইয়া বাস্তবিকই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান বিষয়ে অনাচারের সৃষ্টি করিবার যে একটা বিশ্রী প্রচেষ্টা আজকাল চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমি যে যৎসামান্য প্রয়াস করিতেছি, তাহা আপনাদিগের ন্যায় প্রবীণ বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিগণের অনুমোদন ও সমর্থন লাভ করিয়াছে জানিয়া সত্যই অনেকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি। আশা করি এই ভাবে জনমত উদ্বুদ্ধ হইলে এই সমস্ত দুশ্চেষ্টার অচিরেই অবসান ঘটিবে।

বোধ করি, এতদিনে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের "মাসিক বসুমতী"-তে প্রকাশিত পত্রাবলীও পড়িবার সুযোগ আপনার হইয়াছে। তদ্বিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারিলে সুখী হইব। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পত্র)

শ্রীহরি

আজিমগঞ্জ
জিলা মুর্শিদাবাদ
১৩ই আশ্বিন, ১৩৪৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গত ৮ই আশ্বিন আপনার পত্র পাইয়াছি, তৎপূর্ব্বে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের "মাসিক বসুমতী"-ও পাইয়াছি। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের ঘোষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়-কমিটির বাণান সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি না করার বিষয় অবগত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কবিবরের দরখাস্ত—"আইন বানাবার অধিকার তাঁদেরই আছে আইন মানাবার ক্ষমতা যাঁদের হাতে; এই কথাটা চিন্তা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাকা করে দেবার জন্য দরখাস্ত জানিয়েছিলেম"—কমিটি যে মঞ্জুর করিতে পারিলেন না, তাহাতে তাঁহার ক্ষোভ যতই হউক, আমার মনে হয় তাঁহার অন্ধস্তাবকগণ ব্যতীত বঙ্গভাষার প্রতি মমত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রাবণের "বসুমতী"-তে প্রকাশিত আপনার দীর্ঘ পত্রে দেখিলাম, আপনি কবিবরের প্রত্যেকটি point অকাট্য যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। পড়িবার সময় মনে হয় যেন যুক্তিগুলি আনন্দের প্রস্রবণ। অপরপক্ষে কবিবরের যুক্তিগুলি পড়িয়া মনে হয়, যেন তিনি নিজের অন্যায় জেদ বজায় রাখিবার জন্য অপচেষ্টা করিতেছেন। "দায়ী" শব্দে স্বর-লাঘব "বেপথু বা জরাজনিত মনোযোগের দুর্ব্বলতার" জন্যই ঘটিয়াছে স্বীকার করিয়াও অন্যত্র স্বর-লাঘব সমর্থনের যে আয়াস, তাহাতেই তাঁহার জেদের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার পত্রের একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। " 'বশিত্ব' 'কৃতিত্ব' প্রভৃতি ইন্‌-ভাগান্ত শব্দে যদি হ্রস্ব-ইকার প্রয়োগই বিধিসঙ্গত হয় তবে 'দায়িত্ব' শব্দেও ইকার খাটতে পারে বলে আমি অনুমান করি।" তাঁহার এই উক্তির সামান্য আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে তিনি তাঁহার অন্যায় জেদ বজায় রাখিবার জন্য কিরূপ মোহপ্রাপ্ত। "বশিন্" শব্দ

প্রথমার এক বচনে "বশী", ত্ব-যোগে "বশিত্ব" ; "কৃতিন্" শব্দ প্রথমার এক বচনে "কৃতী", ত্ব-যোগে "কৃতিত্ব" ; সেইরূপ "দায়িন্" শব্দ প্রথমার একবচনে "দায়ী", ত্ব-যোগে "দায়িত্ব"। সমস্ত ইন্-ভাগান্ত শব্দেরই (আমি যতটুকু জানি) এইরূপ। ইহাতে "বশিত্ব" ও "কৃতিত্ব"-এর স্বরলাঘবের আলোচনা "দায়ী"-র স্বরলাঘবের প্রসঙ্গে কিরূপে উঠিতে পারে, বুঝিলামনা। তাহা হইলে আমরা এই যুক্তিবলে, হলধর ঘোষ টাকায় পাঁচ সের দধি বিক্রয় করে সুতরাং শশধর ঘোষকে টাকায় পাঁচ সের ঘৃত বিক্রয় করাইতে বাধ্য করিতে পারি। তাঁহার মত পণ্ডিত লোকেও যদি এই প্রকার যুক্তি দেখাইতে সঙ্কুচিত না হয়েন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

কবিবর নিজে স্বীকার করিয়াছেন, "অনেকদিন ধরে বানান সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার নিজেও করেছি অন্যকেও করতে দেখেছি। কিন্তু অপরাধ করবার অবাধ স্বাধীনতাকে অপরাধীও মনে মনে নিন্দা করে, আমিও করে এসেছি।" এত স্বীকার করিয়াও আবার নূতন করিয়া কেন যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কারণ ত বুঝিলাম না।

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের ন্যায় সাহিত্য-সেবিগণের যে সমর্থন লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিনা। আমি নিজে অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তি, বিশেষতঃ সাহিত্যসেবীও নই, তবুও কাঠবিড়ালীর মত যদি কিঞ্চিন্মাত্রও আপনার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে পারি তাহা হইলেই নিজেকে ধন্য মনে করিব। যোদ্ধার পিছনে চারণেরও দরকার।............

৺পূজার অবকাশে কোথায় থাকিবেন, দয়া করিয়া জানাইবেন। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি

ভবদীয়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[পণ্ডিত ৺কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সহিত]

(৺কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের পত্র *)

(১)

শ্রীরামঃ ভাটপাড়া

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৪

আয়ুষ্মন্ ভানু,

তোমাদের দেবপ্রসাদ বাবুর সাময়িক পত্রাঘাতে কবীন্দ্রের বাঙ্গালা-বাণান-সংস্কারে স্বেচ্ছাচারিতার স্পর্দ্ধা কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলে ভাষার পক্ষে মঙ্গল। তাঁহার নিজের ব্যবহৃত কতক অপ্রসিদ্ধ বাণান "জোরের জোরে" চালাইবার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধে তিনি ভর করিয়াছেন, এবং প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিককে পোঁ ধরিবার জন্য সহায় করিয়া ছাত্রদিগকে "গীতশব্দে সংরুদ্ধ লুব্ধমৃগের ন্যায়" কেবল পাশ-বদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ছাত্রদের পক্ষে ক্ষেমঙ্করী হইবে, না তাঁহাদের অনুসৃত বা সংস্কৃত (?) বাণান-প্রয়োগে ক্রমশঃ ছাত্ররা নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিবে, সে দিক্‌টায় তাঁহারা বোধ হয় তত মনোযোগ দেন নাই।

---

* রিপণ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম্. এ. বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে লিখিত।

স্বীকার্য্য যে বাঙ্গালা ভাষাতে কবীন্দ্রের ভাবের ঋণ অপরিশোধনীয় এবং ঔপন্যাসিকের নক্সার দানও যথেষ্ট। তবুও আমাদের ক্ষুদ্র ধারণায় তাহা যতটা ভোগ্য, ততটা শিক্ষণীয় নহে। ছাত্রদের পক্ষে কিন্তু ভোগের চেয়ে শিক্ষার প্রয়োজনটা বেশী। বিস্‌মোল্লায় ভোগলোলুপতা শিক্ষার যেন পরিপন্থী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তা' যদি হয় কেবল "জোরের জোরে" তাহাদের শিক্ষার গতি বিপর্য্যস্ত করা পাপ বলিয়া আমরা মনে করি।

দেবপ্রসাদ বাবুর ছাত্রজীবনের প্রোজ্জ্বল প্রতিভা তাঁহার কর্ম্মজীবনেও অম্লান-প্রতিফলিত দেখিয়া আমরা আন্তরিক সুখী।······তাঁহার অবলম্বিত পথ যে চিরাচরিত রীতির অনুমোদিত, তাহা সকলেই বিশ্বাস করেন। এই শ্লিষ্ট অথচ অনুগ্র প্রতিবাদ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন না করিয়া পারিলাম না। 'যদহমিচ্ছামি তদস্তু তে'। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীকুমুদচন্দ্র শর্ম্মা

(২)

শ্রীরামঃ ভাটপাড়া

ভাদ্র-অমাবস্যা

সৌম্যদর্শন ভানু,

গত আষাঢ় ও শ্রাবণের "মাসিক বসুমতী"-তে "বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান" বেশ উপভোগ্য প্রবন্ধ হইয়া উঠিয়াছে ; কেননা পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয়েই বাগ্মিয় ও মনস্বী। শব্দালঙ্কারের অপূর্ব্ব বিন্যাস-কৌশল, সূক্ষ্ম তর্কজাল-বিস্তারে মস্তিষ্কের ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া—সাহিত্য হিসাবে বেশ উপভোগ্য।······

প্রাকৃত-বাঙ্গালার বাণান, উচ্চারণের সঙ্গে মিলাইয়া—"কাণের সঙ্গে কলমের যোগ রক্ষা করিয়া"—ঠিক করিলেও প্রাদেশিকতার ধাঁধার হাত এড়াইতে পারা সুদক্ষ কোষকারের পক্ষেও খুব সহজ হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

সেকেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আমরা ত বিদ্রূপেরই সামগ্রী। আমরা অনেক কথা বে-সুরা শুনি—ঠিক সুর ধরিবার মত কাণ হয়ত আমাদের নিষ্ক্রিয়—নষ্টেন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য বিধায়। তবুও বক্তার উচ্চারণ ঠিক হইলে—হ্রস্ব, দীর্ঘ, ঝোঁক প্রভৃতি দ্বারা অর্থগ্রহে ভ্রম আমাদের অল্পই হয়; উচ্চারণের নেচ্‌কা-ফেরে "ইন্দ্রশত্রবে স্বাহা" আবৃত্তি করিয়া বৃত্রাসুরের বিরুদ্ধে আহুতির অভিযানে আমাদের ঠকাইবার চেষ্টায় অনেক সাহিত্যিককে কষ্ট করিতে হয়।

আটা, কড়া, মোচা প্রভৃতি তুল্যাকারবিশিষ্ট বিভিন্নার্থ-বোধক শব্দের উচ্চারণ ঝোঁকের তারতম্যে বুঝিতে হইবে—তাহার জন্য স্বরলিপি-সমেত নূতন অভিধান নিষ্প্রয়োজন। এই সহজ জিনিষটার জন্য বিশ্বপণ্ডিত-পুঙ্গবদের একটা প্রকাণ্ড বৈঠকে গবেষণা ততৈব নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁহারা হইতেছেন "বিপক্তিমজ্জানগতির্মনস্বী"; তাঁহাদের সভায় "কচাল্পবিষয়া মতিঃ" ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের "মৌনং হি শোভনম্"।

"জরাজনিত মনোযোগের দুর্ব্বলতা" রবিবাবুর একটা ভাণ মাত্র। অবিরত সাধনায় তাঁহার স্বভাবতরুণ মস্তিষ্কের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা ও তারুণ্যের লীলাবিলাস লেখনীমুখে আজও প্রতিভাত। আজও তাঁহার সেই নিঃসম্পর্কিতা উর্ব্বশীর "কুন্দশুভ্র-নগ্নকান্তিতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল, পুরুষের বক্ষোমাঝে তপ্তরক্তধারা" আজও তেমনিই নাচে। "সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা, অসম্ভব হ'বে লুপ্ত কবীন্দ্র গরিমা।"

এখন বিশ্বপণ্ডিতবাবুরা যুক্তির চেয়ে বিশ্বস্তর (বিশ্বভার?) ব্যক্তিত্বের চাপে কাবু হইবেন, না মাষ্টারী ভিন্দিপালের এবং ওকালতীর জব্বর জেরার যুগপৎ আক্রমণে নির্জ্জীব হইবেন দেখিবার বিষয়। "আমরা শুধু দাঁড়ায়ে দেখিবে তফাতে"। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীকুমুদচন্দ্র শর্ম্মা

[শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত]

(শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদারের পত্র)

(১)

মধুবাণী
১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৮

সবিনয় নিবেদন,

বাঙ্গালা বাণান-সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি মাসিকে আপনার ও বিশ্বকবির মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিয়াছে তাহা আমি অতি সাবধানতা-সহকারে পাঠ করিয়াছি। বহু প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ও লেখক এবিষয়ে আপন আপন মত প্রকাশ করিবার পরও আমার মত সামান্য লোকের পক্ষে এবিষয়ে আলোচনার অধিকার কি, তাহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে শিক্ষক হিসাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি আপনাকে কিছু জানাইতে চাই।

প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষার কোন standard নাই। কোন্‌টা ভুল কোন্‌টা শুদ্ধ তাহা নিশ্চয় করিতে, ছাত্রেরা দূরে থাক্, পণ্ডিতেরাও বিশেষ

ধোঁকায় পড়িয়া থাকেন। তাই আজকাল আর সাহস করিয়া ছাত্রদের লিখিত কোন কিছু ভুল বলিয়া কাটিয়া দেওয়া চলে না। কারণ তখনই হয়ত ছাত্র বলিবে যে রবিবাবু বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ আধুনিক লেখক এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং standard আবশ্যক। সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শ মানিতে হইবে, না প্রাকৃতকে, সে বিষয়ে আমার কোনটাতেই আপত্তি নাই, কিন্তু আদর্শ যথাসম্ভব সর্ব্বজনমান্য হওয়া চাই। "যে সকল বাণান বাঙ্গালা ভাষাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, অনর্থক তাহার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে"—আপনার এই অভিমত আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। যাহা বাঙ্গালা ভাষাতে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভুল হইলেও অথবা লিখিবার ও লাইনোটাইপে ছাপিবার অসুবিধা হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। করিলে, যাহা ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেও উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলিয়া গণ্য হইত, আজই তাহা অচল (obsolete) হইয়া পড়িবে। পাঠ্যপুস্তকে ছাত্রদিগকে যে সকল লেখা পড়িতে হয়, তন্মধ্যে খুব অল্পই অতি-আধুনিকদের লেখা। সুতরাং ছাত্রদের রচনা বঙ্কিম বাবু বা ভূদেব বাবুর অনুসারিণী হইলেই আমাদিগকে তাহার শ্রেষ্ঠতা দিতে হয়। ভাষাতে চেষ্টা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন আনা উচিত নহে, সম্ভবও নহে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা শতগুণ প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানও যদি নিয়ম বাঁধিয়া দেয় তথাপি তাহা সকলে মানিবে না। রাজশক্তি দ্বারাও ইহা সম্ভবপর নয়; যদি হইত তবে ইংরাজ প্রভৃতি সুসভ্য জাতির ভাষাতেও শব্দ সকলের ধ্বনি ও রূপে এত প্রভেদ থাকিত না।

বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব কোন ব্যাকরণ নাই। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ-কৃত ব্যাকরণ ছাড়া স্কুলপাঠ্য একখানাও ব্যাকরণ আমি দেখি নাই যাহাতে বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা হইয়াছে। সকলই সংস্কৃত-ব্যাকরণ বলিয়া মনে হয়। তাহাতে বারৈক, তিনৈক প্রভৃতি শব্দই শুদ্ধ নির্দ্দেশ করিয়া, পাদটীকায় ক্ষুদ্রাক্ষরে, "কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বারেক, তিনেকের ব্যবহার

আছে", এইরূপ লিখিত হয়। ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া, কোন্ ভাষার ব্যাকরণ লিখিতেছেন গ্রন্থকার তাহাই ভুলিয়া যান। আবার অনেক শব্দ আছে যাহা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই ভুল, অন্যত্র শুদ্ধ। Correct the following বলিয়া যদি "সক্ষম" শব্দটী দেওয়া যায়, তবে তাহাকে শুদ্ধ করিতে হইবে "ক্ষম"; অন্যত্র "সক্ষম"-ই শুদ্ধ। জাগ্রত, সততা প্রভৃতি শব্দও ঐ পর্য্যায়ভুক্ত। এইগুলি শুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিয়া লইলে ক্ষতি কি? কিন্তু তাই বলিয়া, "চিহ্ন" বা "পূর্ব্বাহ্ন" চালাইতে হইবে না, কারণ এইগুলি দেখা যায় যে অল্পধীগণই ব্যবহার করিয়া থাকেন; তবে যে কৃতবিদ্যগণও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাই চিন্তার বিষয়। যে ক্ষেত্রে এখনও অধিকাংশ লেখক সংস্কৃতানুযায়ী শব্দটীর ব্যবহার করিতেছেন সে ক্ষেত্রে অনর্থক পরিবর্ত্তন অবিধেয়। কেহ এইরূপ কেহ ঐরূপ লিখিলেই গোলমাল বাধিবে। বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হউক বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হউক, ইহার শব্দ-সম্পদের জন্য প্রধানতঃ সংস্কৃতের নিকট ঋণী। বিনা কারণে সংস্কৃতের অবমাননা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ইংরাজী ভাষাতেও দেখিতে পাই যেখানে লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে শব্দ ধার করা হইয়াছে সেখানে সেই ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে, এবং উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইলেও যথাসম্ভব মূলানুযায়ী বাণান রাখা হইয়াছে। Daughter শব্দটীতে আপাততঃ gh অনাবশ্যক মনে হয়, কিন্তু উহা সংস্কৃত "দুহিতৃ," আবেস্তার "দুঘ্তর," ফারসী "দুখ্তর," গ্রীক্ "থুগাটের" প্রভৃতি শব্দের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে বোধ হয় আবেস্তার "দুঘ্তর"-ই প্রাচীনতম রূপ এবং য়্যাংগ্লো-স্যাক্সন daughter শব্দটীর উচ্চারণ প্রায় তাহাই ছিল। এইরূপ ইংরাজী know শব্দ লাটিন gnos (যাহা হইতে ignorant আসিয়াছে) ও সংস্কৃত জ্ঞা-ধাতুর সহিত সংশ্লিষ্ট, কিন্তু কালক্রমে "ক্নো"-এর উচ্চারণ "নো"-তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। Resign-কে উচ্চারণানুযায়ী resine বা resi'n লেখা হয় না। মধ্যের g-টী যে বেকার নহে, resignation

শব্দেই তাহা ধরা পড়ে। বাঙ্গালাতে আমরা ঐরূপ "বড়" লিখিয়া "বুড়ো" পড়িতে পারি, ও "কি"-র উচ্চারণে আবশ্যক মত "কী" বলিতে পারি। কেবল দেখিতে হইবে যে প্রচলিত রীতির উল্লঙ্ঘন না হয়।

রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জ্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতি যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে এই দ্বিত্ব বৈকল্পিক। আমরা যেরূপ লিখিয়া থাকি, তাহা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ নহে। তবে প্রচলিত রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্বিত্ব বর্জ্জনই করিতে হইবে তাহার হেতু কি? আষাঢ় মাসের "বসুমতী"-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "এখন থেকে কার্ত্তিক, কর্ত্তা প্রভৃতি দুই-ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক 'ত' আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করিতে পারি।" কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হইবার অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতিও দেন নাই। "কৃত্তিকা" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া অন্ততঃ "কার্ত্তিক" শব্দে দুই ত-ই বিহিত করিয়াছেন। এইরূপ, শংকা, শাংত, সংস্কৃতে অনুমোদিত হইলেও বাধ্যতামূলক নহে, এবং বাঙ্গালায় একেবারে অচল। আশ্চর্য্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রেই "অবিসম্বাদিত" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা ব্যাকরণ ও বাণান-সমিতি উভয়েরই অননুমোদিত।

শব্দগঠনেই ব্যাকরণের পরিসমাপ্তি নহে। বাক্যে শব্দসকলের যথাযথ বিন্যাস বা syntax-ও ব্যাকরণের এক প্রধান অঙ্গ। বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র আমি এপর্য্যন্ত যত দেখিয়াছি, প্রায় সকলগুলিতেই correction-এর passage-টী এরূপ যাহাতে দুই চারিটী এমন শব্দ আছে যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভুল। বাক্যগঠন (construction)-সম্বন্ধীয় ভুল খুব কমই দেখিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ syntax-এর প্রায় কোন নিয়মই মানেন না। তাই আজকাল, "এম্নি করে তার ছোট জীবনখানি টেনে এনেছিল সে মৃত্যুর কিনারাতে······" গোছের রচনা মাসিকে পাইতেছি। ১৩৩৯ সালের আশ্বিনের "প্রবাসী"-তে নিম্নলিখিত বাক্যটী পাইয়াছিলাম, "ভিতরের কোন

অংশের একটুখানি ক্ষতি, নোংরা, কিংবা থুতু ফেলিলে হাজার টাকা দণ্ড দিতে হইবে" (১১৪পৃঃ)। বলা বাহুল্য ঐ বৎসরই Test পরীক্ষায় বাক্যটী ছাত্রদিগকে শুদ্ধ করিতে দিয়াছিলাম। বাঙ্গালী বিদ্বান্ লেখকগণ ইংরাজী কাগজে প্রবন্ধাদি লিখিবার সময় সাবধান হন যাতে কোন ভুল না থাকে, কিন্তু তাঁহারাই বাঙ্গালা লিখিবার সময় অসাবধানতাপূর্ব্বক ভুল লিখিয়া থাকেন, এবং সম্পাদকেরাও নির্ব্বিচারে ছাপিয়া যান। যেন বাঙ্গালার মা বাপ নাই, যেন ইহা ভাষাই নহে, এবং ইহার শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি মনোযোগ করারও কোন প্রয়োজন নাই। এমন কি বাঙ্গালাতে বেশী ভুল করা যেন অনেকে পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। জানি না, বর্ত্তমান বাঙ্গালী লেখকেরা মাতৃভাষাকে কাণে ধরিয়া সোজা রাজপথ হইতে সরাইয়া আনিয়া কোন্ বিপথ গলিতে চালিত করিতেছেন ও তাহার ফল কি হইবে। বঙ্গভাষা শিক্ষার বাহন হইল, ভালই। কিন্তু ভয় হয় যে, যে ভাষার নিজের ভিত্তি নাই, যাহা গলিত ধাতুর ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি গ্রহণে অসমর্থ, তাহা শিক্ষার বাহনরূপে টিঁকিবে কিনা।

তারপর দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিকতার কথা। পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণের ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে পশ্চিম বঙ্গের বা কলিকাতার ভাষাকেই লেখ্য ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ তাঁহাদের প্রাদেশিক ভাষাকে লেখ্যভাষা করার দাবী কখনও করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন সাধুভাষার ঐ অধিকার অপ্রতিহত রাখিতে। কিন্তু যেরূপ দেখা যায় হিন্দুধর্ম্মত্যাগী বিধর্ম্মীরাই হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টিজিত (culturally conquered) অনেক পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী আজকাল এই নবীন বাঙ্গালার প্রধান পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহার কারণ কি? রাজধানীর ভাষা হইলেই তাহা আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষা হয় না। লণ্ডনের cockney dialect অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাদেশিকতা-পূর্ণ; নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ডের ভাষা তদপেক্ষা অধিক মার্জ্জিত ও লেখ্য ভাষার

অনুরূপ। পারস্যে তিহারাণের ভাষা আদর্শ নহে, শিরাজের ভাষাই আদর্শ। কলিকাতার ভাষার এই বেদখল (usurpation)-এর দরুণই আজ একই "আসিয়াছে" কথার "এসেছে", "এসেচে", "এয়েছে" প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যে "এসেচে" "করেচি" লিখেন, পদ্যে লিখেন না। তিনি কবি বলিয়া বোধ করি গদ্যকেই অধিক বিকৃত করিতে চাহেন— কখনও স্বাধীনতার, কখনও অনভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া। যদি সকলেই কথ্যরূপকে লেখ্য করিয়া লইত তবে কথা ছিল না। কিন্তু এখনও বহুস্থলে, বিশেষতঃ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে সাধুভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতেই গোল বাধিয়াছে।

রাঢ় ও সুহ্ম অঞ্চলের লোকেরা নাকি কথা বলার সময় মুখ বেশী ফাঁক করেন না, যদি দৈবাৎ আ-কার বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে। পূর্ব্ববঙ্গ-বাসীদের বিরুদ্ধে এইরূপ কোন অভিযোগ নাই। তাঁহারা নির্ভয়ে আ-কারের উচ্চারণ করিতে পারেন। খেতে, যেয়ে, ফিরে, এসেছে প্রভৃতি ঐ আ-কার-ভীতিরই উদাহরণ। তবে ভেত, ডেল, এলু এখনও আরম্ভ হয় নাই। ভেতো (ভাতুয়া), ভেয়ের (ভাইয়ের), মেগের (মাগের) কিন্তু আরম্ভ হইয়াছে। এবিষয় দুইটী নিয়ম দৃষ্ট হয় :

(১) ই-কারযুক্ত অক্ষরের পর আ-কারযুক্ত অক্ষর থাকিলে আ-কার-স্থলে এ-কার আদেশ হয় ; যথা : মিঠা মিঠে, সিধা সিধে, চিঁড়া চিঁড়ে, পিঠা পিঠে, পিসা পিসে, মিছা মিছে, করিয়া ক'রে, করি না করি নে।

(২) উ-কারযুক্ত অক্ষরের পর আ-কারযুক্ত অক্ষর থাকিলে আ-কার স্থলে ও-কার আদেশ হয় ; যথা : জুতা জুতো, গুঁতা গুঁতো, গুঁড়া গুঁড়ো, সূতা সূতো, মূলা মূলো, পোড়ামুখা পোড়ামুখো, তূলা তূলো, খুড়া খুড়ো, বুড়া বুড়ো।*

* কলিকাতার কথ্যভাষার ব্যাকরণে আরও কতকগুলি নিয়ম আমি আবিষ্কার করিয়াছি।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে অনেকে ইতিমধ্যেই এরূপ অনেক শব্দের পূর্ব্বরূপ ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে আমার নিকট যে সকল বাঙ্গালী ছাত্র পড়ে তাহারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গবাসী। তাহাদিগকে সর্ব্বদাই চিঁড়ে, ধনে, সরষে, ঝিঙ্গে লিখিতে দেখি। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে তাহারা ইহাদের পূর্ব্বরূপ মোটেই জানে না। এমন কি মূল, কুমড়, প্রভৃতিও লিখিতে দেখিয়াছি। শুদ্ধ করিয়া মূলো ও কুমড়ো করা গেল; কিন্তু ইহারা যে কোন কালে মূলা ও কুমড়া ছিল, ইহা তাহাদের মাথায় ঢোকান গেল না। যদি কাহারও সন্দেহ থাকে যে মিঠা, চিঁড়া (হিন্দীতে বোধ হয় বলিতে হইবে চুড়া), জুতা, মূলা প্রভৃতি আসল রূপ নহে, তবে তাহাকে বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে ও প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। দেখিবেন বর্ত্তমান রাঢ় ও সুহ্ম ব্যতীত সমুদায় উত্তর-ভারতে ঐ সকল রূপই প্রচলিত। হিন্দুস্থানী চাকর "হরিয়া" কলিকাতায় আসিয়া "হ'রে" হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার "ঠন্‌ঠনিয়া" (ইংরাজীতে লেখা হয় Thanthania) বাঙ্গালাতে "ঠন্‌ঠনে" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "বড়িশা" "ব'ড়শে" হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরের স্থানগুলিরও নিষ্কৃতি নাই। "ঝড়িয়া" "ঝ'ড়ে" হইতে চলিয়াছে; বোধ হয় "পুসা" শীঘ্রই "পুসো" হইবে। "দুইটা" "দুটো" হইয়াছে; কিন্তু "তিনটা" "তিনটে" (পূর্ব্বনিয়ম দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মিলের খাতিরে রবীন্দ্রনাথও "সর্ব্বনাশিয়া" লিখিয়াছেন। যথা, "দেখি সে মুরতি সর্ব্বনাশিয়া, কবির পরাণ উঠিল ত্রাসিয়া"। আমরা ছেলেবেলায়ও পড়িয়াছি যে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের রূপ প্রথম পুরুষে "করিবে," মধ্যম পুরুষে "করিবা," উত্তম পুরুষে "করিব"। কিন্তু মধ্যম পুরুষের আ-কারটী ইকারের পরে আসার অপরাধে এ-কারে পরিণত হইয়াছে। আজ অনেকে ভুলিয়াই গিয়াছেন যে "করিবা"-ই আসল রূপ ছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা এখনও পত্রাদিতে তাহাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কৃত্তিবাস ও

কাশীরাম দাস (ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী নহেন)—ইঁহাদের কাব্যে এরূপ ভূরি ভূরি ব্যবহারে প্রমাণিত হইবে যে পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গে ইহাই একমাত্র রূপ ছিল।

শব্দের এইরূপ বিকৃতি যে কেবল তদ্ভব ও দেশজ শব্দেরই ঘটান হইয়াছে তাহা নহে, অনেক তৎসম শব্দেও চলিতেছে। ইচ্ছে, সুবিধে, বিশ্বেস, পূজো, চূড়ো প্রভৃতিও এখন চৌচাপটে চলিতেছে। শিশুসাহিত্যেই (ছোটদের মাসিক প্রভৃতিতে) ইহাদের উপদ্রব বেশী। তাই বিদেশীরা অনায়াসে বাঙ্গালা সাধুভাষা শিখিতে পারিলেও এই শিশুসাহিত্যে ও তরুণ সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। "পূজো এসেছে" বুঝিতে পূর্ব্ববঙ্গের শিশুরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়। "পূজো" নামক কোন জীবের কথা তাহা তাহারা কখনও শুনেও নাই, পাঠ্যপুস্তকেও পড়ে নাই। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত বোধ হয় যে লিখিতে হইবে "পূজা", তাহা আবশ্যক মত ভিন্ন ভিন্ন জিলার লোকেরা "পূজা" বা "পূজো" পড়িবেন ; যেমন একই laugh শব্দকে উত্তর ইংলণ্ডে ল্যাফ্‌ ও দক্ষিণ ইংলণ্ডে লাফ্‌ উচ্চারণ করা হয় ; যেমন Mayor, under, chair প্রভৃতি শব্দ লণ্ডনে মেয়া, আণ্ডা, চেয়া রূপে উচ্চারণ করা হয়। তবু বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজীর চেয়ে অনেক পদস্থ থাকিবে। তবে আমি "ঘোটক" লিখিয়া "ঘোড়া" পড়িতে বলি না, কারণ "ঘোড়া" শব্দ বাঙ্গালাতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

দেখা যাইতেছে হিন্দুস্তানের * অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় শব্দসকলের বিকার অধিকতর দ্রুতগতিতে ঘটিতেছে বা ঘটান হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এমন অনেক শব্দ পশ্চিমবঙ্গের ভাষাতে পাওয়া যায়, যাহার অনুরূপ শব্দ উত্তর-ভারতের অন্য কোন ভাষায় দেখা যায় না। নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে :

---

* আমি "হিন্দুস্তান" লিখিবার পক্ষপাতী ; কারণ "হিন্দু" ও "স্তান" উভয়ই ফারসী শব্দ। "হিন্দুস্থান" লিখিলে hybrid হইয়া যায় (অবশ্য বাঙ্গালাতে সজোরে, নিখুঁত, অকাট্য প্রভৃতি hybrid চলিতেছে)। উর্দ্দু, হিন্দী, ও ইংরাজীতে "হিন্দুস্তান" (Hindustan)-ই লিখা হয়।

সংস্কৃত	মৈথিলী (দ্বারভাঙ্গা)	উত্তরবঙ্গ (রঙ্গপুর)	পূর্ব্ববঙ্গ (ঢাকা)	পশ্চিমবঙ্গ (কলিকাতা)
কঙ্কতিকা	কাঙ্ঘী	...	কাঁকই	চিরুণী
বদরী	বয়ের	বড়ই	বড়ই	কুল
বধির	বহিরা	...	বয়রা	কালা
মরিচ	মির্চ্চাই	মরৈচ	মরিচ	লঙ্কা
জম্বীর	জম্বিরা	জম্বুরা	জম্বুরা	বাতাবি
চুক্র	...	...	চুকা	টক
...	গয়া	...	গৈয়া	পেয়ারা
...	ইচা	ইচা	ইচা	চিংড়ি

এইরূপ হইবার কারণ কি ? আমার ত মনে হয় মগধ ও রাঢ়ে বহুকাল অনার্য্য-নিবাস থাকা হেতু অনার্য্য ভাষার প্রভাব তাহাদের উপর পড়িয়াছে। সেই সকল অনার্য্য-মূলক শব্দই এখন কলিকাতার স্থানমাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছে।

আমাদের তৃতীয় অভিযোগ বাঙ্গালা ভাষার সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে। পূর্ব্বে জানিতাম একই বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা। আজকাল "মুসলমানী বাঙ্গালা" নামটী শুনিয়া মনে বিভীষিকার উদয় হয়। কোন কোন মুসলমান বাঙ্গালা ছাড়িয়া একেবারেই উর্দ্দূর পক্ষপাতী। তাহা না হইলেও, "অতএব জনাব উক্ত মায় বেরাদারান্ আজিজান্ গুলামহেকান্ হাজির হইয়া এই খকছারকে ছরফরাজ করিতে মরজি করিবেন, আরজ ইতি," ইহা বাঙ্গালা হইল না। অনেক আরবী, ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে দূর করিয়া "হিন্দু বাঙ্গালা" গঠনের পক্ষপাতী আমরা কেহই নহি। সেরূপ হইলে এক সম্প্রদায়ভুক্ত পরীক্ষার্থীর কাগজ অপর সম্প্রদায়ভুক্ত পরীক্ষকের হাতে পড়িলে ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইবে ? মুসলমান লেখকগণ বাণান সম্বন্ধেও যথেচ্ছাচার

করিতেছেন। তাঁহারা প্রচলিত বাণান বিকৃত করিয়া দন্ত্য-স স্থলে ছ-এর আদেশ করিয়াছেন, এবং "ছিরাজী ছাহেব ছিরাজগঞ্জ ছহরে ছফর করিবেন" গোছের বিকট ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আরবী ও ফারসী যে সকল অক্ষরের স্থানে বাঙ্গালায় "ছ" চালান হইতেছে তাহা তিনটি—সে, সোয়াদ্ ও সীন্। তিনটীই ইংরাজীতে s দ্বারা এবং হিন্দী ও সাধারণ বাঙ্গালায় দন্ত্য-স দ্বারা transliterate করা হয়; যথা, সরকার, সুলতান। মুসলমানগণও ইংরাজী লিখিবার সময় Ichhlam বা Muchhlim লিখেন না, Islam বা Muslim লিখেন। তিনটী অক্ষরের মধ্যে সে-এর উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কেহ "স" এবং কেহ "থ" উচ্চারণ করেন, যথা Osman বা Othman; কিন্তু সে-এর ব্যবহার অতি অল্প। অধিকাংশ আরবী শব্দে ও সমুদায় ফারসী শব্দে সীন্-এরই ব্যবহার। ইহার উচ্চারণ ঠিক দন্ত্য স-এর মত। উর্দ্দুতে সমুদ্র প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক শব্দ লিখিতে সীন্-এর ব্যবহার দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়। আরবী, ফারসী ও উর্দ্দুতে কোন অক্ষরের উচ্চারণই যে "ছ" নহে তাহা বুঝা যায় উর্দ্দুতে ছোটা, পিছে, ছয় প্রভৃতি কিরূপে লেখা হয় তাহা দেখিয়া। যেরূপ Philosophy, Phanindra প্রভৃতি নামে ph একত্র ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝা যায় যে ইংরাজীতে গ্রীক "ফাই" বা বাঙ্গালা ফ-এর অনুরূপ কোন অক্ষর নাই, সেইরূপ উর্দ্দুতে ছোটা, পিছে প্রভৃতি শব্দে চে-হে একত্র ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝা যায় যে উর্দ্দু প্রভৃতিতে ছ-এর অনুরূপ কোন অক্ষর নাই। ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে সীন্-এর ইংরাজী s তাহা মানি, কিন্তু s-এর অনুরূপ বাঙ্গালা অক্ষর নাই। দন্ত্য স-এর পূর্ব্ব উচ্চারণ যাহাই হউক, এখন উহা শ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। তবে ঐ মুসলমান লেখকরাই কেন কংগ্রেছ্ এছোছিয়েশন প্রভৃতি লিখেন না? দন্ত্য স-এর প্রকৃত উচ্চারণ কোন কোন স্থানে আছে; যথা, স্ত, স্থ, স্ন, স্র। "দস্তখত" স্থলে "দছ্তখত" আমি কাহাকেও এখনও লিখিতে দেখি নাই। যদি স ও ছ উভয়ই ভুল হয়, তবে

প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়া "ছকারের ছিছিকারে" বাঙ্গালা ভাষাকে লাঞ্ছিত করা কেন ? ইহা কি কেবল "মুসলমানী বাঙ্গালা"-র স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য? বাঙ্গালী মুসলমানগণ কি মনে করেন তাঁহারাই সমস্ত আরবী ও ফারসী শব্দের custodian যে ইহাদিগকে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন? হিন্দুস্তানী মুসলমানকে "ছাহেব" বলিলে বোধ হয় তাঁহারা গালি মনে করিবেন। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ বর্ত্তমান বাঙ্গালার স্রষ্টারা মূর্খ ছিলেন না। তাঁহারা সকলেই ফারসীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা ফারসী শব্দসকলের যে বাণান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। যে সকল ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় চলিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে এখন বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকার (ইহা অস্বীকার করিলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের তুল্যাধিকারও স্বীকার করা যায় না); সুতরাং অকারণে তাহাদের বিকার-সাধন মাতৃদেহের অঙ্গচ্ছেদের মতই অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার ব্যাকরণ নাই*। যে সকল ব্যাকরণ আছে তাহাতে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম, কৃৎ-তদ্ধিতের নিয়ম, সংস্কৃত সম্বোধন পদ কিরূপে গঠিত হয়, ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয় কি আপ্ হয়, এসকলের মীমাংসা আছে বটে; কিন্তু কর্ম্মকারকের "কে" চিহ্ন কোথায় লুপ্ত হয়, টী, টা কোথায় প্রযুক্ত হয়, বাঙ্গালাতে সম্প্রদান কারক, ক্লীবলিঙ্গ প্রভৃতির প্রয়োজন আছে কিনা, বাঙ্গালা idiom ও hybrid কি কি, ইত্যাদি বিষয় যাহা বাঙ্গালার নিজস্ব, তাহার কোন চর্চ্চা নাই। যাঁহারা ভাল বাঙ্গালা জানেন বলিয়া গর্ব্ব করেন তাঁহারাও এসব প্রশ্নে ঘাবড়াইয়া যান, এবং ইংরাজী সব শব্দ parse করিতে পারিলেও বাঙ্গালা শব্দের parsing করিতে মুস্কিলে পড়েন। "বটে" একটী অব্যয়

---

* আমি অবশ্য স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের কথাই বলিতেছি; নতুবা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, রাজশেখর বসু প্রভৃতি সুধীগণের দ্বারা প্রকৃত ব্যাকরণের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে।

বটে, কিন্তু "কে বট আপনি" দেখিয়া মনে হয় "বট্" একটা defective verb। এই সকল নিয়ম না জানাতে বিদেশী বাঙ্গালা-শিক্ষার্থীদের নিকট বাঙ্গালা unscientific language। স্বভাবতঃই তাঁহারা লিখিতে পারেন "রাম ভাতকে খায়", "রাম শ্যাম দেখে", "রাজাটী চলিয়া গেলেন", অথবা "হাতে কলমে" অনুবাদ করিতে পারেন, with pen in hand। বর্ত্তমান বাঙ্গালার কোন standard নাই, যাহার যা খুসী ব্যবহার করিতেছেন।

এবিষয়ে হিন্দী অনেক ভাল। হিন্দী ভাষা কঠিন বটে কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালার ন্যায় যথেচ্ছাচার নাই, ইহা ইংরাজী প্রভৃতির ন্যায় নিয়মবদ্ধ। ইহাতে শব্দসকলের বাণান সুনির্দ্দিষ্ট, syntax ও construction-এর শুদ্ধি অশুদ্ধি আছে এবং সাধু ভাষা ও চল্‌তি ভাষার দ্বন্দ্ব নাই। যদিও হিন্দীতে "জানা" (যাওয়া) "সুন্‌না" (শোনা), "কান" (কাণ), "রানী" (রাণী) প্রভৃতি বাণান সংস্কৃতানুগ নহে, তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে কোন ঝগড়া নাই। কিন্তু বাঙ্গালাতে "বিদেশীর কথা দূরে থাক, বাঙ্গালী লেখকেরই বহুস্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয়—'জন্মিল' না 'জন্মাইল'? 'ঘুরনো' না 'ঘোরান'? 'মুচড়িয়া', 'মুচড়াইয়া' না 'মোচড়াইয়া'? 'উল্‌টে' না 'উল্‌টিয়ে'? 'করিতেছিলাম' না 'করছিলাম'?"*

উচ্চারণের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দী বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে হয়। শ ও স, ণ ও ন, জ ও য, বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব, ই ও ঈ, উ ও ঊ প্রভৃতির মধ্যে উচ্চারণগত ভেদ আছে; এই সকলের শুদ্ধ উচ্চারণ পাঠশালা হইতেই ছেলেদের শিখান হয়। আমরা ব-ফলা ও ম-ফলার শুদ্ধ উচ্চারণ করি না বলিয়াই "পক্ব" লিখিতে "পক্ক" লিখি ও "আত্মা"-কে "আত্তাঁ" পড়ি। হিন্দুস্থানীদের মুখে দ্বিতীয়া, বিদ্যা প্রভৃতির dwitiya (প্রায় "দোইতীয়া"), vidya (প্রায় "উইদিয়া") উচ্চারণ শুনিয়া আমরা ঠাট্টা করিতে পারি, কিন্তু উহাই শুদ্ধ উচ্চারণ। বিহার অপেক্ষা যুক্তপ্রদেশের

* শ্রীরাজশেখর বসু-প্রণীত "চলন্তিকা" (ভূমিকা)।

উচ্চারণ আরও বিশুদ্ধ। কোন কোন বাঙ্গালী বাঙ্গালা হইতে শ, ষ, ণ, য, ঈ, ঊ, প্রভৃতি নির্ব্বাসন করিবার পক্ষপাতী; কারণ উহাদের স্বতন্ত্র উচ্চারণ বাঙ্গালাতে নাই। কিন্তু ঐরূপে প্রচলিত বাণানের গলায় ছুরি না চালাইয়া যাহাতে লোকে শুদ্ধ উচ্চারণ করে সেইদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত নয় কি? ইংরাজী শব্দগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ ছেলেদিগকে শিখাইবার জন্য আমরা কত না যত্ন করি; k ও q-এর উচ্চারণভেদ, j ও z-এর উচ্চারণভেদ শিক্ষকদিগকে শিখাইবার জন্যই ট্রেণিং কলেজে হাজার টাকা মাহিনায় একজন ইংরাজ অধ্যাপক রাখিতে হয়। কিন্তু মাতৃভাষাতে শুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইবার কোন চেষ্টা নাই। আজকাল "গাড়ি" চলিতেছে, "হাতি" চলিতেছে, "বাড়ি"-ও চলিতেছে; অর্থাৎ প্রচলিত বাণানকে বিকৃত করিয়া উচ্চারণ-বিকৃতিও শিখান হইতেছে। যদিও স্বীকার করা যায় যে বাঙ্গালা ণ, য, ঈ, ঊ-এর কোন স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই, সংস্কৃতে যে আছে তাহা ত অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু বাঙ্গালা শিক্ষার দোষে ছাত্রেরা সংস্কৃতেও অশুদ্ধ উচ্চারণ শিখে। বাঙ্গালীর ছেলে সংস্কৃতে পণ্ডিত হইলেও প্রায়ই বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণভেদ ও প্রয়োগভেদ জানেনা। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণ অশুদ্ধ হইলে তাহা ফলদায়ক হয় না।

হিন্দীতে বাণান ও উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে যাহা বাণান-সমিতি বিবেচনা করিলে ভাল করিতেন; যথা:

(১) ক, খ, গ, জ, ফ, এই কয়টী অক্ষরের নীচে বিন্দু দিয়া কতগুলি বিদেশী উচ্চারণ প্রকাশিত হয়; যথা, ক়—ইংরাজী q বা ফারসী কাফ্, খ়—ফারসী খে, গ়—gh বা ফারসী গাইন, দন্ত্য-তালব্য জ়—ইংরাজী z বা ফারসী জে প্রভৃতি, দন্ত্যোষ্ঠ্য ফ়—ইংরাজী f বা ফারসী ফে *; যথা, হক়, বাগ়দাদ, গ়োরী (ঘোরী নহে), জ়ুলুম। দন্ত্যোষ্ঠ্য ভ় (v) ও

* উর্দ্দুতে "ফল" "ফির" প্রভৃতি লিখিতে কখনও "ফে" ব্যবহৃত হয় না, "পে-হে" যুক্ত করিয়া ব্যবহৃত হয়; যেমন, ফণীন্দ্র ইংরাজীতে Phanindra (Fanindra নহে)।

দন্ত্য-তালব্য চ়-ও introduce করা যাইতে পারে। দন্ত্যৌষ্ঠ্য ভ় হইল ইংরাজী v-এর ধ্বনি ; ইংরাজী v-কে বাঙ্গালাতে "ভ" দ্বারা প্রকাশ করিলে ঠিক ধ্বনিসঙ্গত হয় না ; যথা, ভ়িক্টোরিয়া (ভিক্টোরিয়া নহে)। দন্ত্য-তালব্য চ-এর ধ্বনি চীনদেশে সুপ্রচলিত ; যথা, টিয়েন্‌চ়িন্।* যে ভাষার শব্দ গ্রহণ করা হয় উচ্চারণে যথাসম্ভব তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। ইহাতে ছাত্রদের ইংরাজী ও ফারসীর ভুল উচ্চারণ সহজে সংশোধিত হইতে পারে। বাঙ্গালায় ফারসী শব্দসকলের উচ্চারণ অত্যন্ত অশুদ্ধ, সেজন্য হিন্দুস্তানীদের সঙ্গে কথা বলিতে আমাদিগকে বিশেষ হাস্যাস্পদ হইতে হয়। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। বাঙ্গালায় আমরা "জহর" শব্দ রত্ন অর্থে ব্যবহার করি ; কিন্তু ফারসী "জহর" মানে বিষ, এবং "জবাহর" (jawahar) মানে রত্ন।

(২) আরবী, ফারসী ও উর্দ্দুতে তিনটি বই স্বরবর্ণ নাই। যথা, আলিফ—অ বা আ, ইয়া—ঈ বা এ, ওয়াও—উ বা ও। তিনটীই দীর্ঘ উচ্চারণ। যেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ নাই, সেখানে স্বরবর্ণ আদপেই ব্যবহৃত হয় না ; যথা, clctth—কলকত্তহ্, ktab—কিতাব, mslman—মুসলমান, kpra—কাপড়া, lrka—লেড়কা, ইত্যাদি। কখন কখন জের, জবর, ও পেশ (vowel-points) দ্বারা উচ্চারণ নির্দ্দিষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহারা অবশ্য-প্রযোজ্য নহে। হিন্দীতে আরবী ফারসী শব্দগুলি লিখিবার সময় এই নিয়ম মানা হয় যে, যেখানে মূলে স্বরবর্ণ omitted বা লুপ্ত ছিল সেখানে হ্রস্ব স্বর ব্যবহার করিতে হইবে ; যথা, কিতাব, হুকুম ; এবং যেখানে মূলে স্বরবর্ণের ব্যবহার ছিল সেখানে দীর্ঘস্বর ব্যবহার

---

* আমাদের দেশেও পূর্ব্ববঙ্গে চ-এর এই ধ্বনিই প্রচলিত। বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ছ ও জ-এর উচ্চারণ যেমন ঠিক তালব্য নয়, পরন্তু ইংরাজী s ও z-এর ন্যায় দন্ত্য-তালব্য (পূর্ব্ববঙ্গে ছয় = soy, জাহাজ = zahaz), তেম্‌নি চ-এর উচ্চারণও ঠিক তালব্য নয়, দন্ত্য-তালব্য ; যথা, চ়াম, চ়াকু। পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক উচ্চারণেও দুই এক স্থলে জ ও চ-এর এই দন্ত্য-তালব্য উচ্চারণ পাওয়া যায় ; যথা, জোচ্চোর।

করিতে হইবে ; যথা, গরীব, শীকারী, রহীম, শীশী, চাকু, মহ্মূদ, ইত্যাদি। এই নিয়ম দেশীয় শব্দেও প্রযোজ্য ; যথা, ভাঈ, মীরাবাঈ, হিন্দু, বাবু,উর্দ্দু, ইত্যাদি। ইংরাজী দীর্ঘস্বরেরও মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় ; যথা, স্কুল, টীম। হ্রস্ব আ, হ্রস্ব এ এবং হ্রস্ব ও-কে অ দ্বারা বা অন্য কোন হ্রস্ব স্বর দ্বারা লিখা হয়, যথা, কপড়া, লড়কা, পঢ়না, অচ্ছা, খুদা। আবার দীর্ঘ অ-কে আ-কার দিয়া লিখা হয় ; যথা, কালিজ, নালিজ, রাবর্ট।

(৩) ইংরাজী bat ও goal-কে হিন্দীতে "বৈট" ও "গৌল" লিখা হয়। বস্তুতঃ সংস্কৃত ঐ এবং ঔ-এর পূর্ব্ব উচ্চারণ কি ছিল বলা কঠিন। Diphthongal "অই" বা "অউ" হইলে ইহাদের কোনই প্রয়োজন ছিলনা। বাঙ্গালাতে কৈ কই, বৌ বউ, উভয়বিধ প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় ঐ-ঔর প্রকৃত উচ্চারণ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এরূপ অবস্থায় উহাদের একাধিক উচ্চারণ স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। বড়ো, মতো প্রভৃতি যাঁহারা লিখেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে ইহাদের উচ্চারণ অ-কারও নহে ও-কারও নহে ; গৌল (goal)-এর ঔ-কারের মত। আমি গৌরুও দেখিয়াছি।

(৪) হিন্দীতে y-কে য (অর্থাৎ য়) এবং w-কে অন্তঃস্থ ব দ্বারা লিখা হয় ; যথা, Young যঙ্গ, William বিলিয়ম্। ফারসী ইয়া এবং ওয়াও যখন ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহা য এবং অন্তঃস্থ ব দ্বারা লিখা হয়। যথা, য়ার (ইআর—বন্ধু), বাস্তে (ওআস্তে—জন্য)। এই ব্যবস্থাও সঙ্গত বোধ হয়, কারণ war-কে যখন বাঙ্গালায় "ওয়ার" লিখি তখন মনে রাখা উচিত যে ইংরাজী এক syllable-এর কথাকে ভাঙ্গিয়া দুই syllable "o-yar" করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই, থাকিলে a war না হইয়া an war হইত। "ওয়ার" অপেক্ষা "ওআর" এবং তদপেক্ষা বরং "ওার" লিখা অধিক যুক্তিযুক্ত। শব্দের আদিতে ভিন্ন অ, আ, আসিতে পারিবে না, এ ব্যবস্থাই বা কোথা হইতে আসিল ? হিন্দীতে হুআ, গঈ লিখিতে ত বাধে না। ইহার জন্য আবার একটী ব্যঞ্জন "য়" আনিতে হইবে ?

পাটনা ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ Blair সাহেব আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন যে year ও wool এর যথার্থ উচ্চারণ য়িআর ও বূল। এড্‌বার্ড, রেল্‌বে প্রভৃতি এড্‌ওয়ার্ড, রেলওয়ে অপেক্ষা লিখিতেও সহজ।

কিন্তু বাঙ্গালাতে w স্থানে "ব" চালান মুস্কিল, কারণ আমরা দুইটী ব-কে একই প্রকারে লিখি ও b (বা ফারসী "বে")-এর মত উচ্চারণ করি। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মৈথিলী হইতে উৎপন্ন। উত্তর-বিহারে কথাবার্ত্তায় মৈথিলী ভাষা এবং পত্রাদিতে মৈথিলী লিপি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উভয়ই বাঙ্গালার সদৃশ। মহারাজ শ্রীহর্ষের হস্তাক্ষর দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহার সময়ে কান্যকুব্জেও বাঙ্গালার ন্যায় লিপি ছিল। তিব্বত ও শ্যামের লিপি বাঙ্গালার অনুরূপ। এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে বাঙ্গালা লিপি দেব-নাগরী অপেক্ষা প্রাচীন ও বহুবিস্তৃত। কিন্তু মৈথিলী লিপির সঙ্গে বাঙ্গালার এক গুরুতর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মৈথিলীতে "র" অক্ষরটী দেব-নাগরীর মতই লিখিত হয়, এবং দুইটী ব-এর পার্থক্য নির্দ্দেশহেতু একের নীচে বিন্দু দেওয়া হয়। দেবনাগরী "র" বঙ্গদেশে বিকৃত হইয়া ত্রিকোণাকার ধারণ করে। আমি ২।১ খানা প্রাচীন বাঙ্গালা দলিলে দেখিয়াছি "ব" ও "র" একই প্রকারে লিখিত হইত। তিনটী অক্ষরের (দুই "ব" ও এক "র") একই রূপ হইলে বড়ই অসুবিধা, তাই কোন কোন অঞ্চলে ব-এর পেট কাটিয়া "র" লিখিত হইতে লাগিল এবং আসামে ঐ রীতিই অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ ভুল করিয়া ব-এর নীচে বিন্দুদ্বারা র-এর রূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যাহার নীচে বিন্দু দিয়া নূতন উচ্চারণ দেখাইতে হইবে, তাহা ঐ উচ্চারণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়া চাই। ব ও র-এর মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। এখন মৈথিলী আদর্শে দুই ব-এর পার্থক্য নির্দ্দেশ করা কঠিন হইবে, কিন্তু দেবনাগরীর মত পেটকাটা বর্গীয় ব চালান যায়। মৈথিলীকে "a dialect of Hindi" গায়ের জোরে বলা হয়। ইহা dialect নয়, হিন্দীর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধও নাই।

ইহার সাহিত্য আছে এবং দুই এক খানা সাময়িক পত্রও আছে; শুধু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ইহা লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

দেবনাগরী লিপির একটা সুবিধা এই যে রু, রূ, ও সংযুক্তবর্ণের ক্ষ, ত্র, জ্ঞ, রেফ ও র-ফলা ব্যতীত অন্যত্র কোন রূপান্তর নাই। পূর্ব্ববর্ণের "পায়া" (।)-টা লুপ্ত করিয়া পরবর্ণের সম্পূর্ণরূপ তাহার সহিত যুক্ত করা হয়; যথা, ন্ + স = ন্স, প্ + স = প্স। যে সকল বর্ণের পায়া নাই, তাহাদের নীচে পরবর্ণের "মাত্রা" (—)-টা লুপ্ত করিয়া সংযুক্ত করা হয়। যথা, দ্ + ব = দ্ব, হ + ণ = হ্ণ। দেবনাগরীতে এই দুইটি নিয়ম সর্ব্বত্র প্রযোজ্য।* কিন্তু বাঙ্গালাতে আমরা ৎ, গু, শু, হু, হৃ, রু, রূ, ক্র, ত্র, ক্রু, ন্তু, স্তু, ক্ষ, ক্ক, ঙ্গ, ঞ্চ, জ্ঞ, ট্ট, ত্থ, ঙ্ক, ষ্ট, ঙ্খ, ভ্র, ষ্ম, হ্ন, ক্ষ্ম, স্তু, স্ত্র, দ্রু, দ্রূ, ত্রু, ত্রূ, য-ফলা, রেফ, র-ফলা ইত্যাদি লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া থাকি। এই ৩০।৩২টা অতিরিক্ত রূপ শিখিতে ও শিখাইতে আমাদের বড়ই হয়রাণ হইতে হয়। মুদ্রকের ও টাইপ-রাইটারের অসুবিধার কথা তো ছাড়িয়াই দিতেছি।......

পত্র দীর্ঘ হইয়া গেল। হিন্দীর যতগুলি বৈশিষ্ট্য আমি দেখাইলাম সকলই বাঙ্গালাতে সম্ভব বা সঙ্গত তাহা আমি বলি না। কিন্তু বাণান-সমিতির কর্ত্তাদের হিন্দীর দুইটা জিনিষই চোখে পড়িয়াছে (রেফের পর দ্বিত্ব বর্জ্জন ও শংকা, শাংত ইত্যাদি), যাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। হিন্দীর চতুর্দ্দিক্ লক্ষ্য করিয়া উহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করিবার তাঁহাদের সময় বা সুবিধা হয় নাই। হিন্দীতেও রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ও অনুস্বারস্থলে বর্গের পঞ্চমবর্ণ অবশ্য-বর্জ্জনীয় নয়। এখনও অনেকে, বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা, অর্দ্ধ, সর্ব্ব, শঙ্কা, শান্ত লিখেন।...... ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

---

* দেবনাগরীতে দুইটার অধিক ব্যঞ্জন প্রায় একত্র সংযুক্ত হয় না। তাই "দৃষ্ট্বা" স্থলে "দৃষ্ট্‌বা", "অস্ত্য" স্থলে "অস্ত্‌য" প্রভৃতি লিখা হয়। আবার, "তান্ যঃ পশ্যতি"-কে "তান্যঃ পশ্যতি" লিখিতেও দেখিয়াছি।

(২) মধুবাণী

২৩শে মে, ১৯৩৮

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার লেখাটী আপনার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আপনি যে কষ্টস্বীকার করিয়া আমার দীর্ঘ পত্র পাঠ করিয়াছেন এবং নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার মতে সাধুভাষা ও চলিত ভাষা নামক দুইটী লেখ্য ভাষা একই দেশে একই যুগে চালাইতে চেষ্টা করা উচিত নয়। অনেকে বলেন উচ্চাদর্শের ভাব প্রকাশ করিতে সাধুভাষা, ও তরল সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োজন। কিন্তু আমার মতে উভয় ক্ষেত্রেই এক সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা রাখা উচিত, কিন্তু শৈলী (style) বিভিন্ন হইতে পারে। কোন রচনা সংস্কৃতশব্দসমাসবহুল ও কোন রচনা সহজ সরল প্রচলিত শব্দ-সম্পন্ন, অথবা কোন রচনা জটিল ও যৌগিক বাক্যে পূর্ণ ও কোন রচনা সরল বাক্যে পূর্ণ হইতে পারে; অর্থাৎ যে স্থলে এক্ষণে বঙ্গদেশে দুইটী ভাষা চলিতেছে, তৎপরিবর্ত্তে আমি এক ভাষা ও বহু শৈলী প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। সাধুভাষাই এই পদের অধিকারী; কারণ স্কুলকলেজে আগাগোড়া সাধুভাষা লিখিয়া পড়িয়া ঐ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গেলেই তাহা "পণ্ডিতী বাঙ্গালা" নামে উপহসিত হইবে কেন? চলিত ভাষা চালাইতে হইলে কোন্ জেলার ভাষাকে আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে তাহার বিবাদ উঠে। "চলিত ভাষা" নামে চালিত বাঙ্গালা সাধুভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার শব্দাবলী পৃথক্, ব্যাকরণ পৃথক্, ক্রিয়াদি পদের রূপও পৃথক্। এই contrast "চলন্তিকা"-র পরিশিষ্টে দেখান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী ভাষা যদি বাঙ্গালা হয়, তবে অন্যটী বাঙ্গালা নহে। আমি কয়েকটী

ভাষার সহিত পরিচিত আছি—বাঙ্গালা সংস্কৃত ইংরাজী, এবং অবসর-বিনোদ হিসাবে হিন্দী, উর্দ্দু, ও ফারসীর যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি। ইহাদের কোনটিতেই সাধু ও অসাধু দুইটি ভাষা parallel চলিতে দেখি নাই। ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষাতে কি ব্যবস্থা আছে তাহা আপনি বলিতে পারেন। সব ভাষাতেই অপভ্রংশ শব্দ আছে। কিন্তু ইংরাজী প্রভৃতি ভাষাতে এরূপ দেখা যায় না যে একই দেশে একই যুগে মূলশব্দ ও অপভ্রংশ সাথে সাথে চলে। যাহার অপভ্রংশ চলে তাহার মূল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় কিন্তু হাজার হাজার শব্দ আছে যাহার মূল ও অপভ্রংশ দুইই চলে। অনেক অপভ্রংশ শব্দের আবার একাধিক রূপ দেখা যায়; যথা, কাণ, কান; বিয়ে, বে; বাড়ী, বাড়ি; বউ, বৌ। সত্য বটে সব ভাষাতেই একাধিক কথ্য প্রাদেশিক রূপ (dialect) আছে। উহাদের প্রয়োগ কখন কখন নাটক উপন্যাসাদিতে অশিক্ষিতদের মুখে "পরবাক্যে" দৃষ্ট হয় মাত্র। বাঙ্গালাতে চলিত ভাষার ততোধিক মর্য্যাদা দেওয়া সঙ্গত নয়।

অনেকে আজকাল উচ্চ ভাবের রচনাও চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি চলিত ভাষাই চালাইতে হয় তবে সর্ব্বাগ্রে সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে তাহাদের ভাষা পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করা উচিত। অনেক ছাত্র উভয় ভাষাতেই দক্ষ, কিন্তু পরীক্ষক কোন্ ভাষা পসন্দ্ করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারে না। সুতরাং একটীকেই ভাষার standard করা উচিত। নতুবা বাঙ্গালা ভাষা এরূপ ভাষায় পরিণত হইবে যাহার ব্যাকরণের ঠিক নাই, বাণানের ঠিক নাই, উচ্চারণের ঠিক নাই, বিন্যাস (syntax)-এর ঠিক নাই। এরূপ ভাষা সাহিত্যসম্পদে সমৃদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু উহা বিদেশীদিগকে শিখিতে অনুরোধ করিতে পারি না।……

নমস্কার জানিবেন। ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

[অধ্যাপক ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা মহাশয়ের সহিত]

(লেখকের পত্র)

কলিকাতা

১৭শে বৈশাখ, ১৩৪৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন আপনার সঙ্গে আমার পত্রব্যবহার হয় নাই। বছর দুই পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালা বাণান লইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা আমার করিতে হইয়াছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়োজিত বাণান-সমিতির প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আপনার নিকট দুই একখানি ছোট্ট চিঠি পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু আজ অনেকদিন পরে এই বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"-তে আপনার বাঙ্গালা-বাণান-সম্পর্কীয় প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আপনাকে চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে আপনার এবারকার প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যতগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন সবগুলি সম্বন্ধেই যে

আমি আপনার সহিত একমত তাহা নহে; কিন্তু বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলীর মধ্যে যে সমস্ত অসঙ্গতি ও ক্রটী আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এখন প্রকাশ করিয়াছেন, এই সমস্ত অসঙ্গতি ও ক্রটীর বিরুদ্ধেই আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। উঁহারা সাধুভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত রূপেও যত্র তত্র বিকল্পের বিধান করিয়াছেন, আর কথ্যভাষাতে ত নিয়ন্ত্রণের পরিবর্ত্তে একেবারে বিকল্পের ছড়াছড়ি করিয়া ছাড়িয়াছেন; আবার কোন কোন স্থলে, যেমন রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব ও মূর্দ্ধন্য ণ বিষয়ে, কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রায় সঙ্কল্প প্রদর্শন করিয়াছেন। বাণান-কমিটির এই বিকল্প-বিলাস এবং সঙ্কল্পের অত্যাচারের অসঙ্গতি ও অশোভনতাই আমি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আজ অনেকদিন বিলম্বে হইলেও এবিষয়ে আপনার ন্যায় বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের সমর্থন লাভে যথার্থই আনন্দিত হইয়াছি।* শুধু এইটুকু অনুযোগ করিবার ইচ্ছা মনে জাগে যে বহুপূর্ব্বেই এই সব মন্তব্য সুস্পষ্টভাবে আপনার করা উচিত ছিল—তাহা হইলে হয়ত এই সমস্ত প্রস্তাবাবলীজনিত অনিষ্ট অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত।

---

* "বানান ব্যুৎপত্তিসঙ্গত কিংবা ধ্বনিসঙ্গত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি বানান কিছু ব্যুৎপত্তিসঙ্গত, কিছু ধ্বনিসঙ্গত হয়, তবে তাহা খামখেয়ালি হইবে মাত্র, বৈজ্ঞানিক নিয়ম হইবে না। ······তবে বানানের ভয়ানক অনিয়ম হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মে সেই অনিয়মই ঘটিয়াছে। ইহা আমি দেখাইতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় ১০নং নিয়মে বলিতেছেন, 'মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ ষ বা স হইবে; যথা, আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), ইত্যাদি'। ইহা ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু ৭নং নিয়মে তাঁহারা বলেন, 'অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে; যথা, কান, সোনা, ইত্যাদি'। অথচ ব্যুৎপত্তির জন্য কাণ (কর্ণ), সোণা (স্বর্ণ), এইরূপ বানানই সঙ্গত। ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বলিয়া শ, ষ, স চলিবে, অথচ ণ চলিবে না—এ কি নিয়ম? হয় উভয়ক্ষেত্রেই বানান ধ্বনিসঙ্গত হইবে, না হয় ব্যুৎপত্তিসঙ্গত হইবে।

আরও মজার কথা, কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় 'এ-ও হয়, ও-ও হয়' এই রকম স্বেচ্ছাচারের নিয়ম বা অনিয়ম করিয়াছেন। তাঁহারা ৫ নং নিয়মে বলেন, 'যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে, তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে।' ······ইহারও ব্যতিক্রম (exception) আছে।

কারণ অনিষ্ট কিছু যে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার নহে। যদিও তৎকালীন আন্দোলনের ফলে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ এবং শেষটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই সব নূতন বাণান "জোরের জোরে" চালাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি বাণান-কমিটির কার্য্যকলাপের ফলে বাণান-বিভ্রাট যে অনেক পরিমাণে ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। আজকাল দেখিতে পাইবেন যে একই মাসিক পত্রিকায় হয়ত কতক প্রবন্ধে "আশ্চর্য স্টাইল"-এর বাণান ও অন্যান্য প্রবন্ধে প্রচলিত রীতির বাণান, পাশাপাশি চলিয়াছে। রবিবাবুর নিজের সাংস্কারিক উৎসাহও দেখিতেছি সম্পূর্ণটাই রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব কর্ত্তনেই নিয়োজিত—বাণান-কমিটির অন্যান্য প্রস্তাবে মনোযোগ দেওয়ার কোন

---

৬ নং নিয়মটি বেশ কৌতূহলজনক। তাহাতে আছে, 'এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।' এই বানানগুলি ধ্বনিসঙ্গত। কিন্তু ব্যুৎপত্তি ধরিলে য লেখা উচিত।......

তাঁহারা তো ঈ ঊ স্থানে বিকল্পে ই উ ব্যবস্থা করিলেন, অথচ ১নং নিয়মে বলিতেছেন, 'রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না।' এখানে পাণিনি প্রভৃতি সমস্ত বৈয়াকরণ বিকল্পে দ্বিত্ব বিধান করেন। ফলে দাঁড়াইতেছে অর্চ্চনা, কর্ত্তা প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে বিশুদ্ধ হইলেও, তাঁহাদের নিকট অচল!

চলিত বাঙ্গালার ক্রিয়াপদের বানান সম্বন্ধে তাঁহারা ১১ নং নিয়মে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন। এখানে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহারা হব বা হবো, শোব বা শোবো, লিখব বা লিখবো, উঠব বা উঠবো এই রকমই বিধান দিয়াছেন; কিন্তু হ'ল, শুল, উঠল, হ'ত, শুত, উঠত প্রভৃতি স্থলে অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হইলেও বিকল্পে ও-কারের বিধান দেন নাই। ইহার কারণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তাঁহারা বলেন, 'লাম বিভক্তি স্থলে লুম বা লেম লেখা যাইতে পারে;' অর্থাৎ হ'লাম হ'লুম, হ'লেম তিন রূপই হইতে পারে। যদি সকল বাঙ্গালাভাষীর মনস্তুষ্টির জন্য এইরূপ বিকল্পের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে করছে, কচ্চে, কর্‌তেছে, কর্‌তে আছে এইরূপগুলি কেন বিকল্পে ব্যবহার্য্য হইবে না?......

তাঁহারা 'তুমি কর, লেখ, ওঠ' ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার দেন না। কিন্তু ক'রো, লিখো, উঠো ইত্যাদি স্থলে অন্ত্য ও-কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতে দেখিলে লেখ = প্রাচীন লিখহ, এবং লিখো = প্রাচীন লিখিহ। কাজেই ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতেই হউক বা উচ্চারণের দিক্ হইতেই হউক, লেখ, লিখো—উভয় স্থানেই অন্ত্যস্বর একরূপেই বানান করা উচিত।......

আবশ্যকতা তিনি দেখিতেছেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ "ঢাকি," "কেরানি," "ইংরেজি", "বিলেতি", "বুড়ি," ইত্যাদি লঘুস্বরান্ত বাণানই চালাইতেছেন। এবারকার "প্রবাসী"-তে রবিবাবুর প্রথম কবিতাটিতেও দেখিবেন যে "হাতী-হাতি" যুগপৎ পাশাপাশি গজেন্দ্রগমনে বিচরণ করিতেছে। অর্থাৎ লাভের মধ্যে হইয়াছে এই যে কথ্যভাষার যে রূপবাহুল্য, "গেলুম" "গেলেম" "গেলাম", "করছে" "কোরছে" "কচ্ছে" কচ্চে," ইত্যাদি, তাহা ত আগের মত উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই চলিতেছে, উপরন্তু সাধুভাষায় যে সব স্থলে এক রূপই সাহিত্যে চলিত ছিল সেখানেও নানাবিধ রকমারি রূপের আমদানী হইয়াছে। ঠিক এমনটিই আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এবং ঘটিয়াছেও অবিকল তাহাই। রকমসকম দেখিয়া মনে হইতেছে যে আজকালকার কোন কোন উদীয়মান নব্য "স্মার্ত্ত" (অর্থাৎ smart) লেখক নয়া বাণান ব্যবহার করাই সাহিত্যিক তরুণিমার লক্ষণ মনে করিতেছেন—ওদিকে কিন্তু যত্ব-ণত্ব হ্রস্ব-দীর্ঘ সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔদাসীন্য অপরিমেয় (এবং হয়ত অজ্ঞতাও অগাধ)। সুতরাং বাণান-কমিটির দৌলতে এই অনর্থক বাণান-বিভ্রাটটি বাঙ্গালা ভাষার উপরে বেশ রীতিমতই চাপিয়া বসিয়াছে।

সে যাহা হউক, এখনও আপনার ন্যায় পণ্ডিতগণ এবিষয়ে অবহিত ও সতর্ক হইলে বোধ করি শ্রাদ্ধ আর অনেক দূর গড়াইবেনা। আর এ শ্রাদ্ধ যে একেবারেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। কারণ বাঙ্গালা সাধুভাষাতে এমন কোন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ নং নিয়মে বিকল্পে কাল, কালো, ভাল, ভালো; মত মতো; ইত্যাদি লেখার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)—এইরূপ বানানের বিধান করিয়াছেন।······বলা হইয়াছে যে কলিকাতা অঞ্চলে কাল (সময়) এবং কাল (কল্য) ইত্যাদি শব্দযুগলের উচ্চারণে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্বস্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য আছে, এবং তাহাদের ব্যুৎপত্তিও ভিন্ন। এজন্য আমরা এস্থলে কলিকাতার উচ্চারণ গ্রহণ করিতে পারি না। কলিকাতায় অনেকে ঘোঁড়া, ঘাঁস, ঝাঁ্যাটা, কাঁকড়া বলেন; প্রায় সকলেই করলুম, খেলুম বলেন। আমরা কিন্তু এই উচ্চারণ বা বানান মাথা পাতিয়া লইতে পারি না।" ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা, "বাঙ্গালা বাণান-সম্পর্কে কয়েকটি কথা" ("প্রবাসী", বৈশাখ ১৩৪৬)।

গুরুতর বাণান-বিশৃঙ্খলা নাই, যাহাতে ভয়ানক বিব্রত হইবার কোন কারণ ঘটিতে পারে—সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে ত নাই-ই, এমনকি অধিকাংশ তদ্ভব এবং দেশজ শব্দেও নাই। আমার পূর্ব্বের আলোচনায় তাহা দেখাইয়াছি।

আছে কথ্য বা মৌখিক ভাষায়—মৌখিক উচ্চারণগুলি স্বভাবতঃই নানাবিধ এবং নানালোকে নানাভাবে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং মৌখিকরূপের নানাবিধ shades and nuances of sound থাকিবেই, এবং ক্রমশঃ তাহার পরিবর্ত্তন হইবেই। সাধু সাহিত্যে যদি এই সব মৌখিক রূপ বহুলপরিমাণে আমদানী করা হয়, তবে এই বাণান-বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। বহু চেষ্টার ফলে যদি কোন নিয়ম আজ বাঁধিয়া দেওয়াও যায়, উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে কালই সে নিয়ম ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিংবা কৃত্রিম হইয়া দাঁড়াইবে। এই কারণেই মৌখিক বা colloquial রূপ, এবং নানাবিধ প্রাদেশিক বা dialectical রূপ সাধুসাহিত্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। এই কারণেই আমি পূর্ব্বের আলোচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলাম, "সাধু বাঙ্গালা ত আর কোন অপরাধ করে নাই—বঙ্গভাষাভাষীদিগের নানাবিধ প্রাকৃত বুলি বা dialect-এর একটা সর্ব্বজন বোধ্য common form বা common forum সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র!" আমি খুবই সুখী হইয়াছি যে এতদিন পরে বন্ধুবর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধুভাষা বনাম কথ্য-ভাষার দ্বন্দ্বপ্রসঙ্গে sanity-র দিকে ফিরিয়া আসিয়াছেন।* আশা করি এই বাণান-বিভ্রাট ব্যাপারেও অচিরেই তিনি অনুরূপ sanity প্রদর্শন করিবেন।

যাক্। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এপ্রসঙ্গে অনাবশ্যক। যে সমস্ত detailed suggestion আপনি দিয়াছেন—কোন কোন বাণান-সম্বন্ধে—তাহা আলোচনার যোগ্য। এই সব বিষয়ে আমার মতামত আপনার অনেকটা জানাই আছে—পুনরুল্লেখ বোধ করি নিষ্প্রয়োজন। শুধু ছোট্ট দুই একটা বিষয়ে কিছু বলি—পূর্ব্বে এবিষয়ে আমি কিছু বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কুমিল্লা অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

একটি হইল চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ বিষয়ে। আমার মনে হয়—এবং আপনিও বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—যে রাঢ়দেশ কিঞ্চিৎ চন্দ্রাহত; সুতরাং চন্দ্রবিন্দুর কিঞ্চিৎ ছড়াছড়ি তথায় স্বাভাবিক; যেমন, ঘোঁড়া, ঘাঁস, প্রভৃতি। কিন্তু এসব স্থলে চন্দ্রবিন্দুর কোনই কারণ নাই। তাছাড়া, সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমার মনে হয় যে যেখানে মূল শব্দে অনুনাসিক নাই, সেখানে তদ্ভব শব্দেও চন্দ্রবিন্দু থাকা উচিত নহে; যেমন, "ইষ্টক" হইতে "ইট", "উষ্ট্র" হইতে "উট", প্রভৃতি। মূলে অনুনাসিক থাকিলে অবশ্য চন্দ্রবিন্দু থাকাই উচিত। (ইট, উট শব্দে আপনি চন্দ্রবিন্দু কেন আনিতে চাহেন তাহা ভাল বুঝিলাম না—এ প্রসঙ্গে হিন্দী উচ্চারণের সার্থকতা কি ? *)

দ্বিতীয় "গণ" শব্দের ব্যবহারে। আমার মনে হয় যে বাঙ্গালায় বহুবচনবাচক "রা" "গুলি" ইত্যাদি বিভক্তি ত আছেই (এবং সম্ভবতঃ "গুলি" বিভক্তিটি "গণ" হইতেই আগত); কাজেই "গুণীরা" "নেতারা" "বিদ্বানেরা" "পক্ষীগুলি" ইত্যাদি আমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইতে পারি—সংস্কৃত "গণ" শব্দ লইয়া টানাটানি করিবার আবশ্যকতা নাই। একটু গুরুগম্ভীর ভাষাতেই "গণ" ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথায় আমার মনে হয় সংস্কৃত প্রয়োগানুসারে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ভাবেই উহার ব্যবহার হওয়া উচিত—সুতরাং "গুণিগণ" "নেতৃগণ" "বিদ্বদ্গণ" "মহাত্মগণ" লেখাই ভাল—দেখায়ও ভাল, শুনায়ও বেশ গুরুগম্ভীর। তাছাড়া, সংস্কৃতে "মাতৃগণ" "পিতৃগণ" প্রভৃতির ব্যবহার এত সুপরিচিত, যে সেই একই শব্দ বাঙ্গালাতে "মাতাগণ" "পিতাগণ"-রূপে লেখা অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং আমার মনে হয় অসঙ্গত।† ("সকল"

---

* "ভাষাতত্ত্ব ও উচ্চারণের অনুরোধে বাঁকা (প্রাকৃত বঙ্ক), খাঁটি (প্রাচীন বাং খান্টি), খুঁটি (প্রাচীন বাং খুন্টি), ইঁট (হিন্দী ইঁটা), উঁট (হিন্দী উঁট) প্রভৃতি শব্দেও চন্দ্রবিন্দুর বিধান আবশ্যক।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

† "আমাদের বিবেচনায় এখানে সম্বন্ধ-তৎপুরুষ না মানিয়া 'সকল' শব্দের ন্যায় 'গণ' বহুবচনের চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য; যেমন, চাঁদাদাতাগণ, বিদ্বানগণ, পক্ষীগণ, মহাত্মাগণ।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

শব্দও সংস্কৃত, তবে বিশেষণরূপেই উহার ব্যবহার; বাঙ্গালার ন্যায় উহার "সমূহ" অর্থে বিশেষ্য-প্রয়োগ—যেমন, ব্যাঘ্রসকল—ততটা দেখা যায় না।)

লিপ্যন্তর বিষয়ে আপনি সামান্য একটু আলোচনা করিয়াছেন। আমিও পূর্ব্বে এবিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি—বোধ করি আপনার স্মরণ আছে। তবে বাঙ্গালা ভাষার বাণান আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার গুরুত্ব খুব বেশী নহে। এবারকার প্রবন্ধে আপনি "z" কে "য" দিয়া প্রকাশ করিবার একটা প্রস্তাব করিয়াছেন। * আমার যতদূর মনে পড়ে, বাণান-কমিটির এক অধিবেশনেও আপনি এই আলোচনা তুলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে "Aurangzeb"-কে আপনি "ঔরঙ্গযেব" লেখেন। এই প্রস্তাবের অসুবিধা কি জানেন? বাঙ্গালা উচ্চারণে য-এর উচ্চারণ জ-এর ন্যায়। সুতরাং আপনি "য" দিয়া লিখিলেও পাঠক উহাকে z-এর ন্যায় পড়িবে না, পড়িবে জ-এর ন্যায়ই; কারণ ঐরূপ দুই একটি transliterated শব্দ ব্যতীত আরও ত অজস্র য-ওয়ালা শব্দ ভাষাতে রহিয়াছে, যেমন, যে, যাহা, যন্ত্র, যামিনী, ইত্যাদি, তাহাদের যেরূপ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে, পাঠক আপনার "ঔরঙ্গযেব"-এরও সেইরূপ উচ্চারণই করিবে। সুতরাং ধ্বনি পৃথক্‌করণের যে চেষ্টা আপনি "য" ব্যবহার দ্বারা করিতে চাহেন, তাহা সফল হইবে না। সে দিক্ দিয়া দেখিলে, জ-এর নীচে ফুট্‌কি দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা বেশী ফলপ্রদ, কারণ জ-এ ফুট্‌কি কোন প্রচলিত অক্ষর নহে, একেবারেই নূতন চিহ্ন, সুতরাং লোকে প্রথম হইতেই নূতন উচ্চারণ করিতে শিখিবে, জানিবে যে জ় = z। তবে এসম্বন্ধে আমার আসল বক্তব্য এই যে সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে জনসাধারণের জন্য এত সূক্ষ্মতা বা refinement-এর কোনই আবশ্যকতা নাই—জ-এর

* "যদি বিদেশী শব্দে z-এর জন্য 'য' ব্যবহার হয় তবে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপিতে Azes স্থানে 'অযস' পাওয়া যায়। আপত্তি হইবে যে য-কারের প্রকৃত উচ্চারণ z নয়। আমি বলিয়াছি সুবিধার জন্য 'য' ব্যবহার করিতে।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

ব্যবহারেই স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। দিল্লী যদি Delhi দ্বারা চলিতে পারে, ঢাকা যদি Dacca দ্বারা চলিতে পারে, Zebra তবে "জেব্রা" দ্বারা কেন চলিবে না? আর যদি পূর্ব্ববঙ্গীয় জ-এর উচ্চারণ ধরেন, তবে ত "জ" একেবারেই "z"—"জাহাজ"-কে আমরা বাঙ্গালরা বলি "zahaz"!

আর একটা কথা। একস্থানে আপনার যেন একটু ভুল হইয়াছে মনে হইল। আপনি লিখিয়াছেন "ক'নে (কন্যা), খ'ল (খইল) প্রভৃতি শব্দে অ-কারের উচ্চারণ জার্ম্মাণ Schön, Höll (Hölle?) প্রভৃতির অভিশ্রুত ওকারের সমান।" আমার ত তাহা মনে হয় না। জার্ম্মাণ ö (o umlaut) যখন দীর্ঘ হয়, তখন উহা আদিতে ও-ভাবাক্রান্ত হইলেও শেষটা এ-তে পর্য্যবসিত হয়, এবং মোটামুটি বলিতে গেলে এ-ধ্বনিটাই উহার lasting এবং predominant ধ্বনি—সুতরাং Schön-এর উচ্চারণ কতকটা "শ্বেন্"-এর ন্যায় (ব-ফলার উচ্চারণ অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ ধরিতেছি)। আর হ্রস্ব ö-এর উচ্চারণও প্রায় ঐরূপই, তবে হ্রস্ব; এবং হ্রস্ব হওয়ার দরুণ কতকটা ইংরাজী "her"-এর ধ্বনির মত অর্থাৎ "হ্রস্ব আ"-র মত শুনায়; অর্থাৎ, Hölle-এর উচ্চারণ ইংরাজী "Helle" কিংবা "Hulle" কিংবা ইহাদের মাঝামাঝি অতি সংক্ষিপ্ত একটা কিছু ধ্বনি। কিন্তু বাঙ্গালার ক'নে কিংবা খ'ল, ইহাদের অ-কারের ধ্বনি জার্ম্মাণ হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ ö-এর কোনটার মতই নহে। বরং, একেবারে ঠিক রেশটি পাওয়া না গেলেও, ইহাদের উচ্চারণ "কোনে" এবং "খোল"-এরই অনুরূপ। তাছাড়া, "বসিয়া" স্থলে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যরূপ "বোসে" হইলে, "কন্যা" (অর্থাৎ কন্+য়া) স্থলে কথ্যরূপ "কোনে" লেখা অসঙ্গত নহে। *

শুধু ধ্বনি-প্রসঙ্গেই আমি এই মন্তব্যটি করিলাম। আসলে, "বোসে" "কোনে" এই উভয় স্থলেই "ব'সে" "ক'নে" লেখা আমি পছন্দ করি—

* " 'ক'নে ঘরের কোণে ব'সে আছে' এই বাক্যে ক'নে ও কোণে এই দুই শব্দের উচ্চারণ আমার কাছে এক নয়। কাজেই 'ব'সে' (বসিয়া) স্থানে 'বোসে' লেখা চলে; কিন্তু 'ক'নে' স্থানে 'কোনে' লেখা চলিবে না।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

এমন কি "বসে" "কনে" লিখিতেও আমার আপত্তি নাই—প্রসঙ্গ বা context আলোচনা করিলেই ঠিক উচ্চারণটি পাঠক ধরিতে পারেন। বস্তুতঃ মৌখিক ভাষার এই সব সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তমান ধ্বনি চিহ্নদ্বারা প্রকাশ করাই দুরূহ। আর আপনার প্রস্তাবানুযায়ী ও-কার ব্যবহার করিলেই যে সব গোলমালের অবসান হইবে বা অনিশ্চয়তা দূরীভূত হইবে এমন নহে;* কারণ, "পোড়ে" লিখিলে কি বুঝিব? পড়িয়া—প'ড়ে—পোড়ে, না, পুড়িয়া যায়—পোড়ে? "মোরে" লিখিলে কি বুঝিব? মরিয়া—ম'রে—মোরে, না, আমাকে—মোরে? "ভোরে" লিখিলে কি বুঝিব? ভরিয়া—ভ'রে—ভোরে, না, প্রভাতে—ভোরে? কাজেই ambiguity একেবারে দূর করিবার কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। যতটা মূল ধাতুর সহিত, ব্যুৎপত্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাণান করা যায়, ততটাই মঙ্গল।

সে যাহাই হউক, আলোচনা এই খানেই সাঙ্গ করা যাউক। আমার মতামত আপনার অনেকটা জানাই আছে। আমি শুধু বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি ইহা দেখিয়া যে বাণান-কমিটির প্রধান প্রধান প্রস্তাব বিষয়ে—যথা, রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব, মূর্দ্ধন্য ণ, হ্রস্ব-দীর্ঘ, লাম-লুম-লেম, ইত্যাদি সম্বন্ধে—এতদিন পরে আপনার নিকট হইতে আমার মতের সমর্থন পাইলাম। আপনাকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

---

* "করিয়া, বলিয়া, হইয়া ইত্যাদি পদের চল্‌তি রূপে কোরে, বোলে, হোয়ে লেখা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় অন্যত্র যেখানে অভিশ্রুতি (umlaut)-এর জন্য আদ্য স্বরে ও-কার উচ্চারণ হয়, বানানে ঊর্দ্ধকমা ব্যবহার না করিয়া সোজাসুজি ও-কার ব্যবহার করা উচিত।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

["প্রবাসী"-র সহিত]

("প্রবাসী"-র সম্পাদকীয় মন্তব্য)

বৈশাখের "প্রবাসী"-তে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান্ ও অবশ্যপাঠ্য "রবীন্দ্র-জীবনী"-র কিছু পরিচয়দান উপলক্ষ্যে ঐ পুস্তকের কিছু দোষ ত্রুটি উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে "সর্ব্ব" "পূর্ব্ব" "কর্ত্তৃক" ইত্যাদি শব্দের বানানে রেফের নিম্নস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব লোপের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। ইহা সত্য যে, আমরা "সর্‌ব" বলিনা, বলি "সর্‌ব্ব"; সুতরাং বানান উচ্চারণের অনুযায়ী করিতে হইলে, "সর্ব্ব" লেখাই উচিত। কিন্তু আমরা লিখি "তর্ক", কিন্তু উচ্চারণ করি "তর্‌ক্ক", "তর্‌ক" বলি না; লিখি "স্বর্গ", কিন্তু বলি "স্বর্গ্‌গ"; ইত্যাদি। অতএব আমাদের বানানে ও উচ্চারণে সকল স্থলে সঙ্গতি নাই দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে

আমাদের বোধ হয়, কেবল সেই সব স্থলেই রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রাখা ভাল যেখানে ব্যুৎপত্তি বুঝাইবার জন্ত তাহা আবশ্যক। অন্য সব স্থলে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব পরিহার করা ভাল—উচ্চারণ যাহাই হউক।

"বানান" কথাটি কেহ কেহ লেখেন "বাণান"। তাহার কারণ বোধ হয় তাঁহাদের মতে শব্দটি "বর্ণন" শব্দ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু উহা কি প্রস্তুত করা, রচনা করা, তৈরি করা যে "বানানো" শব্দটির অর্থ তাহারই রূপান্তর হইতে পারে না? ইংরাজীতে যেমন word-building শব্দের প্রয়োগ আছে, তেমনি আমরাও মনে করিতে পারি, "বানান" দ্বারা আমরা দেখাই কি কি বর্ণের বা অক্ষরের সহযোগে এক একটি শব্দ "বানানো" বা তৈরি করা বা রচনা করা হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪।

(লেখকের পত্র)

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"-তে বাঙ্গালা বাণান সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত সংখ্যাতেই ঐ বিষয়ে সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গেও একটু আলোচনা দেখিলাম।

বিবিধ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। রেফের পরে বাঙ্গালাতে প্রচলিত বর্ণদ্বিত্ব সম্বন্ধে স্বীকার করা হইয়াছে যে দ্বিত্ব হওয়াই উচ্চারণ-সঙ্গত—বাণান উচ্চারণের অনুযায়ী করিতে হইলে "সর্ব্ব" লেখাই উচিত, "সর্ব" নহে। আমার প্রবন্ধেও এবিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তারপর সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হইয়াছে যে, যেহেতু সর্ব্বত্র বাঙ্গালাতে রেফের পরে উক্ত প্রকার দ্বিত্ব ব্যবহৃত হয় না, যেমন স্বর্গ্‌গ, তর্ক্ক, এইরূপ লেখা হয় না, সুতরাং যেখানে বর্ণদ্বিত্বই প্রচলিত সেখানেও দ্বিত্ব তুলিয়া দেওয়া উচিত।

এই যুক্তি ঠিব সমীচীন মনে হয় না; বরঞ্চ ঠিক উচ্চারণানুযায়ী বাণানই আদর্শ ধরিতে গেলে, এবং logical হইতে গেলে বলা উচিত যে যেখানে দ্বিত্ব ব্যবহৃত হয় না, সেখানেও হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় বাণান-কমিটিও বলেন যে উচ্চারণানুযায়ী বাণানই তাঁহাদিগের লক্ষ্য, তবে এক্ষেত্রে তাঁহাদের বিপরীত দিকে উৎসাহ কেন?

যাহা হউক, ভাষার প্রয়োগ ঠিক logical কোথাও হয় না—জোর করিয়া ঠিক logical করিবার চেষ্টাও পণ্ডশ্রম। তাই আমার নিজের বক্তব্য—যাহা আমার প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তাহা এই যে, যে যে স্থলে বর্ণদ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না, সেখানে না-ই হইল, এবং যে যে স্থলে বর্ণদ্বিত্বই বাঙ্গালাতে একমাত্র প্রচলিত প্রয়োগ সেখানে বর্ণদ্বিত্বই চলিতে থাকুক। বিশ্ববিদ্যালয় বাণান-কমিটি কর্ত্তৃক জোর করিয়া প্রচলিত বর্ণদ্বিত্ব বর্জ্জনের প্রস্তাবকে এই কারণেই আমি অনুমোদন করিতে পারি নাই—কারণ যে বাণান ব্যাকরণসঙ্গত, উচ্চারণসঙ্গত, এবং একমাত্র প্রচলিত বাণান, তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে একথা একান্ত অশ্রদ্ধেয়। মোট কথা, প্রচলিত প্রয়োগই ভাষার রূপের চরম প্রমাণ। ব্যাকরণানুসারে অশুদ্ধ অনেক শব্দও শুধু প্রচলনের ফলে শিষ্টপ্রয়োগ হইয়া গিয়াছে; আর শুদ্ধ শব্দগুলি প্রচলন সত্ত্বেও আজ হঠাৎ "জোরের জোরে" অশুদ্ধ বনিয়া যাইবে, এরূপ অদ্ভুত হাস্যকর ধারণা তাঁহাদের মস্তিষ্ক কিরূপে গজাইল আমি ত ভাবিয়া পাই না।

"বাণান" শব্দের বাণান সম্বন্ধেও সম্পাদকীয় মন্তব্যে কিছু বলা হইয়াছে; এবং একটি অনুমান করা হইয়াছে যে হয়ত তৈয়ারী করা অর্থে "বানানো" শব্দেরই উহা রূপান্তর; এবং হয়ত সেই জন্যই অনেকে এই শব্দটিকে "বানান" রূপে লেখেন। কিন্তু বস্তুতঃ "বাণান" শব্দের ব্যুৎপত্তি মোটেই আন্দাজ বা অনুমানের বিষয় নহে—"বানানো"-র সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। একটু প্রয়োগ অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। কোন শব্দের বর্ণ-যোজনা বা বর্ণ-বিশ্লেষণ কর, ইহা বুঝাইতে, "অমুক শব্দকে

বানাও” এইরূপ বলে না, “অমুক শব্দের বাণান কর” এইরূপ বলে ; “অমুক শব্দ বানাইয়াছিলাম”, এইরূপ বলেনা, “অমুক শব্দের বাণান করিয়াছিলাম” এইরূপ বলে। “বানানো”-র উচ্চারণ স্বরান্ত, “বাণান”-এর উচ্চারণ হসন্ত। “বানানো”-র ইংরাজী প্রতিশব্দ making বা made, ইহা gerund কিংবা past participle ; “বাণান” শব্দটি একেবারেই বিশেষ্য। “বাণান” শব্দটি যে বর্ণ-যোজনা বা বর্ণ-বিশ্লেষণ অর্থে “বর্ণন” হইতে আসিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ ; এবিষয়ে কোন তর্কের অবকাশ নাই। তবে একথাও ঠিক যে “বর্ণন”-শব্দজ হইলেও এই শব্দটিকে “বানান” ভাবে অনেকে লেখেন—যেমন “কর্ণ”-শব্দজ “কাণ”, “স্বর্ণ”-শব্দজ “সোণা”-কেও অনেকে “ন” দিয়া লেখেন। দুই রকম রূপই বাঙ্গালাতে প্রচলিত আছে। কিন্তু মূলানুযায়ী রূপ “বাণান”। তাছাড়া, “বাণান” লিখিলে তৈয়ারী করা অর্থে “বানান” বা “বানানো” শব্দ হইতে ইহার পার্থক্যও সহজে ধরা পড়ে। এই কারণে আমি নিজে “বাণান” রূপটিই অনুমোদন করি। আমার প্রবন্ধেও এবিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

["শনিবারের চিঠি"-র সহিত]

("শনিবারের চিঠি"-র সম্পাদকীয় মন্তব্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরাধিকাল পূর্ব্বে একটি সমিতি গঠন করিয়া বাংলা বানানের নিয়ম যতদূর সম্ভব বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এই সমিতি প্রারম্ভে বঙ্গভাষার বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত চান। আন্দাজ দুই শত উত্তর পাওয়া যায়। সেই অভিমতগুলি বিবেচনা করিয়া সমিতি ১৯৩৬ সালের মে মাসে "বাংলা বানানের নিয়ম" প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা প্রকাশের ফলে সাময়িক পত্রিকাদিতে নানা আলোচনা হইতে থাকে এবং বহুবিধ মতামতসংবলিত পত্রাদিও সমিতির হস্তগত হয়। সুতরাং সমিতি পুনর্ব্বার নিয়মগুলি বিবেচনা করিয়া "বাংলা বানানের নিয়ম" পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করেন। বাংলা সাহিত্যের দুই জন শ্রেষ্ঠ লেখক, রবীন্দ্রনাথ

ও শরৎচন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্ধারিত এই সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে সম্মত হইয়া এক পত্র দেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এই পত্র মুদ্রিত হয়। কিন্তু তাহাতেই গোলযোগের শেষ হয় না। এই নিয়মগুলির বিরুদ্ধে এবং পক্ষে আরও অনেক ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত আলোচনা সমিতির হস্তগত হইতে থাকে এবং বানান-সমিতির সকলেই সকল বিষয়ে একমত না হওয়াতে এই নিয়ম-গুলিকে চরম বলিয়া সমিতি গণ্য করিতে পারেন না। সুতরাং ইহার তৃতীয় সংস্করণও প্রস্তুত হইতে থাকে। সম্প্রতি ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং আমরাও সমিতির সভাপতি ও অন্য দুই জন সদস্যের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের এখন পর্য্যন্ত শেষ নির্দ্ধারণ অবগত হইয়াছি।

ইতিমধ্যে (প্রথম সংস্করণ পুস্তিকা প্রকাশের পর) আমরা "শনিবারের চিঠি"-র "প্রসঙ্গ কথা" বিভাগে এই সকল নিয়মের দুই একটির অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। মাসাধিককাল পূর্ব্বেও শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলোচনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক প্রচারিত নিয়মগুলি সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে আরও সাবধান হইয়া পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া কয়েকটি দৈনিক পত্রে প্রকাশিত এক আবেদনপত্রে আরও অনেকের সহিত আমরা স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। এই আবেদনপত্রে যতদূর সম্ভব প্রচলিত নিয়ম বজায় রাখিয়া চলিতে সমিতিকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তুতের কথা আমরা তখন অবগত ছিলাম না। আমরা পরে ইহা অবগত হই, এবং সমিতির সভাপতি ও দুই জন সদস্যের সহিত বিস্তৃত আলোচনা করি। আলোচনার ফলে "বাংলা বানানের নিয়ম"-এর তৃতীয় সংস্করণের যে খসড়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমরা মোটামুটি সম্মত আছি। সেই কথা বলিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

যাঁহারা সমিতি-নির্দ্ধারিত নিয়মের বিরোধিতা করিতেছেন সম্ভবতঃ তাঁহারা এখনও নিয়মের তৃতীয় সংস্করণ দেখিবার সুযোগ পান নাই।

জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী"-তে "বাঙ্গালা বাণান"-শীর্ষক যে প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখিতেছি, তিনি সাধুভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে কোনও পরিবর্ত্তন সমর্থন করেন না। তাঁহার ধারণা বানান-সমিতি বিশেষভাবে এই পরিবর্ত্তনের দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন। "বাংলা বানানের নিয়ম" পুস্তিকা পাঠে কিন্তু আমাদের অন্যরূপ ধারণাই হইয়াছে। তাঁহারা সূচনাতেই বলিতেছেন,

"অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলাভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে; এবং প্রয়োজন মত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এই সকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধানাদির শাসনে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।"

এবং তাঁহারা হঠাৎ গায়ের জোরে যে কিছু করিতে চাহিতেছেন না; তাহার প্রমাণ—তাঁহারা বলিতেছেন,

"সমস্ত বাংলা শব্দের বানান এক কালে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধে বানানের কয়েকটি মাত্র নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। নিয়মগুলি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু শব্দবিশেষে ব্যতিক্রম হইবে।"

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সম্বন্ধে মাত্র দুইটি নিয়ম (বাইশটির মধ্যে) সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন: (১) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না; এবং (২) যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়। এই দুইটি নিয়মই সংস্কৃত ব্যাকরণের বিরোধী নয়, অবশ্য সংস্কৃতে বিকল্পেরও বিধান আছে। দেবপ্রসাদ বাবু দ্বিত্ব বর্জ্জনের ঘোর বিরোধী। তাঁহার বিশ্বাস ইহাতে এবং বিশেষ করিয়া রেফের পর য-ফলার দ্বিত্ব ব্যবহার না করিলে অনেক স্থলে উচ্চারণবিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। সমিতি বহুক্ষেত্রেই বিকল্পের বিধান দিয়াছেন; এক্ষেত্রে দ্বিত্ব যখন সংস্কৃতব্যাকরণসম্মত, আশা করি, সমিতি তৃতীয় সংস্করণ

নিয়ম প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে দেবপ্রসাদ বাবুর যুক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অন্যান্য যে সকল নিয়ম সম্পর্কে দেবপ্রসাদ বাবু আলোচনা করিয়াছেন আমাদের বিশ্বাস তৃতীয় সংস্করণ "বাংলা বানানের নিয়ম" দেখিবার পর তাঁহার আর বিশেষ কিছু বলিবার থাকিবে না। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সমীচীন নয়।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪।

(লেখকের পত্র)

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "শনিবারের চিঠি"-তে বাঙ্গালা বাণান সম্পর্কীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য বিষয়ে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"-তে বাঙ্গালা বাণান সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম এবং যাহার সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্যে উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ মন্তব্যলেখক মহাশয় উহা তেমন মনোযোগসহকারে পড়েন নাই। কারণ, একস্থানে মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে আমি শুধু সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব্দে বাণান পরিবর্ত্তনের বিরোধী। বস্তুতঃ আমার আপত্তি তদপেক্ষা ব্যাপক। শুধু সংস্কৃত ও তন্মূলক শব্দে কেন, যে কোন শব্দেরই বাণান ভাষাতে একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ভাষায় ব্যবহারে যাহাদের একবিধ রূপই প্রচলিত, সেই সমস্ত শব্দেরই প্রচলিত রূপের পরিবর্ত্তন প্রচেষ্টার আমি বিরোধী। ইহার কারণ এই যে এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে আবার একই শব্দের নানাবিধ বাণান চলিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ বিশৃঙ্খলাই আসে। অথচ বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা কাহারও উদ্দেশ্য নয়—আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়োজিত বাণান-কমিটিরও নয়—বিশৃঙ্খলা নিরাকরণ করাই সকলের অভিপ্রেত।

এই জন্যই সংস্কৃতমূলক ছাড়াও অন্য প্রতিষ্ঠিতরূপ অ-সংস্কৃত শব্দেও, যেমন, পোষাক, রেশম, পেশা, খোসা, চাষা ইত্যাদিতেও আমার ধারণা যে কোন-রূপ হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। এই জন্যই যে সব স্থলে বাঙ্গালা প্রয়োগে রেফের পরে কেবলমাত্র বর্ণদ্বিত্বই হয়, সেই সব স্থলে আমি তাহা রাখিবারই পক্ষপাতী ; যেমন, র্চ্চ, র্চ্ছ, র্জ্জ, র্ত্ত, র্দ্দ, র্দ্ধ, র্ব্ব, র্ম্ম, র্য্য-এর ক্ষেত্রে ; আবার যে সব স্থলে রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব হয় না, যেমন, র্ক, র্খ, র্গ, র্থ, র্ণ ইত্যাদি, সে সব স্থলেও প্রচলিত প্রয়োগে আমার আপত্তি নাই। মোটের উপর আমার মতে প্রচলিত সুনির্দ্দিষ্ট প্রয়োগের উপরে আর কোন কথা চলে না ; অন্ততঃ কোন কথা চলা উচিত নহে। বাণান-কমিটিও মুখে সেই কথাই বলিতেছেন ; কিন্তু কাজে করিতেছেন অন্যরূপ। কারণ বাণান-কমিটির বহু প্রস্তাবই প্রচলিত প্রয়োগের পরিবর্ত্তনই বিধান করিয়াছে, অন্ততঃ বিকল্পে বিধান করিয়াছে। কিন্তু যেখানে একই রূপ প্রচলিত, সেখানে বিকল্প-বিধান সংস্কারের পথ নহে। যেমন, বাঙ্গালাতে প্রচলিত একমেবাদ্বিতীয় "রাণী" রূপটি বাণান-কমিটির বিবিধ সংস্করণের কল্যাণে অতঃপর "রানি", "রাণি," "রানী," "রাণী," এই চতুর্ব্বিধ রূপে বিরাজ করিতে থাকিবে। ইহার উপর আর টীকা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ সংস্কার বিকারেরই নামান্তর। এই সব বিষয়ে উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

বস্তুতঃ, যে সকল শব্দে বহুবিধ রূপ প্রচলিত আছে, নানা প্রকার variant আছে, সেই সব স্থলে কোন একটি রূপ নির্দ্দেশ করা ভাল। বাঙ্গালা সাধু ভাষায়, বিশেষতঃ অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে, এইরূপ কিছু কিছু শব্দ আছে—সেইগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ভাল। কিন্তু সর্ব্বোপরি, বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল যে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষা বা "চল্‌তি ভাষা"-র প্রয়োগ বহুল পরিমাণে হইতেছে, তাহার রূপবাহুল্য হ্রাস করিবার চেষ্টাই বেশী আবশ্যক। কিন্তু বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ১০টি প্রস্তাব

লিপ্যন্তরবিষয়ক, ১২টি সাধুভাষাবিষয়ক, এবং মাত্র ২টি কথ্যভাষা-বিষয়ক (প্রথম সংস্করণ হইতে বলিতেছি; দ্বিতীয় সংস্করণে ১১টি সাধুভাষাবিষয়ক; তৃতীয় সংস্করণের খসড়া এযাবৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই)। সুতরাং সাধুভাষায় প্রচলিত রূপের বিরুদ্ধেই যে বাণান-কমিটির অভিযান প্রধানতঃ চালিত হইয়াছে—যাহা আমি "প্রবাসী"-তে লিখিয়াছিলাম—তাহা ভিত্তিহীন কিংবা অতিরঞ্জিত নহে। তবে আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়-বাণান-কমিটি ভবিষ্যতে সাধুভাষায় বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টির চেষ্টা পরিহার করিয়া তাঁহাদের নিয়োগের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য তদ্বিষয়ে অর্থাৎ চল্‌তি ভাষায় শৃঙ্খলা আনয়নের দিকে মনোনিবেশ করিবেন। ইতি

আষাঢ়, ১৩৪৪। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

(ক) বাণান-কমিটির প্রস্তাবিত নিয়মাবলী

(সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত বাণান-কমিটি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে "বাংলা বানানের নিয়ম" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকার ভূমিকাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানান যে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলীসম্মত বানান গৃহীত হইবে।" অথচ পরবর্তী অক্টোবর মাসেই এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, এবং উহাতে বাণানসম্বন্ধীয় প্রস্তাবাবলীর কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। তাছাড়া, ঐ সংস্করণে পুস্তিকাটির প্রারম্ভে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঔপন্যাসিক ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মতি প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে খুবই আন্দোলন চলিতে থাকে। তাহারই ফলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই পুস্তিকার তৃতীয় একটি সংস্করণ হয়। ইহাতে প্রস্তাবাবলী আরও পরিবর্তিত হয়; এবং এই প্রথমবার বিরুদ্ধবাদীদিগের সমালোচনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ যুক্তি অবতারণার প্রয়াস করা হয়। তাছাড়া, এই সংস্করণে বিজ্ঞাপিত হয় যে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকাদিতে নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা সুপ্রচলিত হইবে। কিন্তু সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। সেজন্য এখন কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম পালন সম্বন্ধে কোনও প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।" এযাবৎ আর কোন সংস্করণ হয় নাই। ১৯৩৬-এর মে হইতে ১৯৩৭-এর জুন—এই এক বৎসর সময়ের মধ্যে বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলীর পরিবর্তন ও বিবর্তন নিম্নে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে উপলব্ধ হইবে।)

(সাধুভাষা-বিষয়ক)

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব : সংস্কৃত শব্দে যদি ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে ; যথা, কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক, ইত্যাদি। অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না ; যথা, অর্জন, কর্ম, সর্ব, সূর্য, ইত্যাদি। অসংস্কৃত শব্দে এইরূপ দ্বিত্ব সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয় ; যথা, কর্জ, শর্ত, চর্বি, ইত্যাদি (প্রথম সংস্করণ)। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের কখনই দ্বিত্ব হইবে না (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ)।

২। সন্ধিতে ঙ্‌ স্থানে অনুস্বার : যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্‌ বিধেয় ; যথা, অহংকার, অহঙ্কার ; শংকর, শঙ্কর ; ইত্যাদি।

৩। বিসর্গান্ত পদ : বাঙ্গালা বিসর্গান্ত সংস্কৃত শব্দের শেষের বিসর্গ বর্জ্জিত হইবে ; যথা, আয়ু , মন, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত, ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গ-সন্ধি যথানিয়মে হইবে ; যথা, আয়ুষ্কাল, পুনঃপুন, সদ্যোজাত, ইত্যাদি (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে কোন নিয়ম দেওয়া হয় নাই।

৪। হস্‌ চিহ্ন : সংস্কৃত হসন্ত পদের বা শব্দের শেষে হস্‌ চিহ্ন রক্ষিত হইবে ; যথা, ত্বক্‌, বিদ্বান্‌, সম্রাট্‌, ইত্যাদি (প্রথম সংস্করণ)। সংস্কৃত হসন্ত পদের বা শব্দের শেষে হস্‌ চিহ্ন রক্ষিত হইবে, অথবা বিকল্পে বর্জ্জন করা চলিবে ; যথা, ত্বক্‌, ত্বক ; ইত্যাদি (দ্বিতীয় সংস্করণ)। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে কোন নিয়ম দেওয়া হয় নাই।

অ-সংস্কৃত শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্‌ চিহ্ন দেওয়া হইবে না ; কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্‌ চিহ্ন বিধেয়। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্‌ চিহ্ন বিধেয় ; যথা, খট্‌কা, উল্‌কি। যদি উপান্ত্যস্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয়, তবে শেষে হস্‌ চিহ্ন বিধেয় ; যথা, কট্‌ কট্‌, খপ্‌, সার্‌।

৫। ই, ঈ, উ, ঊ : তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে, যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে, তবে ঈ বা ঊ অথবা ই বা উ হইবে ; যথা, কুমীর, কুমির ; শীষ, শিষ ; পাখী, পাখি ; শাড়ী, শাড়ি ; রানী, রানি ; ঊনিশ, উনিশ ; চূন, চুন ; পূব, পুব ; ইত্যাদি। এবিষয়ে তৃতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত নিয়ম দেওয়া হইয়াছে যে তদ্ভব কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই, অথবা কেবল উ হইবে ; যথা, নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), চুল (চুল), তাড়ু (তর্দ্দু), জুয়া (দ্যূত)।

তদ্ভব ও তৎসদৃশ ভিন্ন অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব-ই বা হ্রস্ব-উ হইবে ; যথা, ঝি, দিদি, মাসি, পিসি, কাকি, মামি, ঢাকি, ঢুলি, বাঙ্গালি, ইংরেজি, হিন্দি, রেশমি, পশমি, মাটি, ওকালতি, একটি, ছুটি, কি (প্রথম সংস্করণ)। অসংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্তে ঈ বা বিকল্পে ই হইবে , যথা, কাকী, কাকি ; পিসী, পিসি ; মামী, মামি ; ময়রানী, ময়রানি। কিন্তু, "ঝি" ও "দিদি" কেবল ই-কারান্ত হইবে। তদ্ভব ও স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব-ই বা হ্রস্ব-উ হইবে ; যথা, ঢাকি, ঢুলি, ইত্যাদি। অব্যয় হইলে "কি" ; সর্ব্বনাম হইলে বিকল্পে "কী" বা "কি" হইবে ; যথা, তুমি কি যাইবে ? তুমি কী (বা কি) খাইবে বল (দ্বিতীয় সংস্করণ)। স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে ; যথা, কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে ; যথা, ঝি, দিদি, বিবি ; কচি, মিহি, মাঝারি, চল্‌তি। "পিসী" "মাসী" স্থলে "পিসি" "মাসি" লেখা চলিবে। অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্ম্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে ; যথা, বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসারি, সোজাসুজি (তৃতীয় সংস্করণ)।

৬। জ য : প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এবিষয়ে কোন নিয়ম নাই। তৃতীয় সংস্করণে লেখা হইয়াছে যে, এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয় : কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।

৭। ণ ন : অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে ; যথা, রানি, সোনা, কান, বামুন, কোরান, ইত্যাদি। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে অতিরিক্ত নিয়ম দেওয়া হইয়াছে যে যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে ; যথা, ঘুন্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা ; এবং "রানী" স্থানে বিকল্পে "রাণী" চলিতে পারিবে।

৮। ও-কার ও উর্দ্ধ কমা প্রভৃতি : সুপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার, উর্দ্ধ কমা (ইলেক্) বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জ্জনীয় ; যথা, যত, মত (সদৃশ), কাল (সময়, কল্য, কৃষ্ণ), ভাল (কপাল, উত্তম), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (দালি, শাখা), এত, এখন, কে, দেখা, খেলা। "তো, হয়তো" বাণান বিধেয় (প্রথম সংস্করণ)। এই সকল বাণান বিধেয় : এত, কত, যত, তত ; তো, হয়তো ; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (দালি, শাখা)। এই সকল বাণান বিকল্পে বিধেয় : কাল, কালো (কৃষ্ণ) ; ভাল, ভালো (উত্তম) ; মত, মতো (সদৃশ) (দ্বিতীয় সংস্করণ)। যদি অর্থ গ্রহণে বাধা হয়, তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে ; যথা, কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো (তৃতীয় সংস্করণ)।

কোন, এখন, কখন, তখন প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে এইরূপ বাণান বিধেয় ; যথা, কোন্ লোক ? কোন কোন লোক বর্ণান্ধ ; কোনও লোক আসে নাই ; কখন্ হইবে জানিনা ; কখন মেঘ কখন রৌদ্র ; এমন কখনও হয় না (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)। তৃতীয় সংস্করণে এই নিয়মটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইয়া উয়া প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের চলিত (ও আধুনিক সাধু) রূপ এই প্রকার হইবে : একঘরে, জুটে, কটমটে, ছটফটে, জলো, মদো, ঘরো, পড়ো, পটো, খড়ো, ঝড়ো। উপান্ত্যবর্ণে ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য বিকল্পে উর্দ্ধকমা চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে ; যথা, একঘ'রে, জ'লো (প্রথম সংস্করণ)। ইয়া উয়া প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের চলিত (ও আধুনিক

সাধু) রূপ এই প্রকার হইবে : একঘ'রে, জ'টে, কটম'টে, ছটফ'টে, জ'লো, ম'দো, ঘ'রো, প'ড়ো, প'টো, খ'ড়ো, ঝ'ড়ে (দ্বিতীয় সংস্করণ)। যদি অর্থ গ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে আগু বা মধ্য অক্ষরে উর্দ্ধ কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে ; যথা, পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)। সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, উর্দ্ধকমা বা অন্যচিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জ্জনীয় (তৃতীয় সংস্করণ)।

৯। ং ঙ : "বাঙালি, আঙুল, রঙের" প্রভৃতি বাণান বিধেয়। ("বাঙালি" ও "বাঙ্গালি"র উচ্চারণ সমান নয়)। যদি স্বরচিহ্ন যোগ না হয় তবে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয় ; যথা, রং, রঙ ; সং, সঙ ; বাংলা, বাঙলা। (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)। "বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন" প্রভৃতি এবং "বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন" প্রভৃতি উভয় প্রকার বাণানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয় ; যথা, রং, রঙ। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয় ; যথা, রঙের, বাঙালী, ভাঙন (তৃতীয় সংস্করণ)।

১০। শ ষ স : মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে ; যথা, আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), ইত্যাদি। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে যে কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে ; যথা, মিন্‌সে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

দেশজ শব্দের প্রচলিত বাণান হইবে ; যথা, সরেস, করিস, ফরসা (-শা), উশখুশ (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)। দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বাণান হইবে ; যথা, সরেস (-শ), ফরসা (-শা), উসখুস (উশখুশ) (তৃতীয় সংস্করণ)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স ও sh স্থানে শ হইবে ; যথা, আসল, খাস, জিনিস, পুলিস, সাদা, সবুজ, মাসুল, মসলা, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পোশাক, পালিশ, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, ইত্যাদি। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে যে

কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে ; যথা, ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্‌), ভিস্তী (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট (Christ)।

বিদেশী শব্দে s-ধ্বনির জন্য বাঙ্গালায় ছ অক্ষর বর্জ্জনীয় ; যথা, সাহেব ("ছাহেব" নহে), সুলতান ("ছুলতান" নহে)। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত বাঙ্গালা বাণানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বাণানই বজায় থাকিবে ; যথা, কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

১১। চন্দ্রবিন্দু : কয়েকটি শব্দের বাণান এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল ; যথা, কুচি (টুকরা), কুঁচি (শূকরাদির লোম) ; কুঁজা (কুব্জ, সোরাই) ; কুঁদা (লাফান, কুঁদ যন্ত্রে কাটা, কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদি) ; কুড়ে (অলস), কুঁড়ে (কুটীর) ; খোঁপা (কবরী) ; ছুঁচ (সূচ) ; ছোড়া (নিক্ষেপ করা), ছোঁড়া (ছোকরা) ; টেকা (স্থায়ী হওয়া) ; পুথি (পুস্তিকা) ; বাটা (পেষণ করা), বাঁটা (বণ্টন করা) ; বেজি (নকুল) (প্রথম সংস্করণ)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে কোন নিয়ম দেওয়া হয় নাই।

১২। ক্রিয়াপদ : সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের বাণানে অধিক মতভেদ দেখা যায় না। অনেকে "করানো" "পাঠানো" লেখেন ; কিন্তু অধিকাংশ লেখক "করান", "পাঠান" বাণানের পক্ষে। ও-কার অনাবশ্যক ; অর্থ হইতেই উচ্চারণবোধ হয় ; সেজন্য "করান" "পাঠান" ইত্যাদি বাণান বিধেয় (প্রথম সংস্করণ)। কৃদন্ত রূপে "করান" "পাঠান" অথবা বিকল্পে "করানো" "পাঠানো" প্রভৃতি বাণান বিধেয় (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ)।

"করিয়ো" "দিয়ো" ইত্যাদি বাণানে য় অনাবশ্যক ; "করিও" "দিও" বিধেয় (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে কোন নিয়ম দেওয়া হয় নাই।

(চলিতভাষা-বিষয়ক)

১৩। **ক্রিয়াপদ :** চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বাণানে অতিরিক্ত ও-কার ঊর্দ্ধকমা (ইলেক্) বা হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক, কিন্তু ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য কয়েকটি রূপে ঊর্দ্ধকমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে ; যথা, হস (হ'স), হল (হ'ল), হলে (হ'লে), হত (হ'ত), হতে (হ'তে) ; কিন্তু হোক, হোন (প্রথম সংস্করণ)। দ্বিতীয় সংস্করণে "হোক" "হোন" রাখা হইয়াছে, কিন্তু মধ্যে ও-কার ধ্বনি বুঝাইতে অন্যত্র ঊর্দ্ধকমাই বিহিত হইয়াছে, এবং তৃতীয় সংস্করণে সর্ব্বত্রই বিহিত হইয়াছে ; যথা, হ'স, হ'ক, হ'ন, হ'ল, হ'লাম, হ'ত, হ'য়ো, হ'তে, হ'লে, হ'য়ে : তবে বিকল্পে ঊর্দ্ধকমা বর্জ্জনের বিধান দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া, এই দুই সংস্করণে ভবিষ্যৎ কালের "ব" স্থানে বিকল্পে "বো" বিহিত হইয়াছে ; যথা, হব, হবো।

সাধু ক্রিয়াপদের "লাম" বিভক্তি স্থানে চলিত ক্রিয়াপদেও "লাম" বিধেয়, কারণ ইহা বহু অঞ্চলের মৌখিকরূপে প্রচলিত এবং সাধুরূপেরও অনুযায়ী (প্রথম সংস্করণ)। "লাম" বিভক্তি স্থানে "লুম" বা "লেম"-ও লেখা যাইতে পারে ; যথা, হ'লাম, হ'লুম, হ'লেম (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ)।

চলিত ক্রিয়াপদের এই রূপগুলি বিধেয় : হচ্ছে, হয়েছে, হচ্ছিল, হয়েছিল।

১৪। **কতকগুলি সাধুশব্দের চলিতরূপ :** "কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন পিতল, ভিতর, উপর" প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্য প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে, তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয় ; যথা, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর। যাহার বিকৃতি মধ্যে বা শেষ অক্ষরে, তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয় ; যথা, কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো।

(লিপ্যন্তর-বিষয়ক)

১৫। বিবৃত-অ বা হ্রস্ব-আ (cut-এর u): মূল শব্দে যদি বিবৃত-অ বা হ্রস্ব-আ থাকে তবে বাঙ্গালা বাণানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়; যথা, ক্লাব (club), সার্কস (circus)।

১৬। বিকৃত-এ (cat-এর a): মূল শব্দে বিকৃত-এ থাকিলে বাঙ্গালায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়; যথা, অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)।

১৭। ঈ, ঊ: মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাঙ্গালা বাণানে ঈ ঊ বিধেয়; যথা সীল, (seal), স্পূল (spool)।

১৮। f, v: f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ও ভ বিধেয়; যথা, ফুট (foot), ভোট (vote)। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-এর তুল্য হয়, তবে বাঙ্গালা বাণানে ফ হইবে; যথা, ফন (জার্মাণ von)।

১৯। w: w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়; যথা, উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)।

২০। য়: নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। "মেয়র, চেয়ার, সোয়েটর" প্রভৃতি বাণান চলিতে পারে; কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পরে অকারণে য় য়া য়ো লেখা অনুচিত। "এডোয়ার্ড" "ওয়ার-বণ্ড" না লিখিয়া "এড্ওআর্ড" "ওঅর-বণ্ড" লেখা উচিত। "হার্ডওয়ার" (hardware) বাণানে দোষ নাই।

২১। s, sh: মূল উচ্চারণানুসারে s-এর স্থলে স এবং sh-এর স্থলে শ লেখা উচিত।

২২। st: ইংরাজী st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়; যথা, স্টেশন।

২৩। z: z স্থানে জ় বা জ় বিধেয়।

২৪। হস্ চিহ্ন: অন্ত্য হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক; বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্ চিহ্ন বিধেয়।

(খ) কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম

(রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর লিখিত)

(বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান সম্পর্কে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত লেখকের পত্রালোচনা সাঙ্গ হইবার পর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় "মাসিক বসুমতী"-তে তদুপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অন্যতম প্রথিতনামা মনীষীর অভিমত হিসাবে প্রবন্ধটি এই স্থানে প্রদত্ত হইল।)

অনেক দিন ধরিয়াই শুনাশুন শুনিয়া আসিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা বাণান-সংস্কার সমিতি বসাইয়াছেন, সমিতির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র রিপোর্টে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি লোককে সমিতিতে স্থান দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহারা বিদ্রোহ করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পর শ্রাবণ মাস হইতে দেখিতেছি, এই বাণান-সংস্কার লইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষের দ্বৈরথ যুদ্ধ বাধিয়াছে। গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনও বাঙ্গালী প্রতিবাদীকে কখনও এইরূপ সম্মানিত করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। ঘোষ মহাশয় তাঁহার লিখিত পত্রগুলির অন্তে "প্রণত" হইলেও প্রতিবাদ লিখিবার

সময় তাঁহার হাতের লাঠি কখনও নত করেন নাই। স্কুলের পণ্ডিত যেমন নির্ম্মম ভাবে ছাত্রের বাণান ভুল, ব্যাকরণ ভুল, ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে ভুল দেখান, তেমনই তিনি রবীন্দ্রনাথের ভুলগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে "বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদনে" রবীন্দ্রনাথ বাণান-সমিতির বড় বড় পণ্ডিত-দিগের আশ্রয় লইতেছেন। এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইব, তাহা পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

দেবপ্রসাদ বাবুর নিকট লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ বাণান-সংস্কার সমিতির যে ইতিহাস দিয়াছেন এবং সমিতির ফতোয়ার সমর্থনে যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখে আশ্চর্য্যজনক শুনায়। তিনি লিখিয়াছেন :

"বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ কোরবার জন্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম।"......

"এরকম অব্যবস্থা দূর করবার একমাত্র উপায়—শিক্ষাবিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা।"......

"বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির বিধানকর্ত্তা হবার মত জোর আছে—এই ক্ষেত্রে যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি, একথা আমরা মান্‌তে বাধ্য।"......

"রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জ্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছেন, তা নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি নে। যাঁরা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তাঁরা অন্যায় করেছেন, তবুও তাঁদের পক্ষভুক্ত হওয়া আমি নিরাপদ মনে করি। অন্তত তৎসম শব্দের ব্যব-হারে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার কোরতে কোনো ভয়ও নেই লজ্জাও নেই।"......

"আইন বানাবার অধিকার তাঁদেরই আছে, আইন মানাবার ক্ষমতা আছে যাঁদের হাতে। আইনবিদ্যায় যাঁদের জুড়ি কেউ নেই, ঘরে বসে তাঁরা আইনকর্ত্তাদের পরে কটাক্ষপাত করতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে

দাঁড়িয়ে আইন তাঁরা চালাতে পারবেন না। এই কথাটা চিন্তা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাকা করে দেবার জন্যে দরখাস্ত জানিয়েছিলেম।”......

“আপনার চিঠির ভাষার ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে, বানানসংস্কার সমিতির ‘হোমরা চোমরা’ পণ্ডিতদের প্রতি আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই। এই অশ্রদ্ধা আপনাকেই সাজে কিন্তু আমাকে তো সাজে না, আর আমার মতো বিপুলসংখ্যক অভাজনদেরও সাজে না।”......

এই সকল বচনে দেখা যায়, স্বাধীন মতের এবং স্বাধীন পথের প্রতি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা হারাইয়া শেষে কর্ত্তাভজা এবং শক্তের ভক্তের দলে মিলিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বাণানসংস্কার সমিতির উপর যে শ্রদ্ধাগুলি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার কতক হিস্সা তাঁহার নিজের উপরেও বর্ষিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং যখন “বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ কোরবার জন্যে” বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিয়াছিলেন, তখন সেই কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। যে সকল বড় বড় পণ্ডিত বাঙ্গালা বাণানের নূতন নিয়মাবলী স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বোধ হয় এই পর্য্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের সম্মুখীন হইতে সম্মত হয়েন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রধারণের মত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই “বড়ো বড়ো পণ্ডিত”-দের সমর্থনের জন্য স্বয়ং কলম ধরিয়াছেন। “বড়ো বড়ো পণ্ডিত”-দের রবীন্দ্রনাথকে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলিয়া দিয়া দূরে বসিয়া তামাসা দেখা সঙ্গত হইতেছে কি না তাহা আলোচনার পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি হইতে বাদানুবাদের মূল যতটা বুঝা যায়, সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা শব্দকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন—তৎসম (সংস্কৃত-সম বা মূল অবিকল সংস্কৃত শব্দ) এবং তদ্ভব (সংস্কৃত হইতে

উৎপন্ন, কতকটা বিকৃত, প্রাকৃত শব্দ)। তৎসম শব্দের বাণানের সংস্কারের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের গরজ ছিল না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"কিন্তু যে প্রস্তাবটি ছিল বানান-সমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত তৎসম শব্দ সম্পর্কীয় নয়।"·········

"বিশ্ববিদ্যালয়-বানানসমিতিতে তৎসম শব্দ সম্বন্ধে যাঁরা বিধান দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্ব ভার থেকে তাঁরা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন।"······

"তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব।"·········

তৎসম শব্দ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণানসমিতির প্রধান কীর্ত্তি, রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জ্জনের নিয়ম। এই নিয়মটি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাণানসংস্কার সমিতির নিকট পুনঃ পুনঃ কুর্ণিশ করিয়াছেন। একটা অতি সহজ কাযের জন্য এই অতি ভক্তির কারণ বুঝা যায় না। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার আকর অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্য। প্রচলিত সংস্কৃত-সাহিত্যে যে শব্দটি যে আকারে বাণান করা হয়, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার পুস্তকে সেই শব্দটি অবশ্য সেই আকারে বাণান করা হইয়া থাকে। নতুবা সেই শব্দের তৎসমত্ব থাকে না। বাঙ্গালার বাহিরে সমস্ত ভারতবর্ষে, য়ুরোপে এবং আমেরিকায় যত সংস্কৃত পুস্তক ছাপা হয়, তাহাতে সচরাচর রেফের পর দ্বিত্বব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং যাঁহারা কাশী, বোম্বাই, পুণা, অক্সফোর্ড, লাইপজিক, হার্ভার্ড প্রভৃতি সহরে মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক পড়া-শুনা করিয়াছেন, বা ঐ সকল সহরে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বাঙ্গালা লিখিবার সময় রেফের পরে দ্বিত্বব্যঞ্জনবর্ণ বর্জ্জনের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বাণান-পরিবর্ত্তন-সংস্কার সমিতির ইংরেজীনবীশ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাণান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে খোলসা হুকুম পাইয়া এই পরিবর্ত্তনটি যে প্রস্তাব করিবেন, ইহার জন্য চমৎকৃত বা ভক্তিতে অভিভূত

হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তকে, বাঙ্গালার শতসহস্র হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকে, রেফের পর দ্বিত্বব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার রহিয়াছে, এবং এই সূত্রেই তৎসম শব্দে রেফের পর দ্বিত্বব্যঞ্জনবর্ণ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। যতদিন বাঙ্গালায় লিখিত সংস্কৃতে রেফের পর এইরূপ দ্বিত্বব্যঞ্জনবর্ণের চল থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষায় এই রীতি বর্জ্জন করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নমস্কৃত পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য, আগে বাঙ্গালার সংস্কৃত বাণান সংস্কার করিয়া, তার পর বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলির বাণান সংস্কারে হাত দেওয়া। কিন্তু বাঙ্গালার সংস্কৃত বাণানের সংস্কার বোধ হয় এত সহজ হইবে না। এই ক্ষেত্রে সাহিত্যসম্রাট্, কবিসম্রাট্, কথাসাহিত্য-সম্রাট্গণের প্রভাব আছে কিনা জানি না, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটারারী (literary) পুলিসগণের জবরদস্তিও চলিবে কি না সন্দেহ।

তৎসম শব্দ সম্বন্ধে নমস্কার জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ তদ্ভব শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"কিন্তু তদ্ভব শব্দে অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল। অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে—কিছু কিছু চালাচ্চিও। যেখানে মতে মিলচিনে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানচি। কেন না, অক্ষর-কৃত অসত্য-ভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলব না—এমন কি হয় তো—যাক্ আর কাজ নেই।"

তদ্ভব অর্থ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত শব্দ। পালি এবং প্রাকৃত ব্যাকরণগুলির অধিকাংশ সূত্রেই তদ্ভব শব্দের উৎপত্তির নিয়ম রহিয়াছে। এই সকল ব্যাকরণ রচনার অনেক পরে এবং পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার আবির্ভাব। তথাপি এই সকল ব্যাকরণসম্মত

অনেক তদ্ভব শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায়। যেমন, সংস্কৃত "সাগর" শব্দের স্থানে বাঙ্গালা "সায়র"। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের ৮।১।১৭৭ সূত্রে এই পরিবর্ত্তনের বিধি আছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় তদ্ভব "সায়র"-এর পরিবর্ত্তে তৎসম "সাগর" শব্দের প্রচারই অধিক। সংস্কৃত "দেবকুল" শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় "দেউল" শব্দ প্রচলিত আছে। হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের ৮।১।২৭১ সূত্রে এই পরিবর্ত্তনের বিধি আছে। হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের ৮।২।৩ সূত্রে বিহিত হইয়াছে "ক্ষ" স্থানে "খ" হয়, কখন কখন "ছ" অথবা "ঝ" হয়। বাঙ্গালা লেখার সময় এই সূত্রটি প্রতিপালিত হয় না, কিন্তু কথিত বাঙ্গালায় এই সূত্রটি প্রতিপালিত হয়; যথা, আমরা বলি "খীন", "পক্‌খী", "ভিক্‌খু"; লিখি "ক্ষীণ", "পক্ষী", "ভিক্ষু"। সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণের পরিবর্ত্তনে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি, এবং পরিবর্ত্তনশীল উচ্চারণই তদ্ভব শব্দগুলিকে যুগে যুগে রূপান্তরিত করিয়াছে। বররুচির "প্রাকৃতপ্রকাশ"-এর ৫।৩৫ সূত্র অনুসারে সংস্কৃত "জামাতা" স্থানে তদ্ভব "জামাআ" শব্দের বিধান। উচ্চারণের পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমানে "জামাআ" "জামাই" আকার ধারণ করিয়াছে। "ভ্রাতা" স্থানে "ভাআ" বা "ভায়া" প্রাচীন প্রাকৃত ব্যাকরণসম্মত। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় "ভায়া" "ভাই" দুই-ই প্রচলিত, কিন্তু "জামাআ" অপ্রচলিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে তদ্ভব শব্দকে অপণ্ডিতের অধিকারভুক্ত বে-ওয়ারিশ সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা একেবারে ভুল।

দ্বিতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথ "প্রাকৃত" বাঙ্গালার বাণান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রাকৃত বাঙ্গালার আলোচনায় তিনি যে কত পরস্পরবিরোধী কথা বলিয়াছেন, তাহা দেবপ্রসাদ বাবু দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সকল এবং অন্যান্য ভুলচুক আলোচনা করিলে মনে হয়, এই প্রকার আলোচনা তাঁহার অধিকার-বহির্ভূত। রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুভূতির বলে বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু এই

প্রকারের বাদানুবাদের উপযোগী রীতিমত মেহেন্নত (drudgery) তাঁহার নিকট আশা করা যায় না। তাঁহাকে বাণান-সংস্কারের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া এই বিড়ম্বনার সৃষ্টি কেন করা হইল, তাহা বুঝা যায় না। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "আমি উকিল মাত্র, জজ নই। যুক্তি দেবার কাজ আমি করব, রায় দেবার পদ আমি পাইনি। রায় দেবার ভার যাঁরা পেয়েছেন, আমার মতে তাঁরা শ্রদ্ধেয়।" এত বড় কবির পক্ষে সাধারণে যাহাকে যুক্তি এবং ওকালতী মনে করে, তাহা আশা করা দুরাশা। বাণান-সংস্কার সমিতি রবীন্দ্রনাথকে ওকালতীতে নিযুক্ত করিয়া, অথবা তিনি ওকালতী করিতে বাধ্য হয়েন এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের স্থান অতি পরিপক্ক শাব্দিকের এবং নিপুণ যুক্তিদাতার অনেক উর্দ্ধে। রবীন্দ্রনাথকে বাণান-সংস্কার সমিতির ওকালতীতে লাগাইয়া "বড়ো বড়ো" পণ্ডিতরা শালগ্রাম দিয়া বাট্‌না বাটাইতেছেন। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, "আমরা লাগাই নাই, তিনি নিজেই লাগিয়াছেন।" তাঁহাদের উচিত ছিল, রবীন্দ্রনাথকে ওকালতী হইতে নিবৃত্ত করা। অবশ্যই তাহা করিলে এই সকল "বড়ো বড়ো" পণ্ডিতদের একটা লোকসান হইত; রবীন্দ্রনাথের রচনায় পুনঃ পুনঃ নমস্কৃত হইয়া তাঁহারা যে অমরত্ব (immortality) লাভ করিতেছেন, তাহা দুর্ঘট হইতে পারিত। কিন্তু তজ্জন্য বৃদ্ধ কবিকে বিপন্ন করা উচিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তগণ যে রবীন্দ্রনাথকে নিজের অধিকারের বাহিরে লইয়া গিয়া খুব বিপন্ন করিয়া থাকেন, একথা আমার মত এক জন নগণ্য বাঙ্গালীই বলে না; রবীন্দ্রনাথের পরমহিতৈষী ইংরেজ বন্ধু স্যার উইলিয়ম রোটেন্‌ষ্টাইনও খোলাখুলি বলিয়াছেন। বিখ্যাত চিত্রকর রোটেন্‌ষ্টাইন Men and Memoirs নামক একখানি পুস্তকে আত্মজীবনীসহ বন্ধুবান্ধব-গণের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকের ৩০শ অধ্যায়ে রোটেন্‌ষ্টাইন লিখিয়াছেন যে তিনি প্রথমতঃ Modern Review পত্রে

রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের অনুবাদ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং আরও ইংরেজী অনুবাদের জন্ম জোড়াসাঁকোতে চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গভীর ধর্ম্মবিষয়ক (of a highly mystical character) কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠান হইয়াছিল। এই সকল কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়া রোটেন্‌ষ্টাইন আরও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং প্রমথলাল সেন ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দ্বারা চিঠি লিখাইয়া কবিকে লণ্ডনে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তৎপর ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" প্রকাশিত করাইয়াছিলেন, এবং লণ্ডনের সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাহাতে "গীতাঞ্জলি" সম্যক্ আদর লাভ করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহারই ফলে "গীতাঞ্জলি" নোবেল প্রাইজ কমিটির সভ্য-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১৩২০ সালের গোড়ায়) রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসানে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে য়ুরোপে গিয়া, রবীন্দ্রনাথ তথায় এক বৎসরের অধিক কাল থাকিয়া, কিসে মানবজাতির পরম এবং চরম হিত হইতে পারে, এই বিষয়ে য়ুরোপের নানা দেশে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রোটেন্‌ষ্টাইন তাঁহার উল্লিখিত পুস্তকের ৩২শ অধ্যায়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"Tagore had the courage, at a ceremony given in his honour, to comment on the adulation which had followed not on his work, but on his success in Europe.

"He was not often to escape the tumult, and peace was to be his but at rare moments. Henceforward Tagore was to become a world-figure.

"But great fame is a perilous thing, because it affects not indeed the whole man, but a part of him, and is apt

to prove a tyrannous waster of time. Tagore, who had hitherto lived quietly in Bengal, devoting himself to poetry and to his school, would now grow restless. As a man longs for wine or tobacco, so Tagore could not resist the sympathy shown to a great idealist. He wanted to heal the wounds of the world. But a poet, shutting himself away from men to concentrate on his art, most helps his fellows ; to leave his study is to run great risks. No man respected truth, strength of character, single-mindedness and selflessness more than Tagore ; of these qualities he had his full share. But he got involved in contradictions. Too much flattery is as bad for a Commoner as for a King. Firm and frank advice was taken in good part by Tagore, but he could not always resist the sweet syrup offered him by injudicious worshippers"

৩৪শ অধ্যায়ে আবার রোটেন্‌ষ্টাইন লিখিয়াছেন :

"No man's company gives me more pleasure than Tagore's ; but among his disciples I am uncomfortable. Easy idealism is like Cézannism or Whistlerism. No, away with the smooth talkers, with those who wear bland spiritual phylacteries upon their foreheads ! These men who specialise, as it were, in idealism give me the sense of discomfort that I feel among other men who do not practise but preach. I marvel always at Tagore's patience with such, who weaken his artistic integrity by flattery,

as they weakened Rodin's. Degas, Fantin, Monet and Renoir closed their doors against such half-men, parasites and prigs. I imagine Tolstoy's house to have been infested by these, to his wife's despair."

রোটেন্‌ষ্টাইন রবীন্দ্র-ভক্তগণের লীলা-খেলা কতটুকুই বা দেখিয়াছিলেন ? তাহাতেই তিনি তাঁহাদের স্বরূপ ঠিক চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। য়ুরোপে গিয়া ইঁহাদের লম্বাচৌড়া কথা, ফাশিজ্‌মের নিন্দা বা কম্যুনিজ্‌মের প্রশংসা, কাহারও কোন ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের কথা স্বতন্ত্র। ভক্তগোষ্ঠি-পরিবেষ্টিত রবীন্দ্রনাথের আবদার বাঙ্গালাদেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির কয়েক মাস পরেই, ১৩২১ সালের বৈশাখ হইতে "সবুজপত্র"-এর প্রকাশ আরম্ভ হয়। "সবুজপত্র"-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত, কবির রচিত "সবুজের অভিযান" নামক কবিতার প্রথমেই কবি বলিয়াছেন :

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা !
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা !
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলুক তোরে !
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা !
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা !

সবুজের অভিযানের আরম্ভের পর বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক অবুঝ পুচ্ছটি উচ্চে তুলিয়া অনবরত নাচিতেছে ; এবং নাচিতে অসম্মত আধমরারা ঘা খাইতে খাইতে মরিবার পথে চলিয়াছে।

কিন্তু কই, সবুজের অভিযানের অধিনায়কের মুখে কখনও শুনিতে পাই না যে তাঁহার অভিযান জয়যুক্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ তিনি বুঝিয়াছেন, বাণানের সংস্কার না হইলে তাঁহার অভিযান বিফল হইবে। কিন্তু বাণানের নূতন আইন করে কে? তাহার জন্য য়ুরোপের ছাপওয়ালা এক জন পণ্ডিত চাই। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিজ্ঞানে ডি. লিট্. উপাধি লইয়া লণ্ডন হইতে ফিরিলেন। সুনীতি বাবু তখন বয়সে নবীন এবং কাঁচা। সুতরাং তাঁহাকে কাযের ভার দেওয়া হইল। এই সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন:

"কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয়নি, কেন না আজো তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারেনি। কিন্তু এই বানানের ভিৎ পাকা করার কাজ সুরু করবার সময় এসেছে। এতদিন এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করেনি। এই কারণে সুনীতিকেই এই ভার নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিসেরও জোর। সেই জন্যে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমনকি, আমার নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্ব্বের মতোই চলল।"

এক শতাব্দীর চেষ্টার ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাঙ্গালার বাণানের ভিৎ জমাট বাঁধিয়াছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার শিষ্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা এই ভিতের কতকটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। শেষে রবীন্দ্রনাথ এই ভিৎ একেবারে ধ্বংস করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। এমন সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথ বাণান-সংস্কার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতা পরিচালন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুগত পণ্ডিতগণকে লইয়া বাণান-সংস্কার সমিতি গঠিত হইল। এই সমিতির রিপোর্ট ক্রমশঃ

প্রকাশিত হইতেছে। সাময়িক পত্রে নূতন বাণানের নমুনা দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। য়ুরোপীয় মর্য্যাদার মোহ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন-লাঠির জোর আছে। সুতরাং স্কুল এবং কলেজের পাঠ্যপুস্তকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীবিগণের লেখায় নূতন বাণান চালান কঠিন হইবে না। কিন্তু তাহার বাহিরে যে সব লেখক পাঠক আছেন, তাঁহারা যদি এই নূতন বাণান শিক্ষা করিবার অবকাশ না পায়েন, তবে বিশৃঙ্খল বাড়িয়া যাইবে না কি? তারপর এই যে বাণান সম্পর্কে নূতন কিছু করিবার হুজুক উঠিল, এই হুজুক কি এইখানে থামিবে? নবজাত এবং অজাতগণ যে এই "নতুন কিছু করার" ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইবে না, এবং আবার বাণান-সংস্কার করিতে চাহিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত বাণানবিধি যে লোকে চিরকাল বেদবিধির তুল্য মনে করিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য চিরকাল যে এক হাতে থাকিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? মানুষের রুচির সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিদিন প্রায় প্রতি ঘরে রবীন্দ্রনাথের গান শুনা যাইত। এখন আর তেমন শুনা যায় না। গ্রামোফোনের রেকর্ডে বা রেডিওতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাধান্য নাই।

আরও একটি কারণে, কবির আবদার সত্ত্বেও, ঠিক এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বাণান-সংস্কারে হাত দেওয়া উচিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যে বাণানবিধি এবং ব্যাকরণ অনুসরণ করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় মুসলমান লেখকগণ তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন। এত দিন পড়াশুনা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন জনসাধারণের মধ্যে পড়াশুনা প্রচলিত হইবে। সুতরাং এখন ভাষা আরও সহজ করিতে হইবে। ভাষা সহজ করিবার উপায়,

জনসাধারণের কথিত ভাষায় প্রচলিত সহজ শব্দের ব্যবহার। বাঙ্গালা ভাষায়, বিশেষতঃ মুসলমানসমাজের কথিত ভাষায় অনেক আরবীসম ও আরবীভব এবং পার্সীসম ও পার্সীভব শব্দ আছে। এই সকল শব্দকে বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্থান না দিলে এই সাহিত্য মুসলমানসমাজের আদর লাভ করিতে পারিবে না। এই সকল শব্দ যদি আরবী ও পার্সীর মত বাণান করিতে হয়, তবে কতকগুলি নূতন ব্যঞ্জনবর্ণের দরকার হইবে, এবং যাহারা আরবী পার্সী ভাষার মৌলিক উচ্চারণে অভ্যস্ত নহে, তাহাদের পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন হইবে। সুতরাং আরবী ও পার্সীর তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের বাণানের সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপোষে মীমাংসা করা আবশ্যক। এই সময় যদি হিন্দুরা সংস্কৃতের তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের চল্‌তি বাণান উলট পালট করে, তবে আরবী ও পার্সী শব্দের বাণান সম্বন্ধে চল্‌তি বাণানের দোহাই দেওয়া চলিবে না। ফলে নানারূপ অসুবিধা এবং বিরোধ উপস্থিত হইবে। বড় বড় পণ্ডিতরা যদি তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ সম্বন্ধে প্রচলিত রীতি (tradition) না মানেন, তবে বড় বড় মৌলবীরা তাঁহাদের তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ সম্বন্ধে tradition মানিতে চাহিবেন কেন? এসকল বিষয়ে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম না করিয়া, জনগণের মুখ চাহিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কায করাই কর্ত্তব্য।

কার্ত্তিক, ১৩৪৪।

(গ) প্রতিবাদ ও আন্দোলন

(বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলী প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। এতৎসম্পর্কে বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতব্যক্তি যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে এই প্রস্তাবাবলী প্রত্যাহার করিতে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিবাদ ও অনুরোধসংবলিত পত্রখানি ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাছাড়া, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট লেখক এবিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষাবিভাগ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাও এখানে প্রদত্ত হইল।)

AN APPEAL

Sometime ago a Committee was set up by the Calcutta University to take up the work of revising Bengali spell-ing. It has published a brochure embodying its proposals, and in its preface it has been announced that these new spellings will be adopted in books published and prescribed by the Calcutta University. More recently by a *Calcutta Gazette* notification dated the 25th February, 1937, the Education Department has announced that these newly proposed spellings will be adopted as far as practicable in books meant for schools.

The matter is serious enough in all conscience, and we are afraid that it has not received as much attention from the educated public of Bengal as it deserves. For, most of the proposals advocated in the above-mentioned brochure are of a revolutionary character, running counter to well-established usages and modes of Bengali spelling; and they appear to be exceedingly hasty and ill-advised, besides being entirely uncalled-for. Moreover, the advocates of the new proposals themselves do not appear to know their own mind; for in the two editions through which this brochure has already passed there have been various additions and alterations to the original proposals, and we understand that a third edition embodying further changes is in preparation.

We are definitely of opinion that changes in current and established modes of spelling in a language should not be attempted in an arbitrary and light-hearted manner. Similar proposals of spelling reforms in English, on grounds of phonetics and simplicity, have often been made, but they have invariably been turned down by enlightened public opinion in England, even though spelling in English is far more anomalous and unsatisfactory than that in chaste literary Bengali ever is. The reason is that language is an organic growth and has a history and tradition behind it—its forms are not mere accidents, and one cannot afford to sacrifice its continuity and usage in pursuit of fantastic fads.

We earnestly appeal therefore to the Educational authorities of Bengal to withdraw the said notification, and to the Vice-Chancellor of the Calcutta University at once to take steps so that these ill-advised and hasty proposals may be dropped, and thus a most unnecessary and undesirable confusion in the Bengali language may be avoided.

April 14, 1937.

নিবেদন

আজ বাঙ্গালাভাষায় এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত। বঙ্গদেশের শিক্ষার্থী বালকবালিকাদিগের এবং জনসাধারণের সম্মুখে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত। কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়নিযুক্ত এক কমিটি বাঙ্গালাভাষার বাণান লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, এবং ইতিমধ্যেই তাঁহাদের প্রস্তাবাবলীর দুইটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই দুই সংস্করণের প্রস্তাবগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু উভয় সংস্করণেই প্রচলিত বাণানের উলট-পালট করিয়া নূতন রকম বাণান অবলম্বনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার সম্প্রতি (২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে) বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বাণানই যথাসম্ভব শিক্ষাবিভাগ-কর্ত্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে অবলম্বিত হইবে। অর্থাৎ বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। সুতরাং অবিলম্বে এবিষয়ে বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণের সজাগ হওয়া উচিত; বিলম্ব করিলে ঘোরতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

কোন ভাষার প্রচলিত রূপের উপর লঘুচিত্ততার সহিত হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর। ভাষায় যে সমস্ত রূপ, যে সমস্ত বাণান-রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাতে একটা কারণ আছে একটা ইতিহাস আছে। শুধু সংস্কার-খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেই সব রূপ ও রীতি

পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে ভাষায় শুধু বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কোন কোন তরফ হইতে এইরূপ ভাবে ভাষা-সংস্কারের প্রস্তাব হইয়াছিল। তখন তত্রত্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত অধিকাংশ প্রস্তাবই এই ধরণের, অর্থাৎ প্রচলিত রীতিবিরোধী। সুপ্রচলিত বাণান পরিবর্ত্তনের এইরূপ প্রচেষ্টা অতীব নিন্দনীয়।

শুনা যায়, "চল্‌তি" ভাষার রূপ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তই এই কমিটির সূচনা হইয়াছিল। "চল্‌তি" ভাষার প্রয়োগে যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় কমিটি সেদিকে মনোযোগ দিলে কতকটা কাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তৎসম্পর্কে ইঁহারা বিশেষ কিছুই না করিয়া বাঙ্গালা সাধুভাষার প্রচলিত রূপের বিরুদ্ধেই ইঁহাদের অভিযান চালাইয়াছেন।

আমরা বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার উপর এই প্রকার অযথা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস্‌-চ্যান্সেলর মহোদয়, বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়, এবং বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা অবিলম্বে এবিষয়ে অবহিত হইয়া বাঙ্গালাভাষাকে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাটের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩৪৪।

শ্রীঅনুরূপা দেবী, শ্রীকুমুদিনী বসু, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসরোজনাথ ঘোষ, শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্র-কৃষ্ণ লাহা, শ্রীসজনীকান্ত দাস (শনিবারের চিঠি), শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী), শ্রীসুকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী), শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বসুমতী), শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্ন্যাল, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীরাধাবিনোদ পাল, শ্রীঅম্বুজ-নাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীঅনাথগোপাল সেন, শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ইত্যাদি।

[বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের নিকট লেখকের পত্র]

To The Secretary to the Government of Bengal,
Education Department.

Sir,

I beg to draw your attention to a *Calcutta Gazette* notification dated the 25th February, 1937, by the Director of Public Instruction, Bengal, to the effect that in the books to be submitted in September next for approval by the Text-Book Committee, the *Paribhasha* (scientific technical terms) and the rules for the spelling of Bengali words as prepared by the Calcutta University should be adopted as far as practicable.

I beg also to enclose herewith for your kind perusal a copy of a manifesto that has recently appeared, signed by a large number of eminent educationists, journalists and *littérateurs* of Bengal, protesting against the the spelling revision proposals as hasty, ill-advised and entirely uncalled-for, and appealing to the educational authorities of Bengal to withdraw the said notification. I beg further to inform you that editorial comments have appeared in the newspapers *Azad* (7. 5. 37), *Amrita Bazar Patrika* (8. 5. 37) and *Advance* (13. 5. 37), to the same effect.

Apart from the fact, however, that these proposals are now matters of controversy, I beg to point out very briefly the reasons which render it essential that the said notification be immediately withdrawn.

The reasons are these :

1. The spelling revision proposals have not been prepared by the University ; they are merely tentative proposals of a Committee set up by the University, and have not been sanctioned by the University Senate and Syndicate ; and the Committee's proposals themselves have not yet been published in a final form. The first edition of these proposals was published in May, 1936 ; the second edition in October, 1936, and in this edition the proposals were considerably modified ; and at present the Committee is engaged in bringing out a third edition of the same in which certain further changes are likely to be made.

2. As to the science *Paribhasha*, only the *Ganit Paribhasha* (Mathematical terminology) has so far been published—and even these are matters of controversy ; and the proposed *Paribhasha* for the other sciences (Chemistry, Physics, Geography, Geology, Botany, Zoology, Physiology, etc.) has not been published at all.

3. Books which are to be submitted in September next for approval by the Text-Book Committee, are naturally being prepared and printed from now on ; and authors and the educational world in general are in a fix on account of the prevailing uncertainty in the matter of Bengali spelling and *Paribhasha*.

Under the circumstances it is extremely urgent that the said notification be immediately withdrawn, and replaced by one announcing that the current Bengali spelling and *Paribhasha* be as usual adopted in books to be submitted in September next for approval by the Text-Book Committee. I trust that this urgent and important matter will receive your kind and prompt attention.

	I have the honour to be,
May 20, 1937	Sir,
59B Upper Circular Road	Your most obedient servant,
Calcutta	Devaprasad Ghosh

[বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সিদ্ধান্ত]

In a notification dated the 14th June, 1937, published in the *Calcutta Gazette* (of June 24, 1937) in relation to Bengali spelling and *Paribhasha* to be adopted in text-books, the Director of Public Instruction has announced in modification of his previous notification on the subject, dated the 25th February, 1937, that, in view of the fact that no finality has been reached in the list of scientific terms (*Paribhasha*), or in the rules regulating the spelling of words in Bengali issued or about to issue from the University of Calcutta, authors are at liberty to follow the current system in use, if they prefer, and that no discrimination will be made between books thus written from others.

(ঘ) সাময়িক পত্রের মতামত

(বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালা দেশের সাময়িক পত্রাদিতে যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হইল ।)

THE STATESMAN

(June 6, 1937)

NEW SPELLING FOR OLD

The University of Calcutta's recent attempts to standardize and simplify Bengali spelling deserve more than a passing notice. For Bengali spelling, like spelling in other parts of the world, presents a scene of anarchy. The same sound is represented by more letters than one, the same letter or symbol is made to do the work of many. This is a failing common to most languages, but Bengali has special misfortunes of its own. The conjoint or compound letter presents additional terrors to the young learner, while the wild individualism that marks the spelling of a multitude of words is the despair of the unfortunate compositor and proof-reader. The University's attempt to standardize

and regulate spelling has the appreciation even of those who dislike its proposals. For if the same word with exactly the same significance is spelt in a dozen ways by a dozen writers, the confusion and bewilderment of the average reader is very great. The effect upon school teaching can also be easily imagined. In attempting to bring some order into this chaos, the University deserves well of all lovers of Bengali. In spelling reform the University is treading on more dangerous ground. For reformers themselves do not always agree among themselves about the principle of reform. Besides, man is hardly the rational creature Aristotle imagined him to be, and logic does not invariably supply him with rules to guide his conduct. He takes a perverse delight in persisting in his mistakes, if mistakes they are, and fights shy of reforming them for the sake of uniformity of behaviour.

The University has tried to steer a middle course in spelling reform, but even moderation has its own dangers. It proposes the abolition of compound letters as far as possible, but difficulties arise out of the proviso. A uniform replacement of compound by simple letters would be easy to understand and follow, but as soon as exceptions are allowed, there will be difference of opinion about the occasion and extent of such differences. The University's recommendations tend, on the whole, towards conservatism

and the adherence to Sanskritic forms. This is unfortunate ; for instead of diminishing, it might increase the difficulties of the average reader or writer. Most readers of Bengali are not versed in any language but Bengali, while even among the writers the majority are one-language men, whose acquaintance, if any, with other languages is neither accurate nor profound. The proportion of those who have any Sanskritic scholarship is said to be low and to be constantly decreasing. Any attempt to conform to Sanskritic grammar will only add to their difficulties and lead to greater uncertainty in spelling. The same hesitancy is evident in the recommendations for economy in the use of vowels. Bengali is often indifferent to the distinction between the long and the short vowel, for in many words the same sound is indiscriminately represented by either. The University wants to bring uniformity into the use of these vowels in words of non-Sanskritic origin, and lays it down that the phonetic practice of Bengali ought to be followed in sticking to the short vowel as far as possible. This is hardly of any help, for how is the young learner or the unfortunate writer to decide which of the words he uses are of Sanskritic origin ? Many words derived from Sanskrit have been so changed in the process of assimilation into Bengali that they sometimes puzzle even the trained student of linguistics. There are other words of

non-Sanskritic origin whose resemblance to Sanskrit forms is well-nigh perfect.

Uniformity in spelling is eminently desirable and seems capable of realization with care. But the larger problem of spelling reform is an ideal which, like many other human ideals, must perhaps remain for ever unattainable. A scheme of spelling in which the sounds conform to the spelling and the spelling to the sounds would obviously be of immense advantage to the teachers and pupils. It would remove one of the greatest curses from which young learners have to suffer and make the task of learning a language one of comparative joy and ease. English is notoriously perverse in the matter, for in it sound and spelling are often widely and wildly divergent. French with its more systematic orthography is better off, while languages like German or Italian come nearest to the reformer's heart. But even there, the incalculable element of human uncertainty creeps in. For in this changing world, sounds do not remain constant. A word spelt to-day according to the best canons of phonetic theory and practice may soon be pronounced in a way which makes its former phonetic perfection a mockery. Spelling cannot change as quickly as pronunciation ; if it did, we should soon be faced with a variety of spelling that would make intelligent communication impossible. Uniformity, and consequently

rigidity, is the price of intercourse, and yet pronunciation varies from individual to individual. This is the problem that all spelling reformers must face, and face with growing knowledge of the impossibility of their task.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

I

(April 20, 1937)

We whole-heartedly associate ourselves with the manifesto that has been issued over the signatures of a very distinguished body of educationists and *littérateurs* in Bengal with regard to the proposal of the revision of Bengali spelling. Some of the suggestions about spelling reforms are really of a revolutionary character and appear to be hasty and ill-advised. It is most undesirable that they should be accepted either by the University or the Education Department, and forced upon the Bengali language without further consideration. When some time ago it was reported that these spelling reforms were going to be quietly adopted by the authorities responsible for the selection of Bengali text-books, we were really astonished that the matter did not provoke any serious protest. The authors of the manifesto, therefore, deserve thanks for it. Not that we are opposed to all reforms. But in an important matter like this it is extremely unwise to proceed in such a hurry as, we are constrained to say, the University and the Department of Education are doing.

II
(May 8, 1937)

BENGALI SPELLING MUDDLE

We offer no apology for reverting once again to a matter that has been agitating the educated and cultured world of Bengal for some time past, to wit, the proposed spelling revision in Bengali attempted to be introduced by a Committee appointed by the Calcutta University. This attempt, totally uncalled-for as it seems to us, has already created a good deal of uneasiness, to which only recently emphatic expression was given by a manifesto issued by a large number of distinguished educationists, journalists and *littérateurs* of this province. Bengal naturally holds her language and literature very dear, and any hasty and ill-advised attempt to effect arbitrary changes therein and to mar the purity thereof is rightly resented by cultured Bengal.

So far as our information goes, this Committee owes its genesis to a suggestion thrown out by Poet Tagore to the Calcutta University authorities sometime ago. Now that Calcutta dialect is being increasingly used even in serious Bengali literature, and the inflexions of this dialect being in a more or less unsettled form, it might be well, the Poet suggested, if the University should try to standardize these. The suggestion was a very sensible one, and some useful work might certainly be done along these lines.

This suggestion was taken up, and for this purpose a Committee which had been already working to frame a list of scientific terms (*Paribhasha*) was, with some new members thrown in, converted into a Bengali Spelling Committee. Naturally *Paribhasha* and Bengali spelling revision are altogether different propositions, and so it came about that, barring two or three gentlemen, most of the so-called Spelling Committee of thirteen had no special competence, to put it mildly, for the work they were called upon to do.

Not content with the task they were entrusted with, namely the standardization of colloquial Calcutta dialect as used in present-day Bengali literature, the members of the Committee gradually annexed unto themselves an ever-increasing jurisdiction. They began to standardize variant spellings in chaste Bengali—*sadhu bhasha* as we call it. Even that might pass and might be regarded as not altogether useless, though the number of such variants in *sadhu bhasha* is not very large. But what the Committee attempted next was most surprising. They began to revise settled and standardized Bengali spellings. They went on suggesting newer forms for words whose forms had been altogether settled and established by the usage of classical Bengali writers like Raja Rammohan Roy, Iswarchandra Vidyasagar, Akshoykumar Dutt, Bankimchandra

Chatterjee, Bhudev Mookerjee, Nabinchandra Sen, Ramendrasundar Trivedi, and even Poet Tagore himself (until very recently). And what was all this for? For no earthly reason that any sensible person could make out. It was verily "in pursuit of fantastic fads", as was very happily phrased in the manifesto referred to above. Some members were apparently obsessed with the craze for simplicity at any cost, some for typographical relief, and so on. They evidently forgot that language had got a history, and that its continuity and purity and stability were far more important than these irrelevancies. So the upshot has been that all sorts of arbitrary changes have been suggested by the Committee, and some as alternative (*vikalpa*) spellings, with the result that if these suggestions are given effect to, practically all the settled spellings in Bengali *sadhu bhasha* will be unsettled and thrown into utter confusion. And the funniest part of it all is that very few members of the Committee care themselves to use the spellings they have so liberally prescribed for others. Further, these changes are themselves undergoing changes from edition to edition, presumably to placate sundry eminent personalities. Thanks to this famous Committee of thirteen, Bengal linguistics have come to this pass! This picture might well be looked upon as altogether a comic one, were it not that there is almost a

tragic aspect of it for the public at large and its school-going population.

It has been announced that these spellings will be used in Calcutta University publications and books prescribed by the University. We wonder which spellings—the spellings of which of these ever-changing editions. We also wonder on what authority this announcement has been made, for we have yet to learn that the Senate and the Syndicate have sanctioned these faddist proposals.

Further, the Department of Education has announced in a *Calcutta Gazette* notification that in books to be submitted for approval by the Text-Book Committee, these spellings should be adopted as for as practicable—which means in effect that from the lowest forms of the schools our growing children are to be taught a vulgarized, chaotic, incorrect tongue that runs counter to the well-established and classical usage laid down by the masters of Bengali literature. Nothing could be more unfortunate. We therefore appeal with all the earnestness that we can command that the educational authorities of Bengal should at once withdraw this notification, and hope that our able and popular Vice-Chanceller, Mr. Syamaprasad Mookerjee, should see to it that the vagaries of the over-zealous spelling revisionists are put a stop to.

III

(July 11, 1937)

The Director of Public Instruction, Bengal, has acted wisely in withdrawing his previous circular with regard to the new Bengali spelling system. As we have shown in these columns, the new rules about spelling introduced by the University on the recommendations of a Committee appointed by it sometime ago are arbitrary, unprecedented, revolutionary in character, and calculated to produce something like a veritable chaos in Bengali literature. It is significant that even the University authorities themselves have not yet been able to make up their minds about it. In these circumstances it would have been extremely improper for the Education Department to insist on the adoption of the new rules in text-books. We would in this connection request the Vice-Chancellor also to proceed in the matter cautiously.

IV

(July 19, 1937)

BENGALI SPELLING NOTIFICATION

We draw the attention of the Bengali-speaking public, and particularly of the Bengali authors and publishers, to the latest notification of the Director of Public Instruction, Bengal, in respect of Bengali spelling and *Paribhasha*.

Our readers are aware that for some time past, the whole educational world of Bengal has been in a state of ferment on account of some new-fangled proposals relating to the spelling of Bengali words made by a Committee appointed by the University of Calcutta. The proposals themselves were tentative and have not yet reached anything like finality. Besides, most the proposals of the Spelling Committee were of a revolutionary character, running counter to prevailing and settled usage in Bengali spelling, and as such have come in for severe criticism and condemnation at the hands of eminent Bengali authors and educationists, in the Press, and on the platform. We need not go into the merits of the proposals here; but the undoubted fact remains that since these proposals have been put before the public, they have formed the subject-matter of the keenest controversy.

Strange to say, however, that though the proposals were new and tentative and controversial, very determined attempts were made by interested parties to carry them out immediately by sheer *vis major*. Even though the proposals have not received the sanction of the Senate and the Syndicate, it was announced that in Calcutta University publications and recommended books, the new system would be adopted, and the Department of Public Instruction was made (presumably at the instance of

certain University officials) to follow suit in February last, and to announce that in Bengali school text-books also the new system should be followed. Thus an attempt was made to bring the literary world of Bengal face to face with a *fait accompli.* Whatever learned authors, *littérateurs* and critics might say, since the machinery of approval was in the hands of the University and the Text-Book Committee, that privileged position was sought to be exploited to impose these controversial proposals upon the public of Bengal. "They say! What do they say? Let them say"—that was the attitude.

We protested at the time against this attitude and this attempt at abuse of power, and drew attention to the highly undesirable consequences that were sure to follow. We appealed to the Director of Public Instruction to withdraw the February notification, and to the Vice-Chancellor of the Calcutta University, to look into the matter himself, and curb the activities of the University spelling reform enthusiasts. We are glad that the Director of Public Instruction has at last made some attempt to undo the mischief of his previous notification. In his latest notification, recently published, he has announced that in view of the fact that no finality has yet been reached in the spelling and *Paribhasha* proposals of the Calcutta University Committee, authors are at liberty to follow

the current system in use, and that no discrimination will be made against books thus written.

This is good so far as it goes, for it has removed the atmosphere of compulsion, but the question occurs in one's mind—does it go far enough? The fact is that in the matter of spelling, and particularly in the interests of the school-going population, uniformity should be secured and diversity avoided as far as possible. But the irony of the situation is that the University Spelling Committee, which was ostensibly set up to bring about uniformity in spelling, has only made matters worse, for it has recommended diverse and strange spellings where there is absolute agreement in usage!

Consequently the Director of Public Instruction should have, in view of the uncertainty and controversial nature of the new proposals, notified that the current system in use should alone be adopted, and thus prevented the possibility of all confusion. However, we should perhaps be thankful even for small mercies in these dictatorial days.

We again bring the above facts to the notice of the Vice-Chancellor so that this undesirable situation may be cleared up without delay, and nothing be done by any action of the University to give rise to any confusion and deterioration in the Bengali language, the cause of which he himself has so much at heart.

ADVANCE

(May 18, 1937)

BENGALI TEXT-BOOKS

About a year ago, the Government of Bengal finally sanctioned the new regulations of the University of Calcutta, according to which the medium of instruction and examination is to be the language of the Province ; and this arrangement is due to take effect from the Matriculation Examination of 1940. Text-books which the Matriculation examinees of 1940 are to read are therefore being prepared in Bengali. For the proper preparation of such text books in Science subjects, which under the new regulations form part of the Matriculation course, the University set up a Committee to frame a list of scientific terms (*Paribhasha*) in Bengali. This was as it should be ; for though in Mathematical subjects, there was already a fairly full collection of technical terms in Bengali, in other subjects like Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Geology, Physiology, etc. the existence of a few older text-books notwithstanding, there was nothing like a fairly satisfactory and adequate system of terminology. The *Paribhasha* Commitee set up have up till now succeeded only in publishing a booklet on *Ganit Paribhasha* (mathematical terms). Even this attempt is not very satisfactory, for the list of

terms drawn up involves numerous and needless departures from the mathematical terminology in current use, and hence has come in for strong criticism. And the *Paribhasha* for the other science subjects has not yet been published at all.

What is more surprising is that the *Paribhasha* Committee, with some additional members thrown in, began to function as a Bengali Spelling Committee, taking upon itself the task of revising Bengali spellings, particularly the spellings of colloquial Bengali (as spoken in Calcutta side) which is now frequently used in literature. In this self-imposed task, they have not been very successful, for they have already been obliged to bring out a booklet, the two editions of which differ from each other in many of their recommendations, and are now engaged in bringing out a third edition which presumably will embody further changes. But though not successful overmuch in standardizing unsettled and fluid Bengali spellings, the proposals of the Committee have succeeded remarkably in unsettling settled and standard spellings. So much so that these proposals have evoked a storm of protest among literary circles in Bengal. We do not propose to enter into the merits of this spelling controversy in which distinguished names are arrayed on either side. But we may be permitted to remark that this controversy seems to be

a wholly gratuitous one and need not have been precipitated at all—for there was absolutely no necessity of tampering with settled usage in Bengali spelling. There are far more important things to be attended to for the enrichment of Bengali language and literature. However that may be, in the preface to this booklet on Bengali spelling, it has been stated that in future University publications and recommended books, these revised spellings should be adopted. And the Department of Education has followed suit; for in a *Calcutta Gazette* notification (of February 25 last) the Director of Public Instruction has been pleased to announce that in books to be submitted to the Text-book Committee in September next, the *Paribhasha* and new rules of Bengali spelling prepared by the University should be followed as far as practicable.

This notification has been, to say the least, most premature and hasty. For, as pointed out above, even apart from their merits or otherwise, the spelling proposals have not yet received a final shape, and as to the *Paribhasha* of scientific terms, they have (with the exception of the mathematical terms) not been published at all. And Bengali text-books which are to be submitted in September next for approval are naturally being prepared from now on; and hence authors, publishers and the educational

world of Bengal in general are in a fix on account of the prevailing uncertainty. We think therefore that the Education Department should lose no time in withdrawing the said notification and announcing forthwith that current Bengali spelling and *Paribhasha* should be adopted in text-books to the submitted to the Department for approval by the Text-Book Committee. And as to the University Committee themselves, we would humbly suggest that, whether in the matter of spelling or scientific terminology, they should not try to disturb settled practice and standard usage, for the only result of such attempts is to render confusion worse confounded.

দৈনিক বসুমতী

(১)

(৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)

রহু ধৈর্য্যং !

তরুণ ভাইস-চ্যান্সেলারের কর্তৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা দিকে যে fatal genius for misplaced energy-র পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ এক উপদেশই দিতে হয়—"রহু ধৈর্য্যং"।

আমরা রেজিষ্ট্রারের উপহার—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত" পুস্তিকা "বাংলা বানানের নিয়ম" পাইয়া ভাবিতেছি, ইহা কি বিদেশী লাইনোটাইপ বা ঐরূপ কোন কোম্পানীর dictation-এ প্রচারিত হইয়াছে ? যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষাকেই শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা

যেমন আনন্দানুভব করিয়াছিলাম, আজ বিশ্ববিদ্যালয় "কর্তৃক" প্রকাশিত এই পুস্তিকা পাইয়া তেমনই শঙ্কিত হইয়াছি। এ যে সত্য সত্যই—

"উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।"

বাঙ্গালার যে বানান স্মরণাতীত কাল হইতে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, আজ বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়া তাহাই নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন—বালককে পুস্তকাগারে বা সারমেয়কে ফুলের কেয়ারীতে ছাড়িয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে দিলে ফল যাহা হয়, এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি এই পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :

"বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যে গুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত ভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু-কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে। সুতরাং মহাজন-অনুসৃত পন্থা কোন্‌টি, তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।"

সেই জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে বানান সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে মনে পড়ে—"Fools rush in where angels fear to tread."

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টাকে যে আজ আমরা—

"হাতী ঘোড়া গেল তল
ভেড়া বলে, 'কত জল ?' "

বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ, ভাইস-চ্যান্সেলার লিখিয়াছেন :

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইবে।"

অর্থাৎ বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র শিক্ষার্থীকে বিকৃত বানান শিখিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রচনা-সংগ্রহে কাশীরাম দাস হইতে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতির এবং দেবেন্দ্রনাথ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রাদির যে সব রচনা পাঠ্য করিয়াছেন, সে সকলেও কি মূল বানান পরিবর্তিত করিয়া এই পিয়ালী বানান প্রদান করা হইবে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, সে অধিকার কি বাঙ্গালার সুধীসমাজ স্বীকার করিবেন?

বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য বলিতে পারিতেন, যখন তাঁহারা মালিক তখন তাঁহাদিগের কথাই আইন। কিন্তু, বোধ হয়, ততটা সাহস তাঁহাদিগের হয় নাই। তাই আপনাদিগের এই অক্ষম চেষ্টার সমর্থনে বলা হইয়াছে :

"প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়ের) সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।"

ইঁহারা কাহারা? গল্প আছে, বিলাতে এক জনসভায় একজন লোক বলে, সে অনেককেই জানে। তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কাহাদিগকে চিন?" সে উত্তর দেয়, "যথা—ইজিকেল, জ্যাকেরিয়া, জন, জেম্স, ব্রাউন।" কৌতূহলী জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করে, "তোমার নাম কি? উত্তর হয়—জন জেম্স ব্রাউন।" অর্থাৎ সে সেই জনতায় কেবল দুই জন লোককে চিনিত। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই যে "প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের" কথা বলা হইয়াছে, ইঁহাদিগের মধ্যে

(১) কতজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক?

(২) আর কত জনই বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক?

এই সব লেখক ও অধ্যাপকের পরিচয় পাইলে আমরা বাঙ্গালা বানান বিকৃত করিতে তাঁহারা কিরূপ অধিকারী তাহা বুঝিতে পারিতাম।

যে সব "ভট্টাচার্য" বা "চক্রবর্তী" বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রচ্ছায়ায় পিতৃপুরুষের ব্যবহৃত উপাধি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, তাঁহারা কতটা নির্ভরযোগ্য তাহাও সহজে অনুমান করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা কিরূপ "যোগ্য" ব্যক্তি তাহার অনেক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপকের* বাঙ্গালায় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ১২ ছত্র ভূমিকায় "ছাত্র" ও "ছাত্র" উভয়ই ব্যবহৃত দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন নানা বিষয়ে তাঁহারা যে বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "বাঙ্গালা"-কে কি জন্য "বাংলা" করা হইল, তবে তাহার কি উত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা দিবেন?

তাঁহারা বলিয়াছেন, "কোন কোন স্থলে বহু প্রচলিত বানান কিঞ্চিৎ বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই।" বহু প্রচলিত কথারও বানান পরিবর্ত্তিত করা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? এই সরল করায় শেষে দাঁড়াইবে:

"ছিল ঢেঁকী, হ'ল তুল,
কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।"

এক দিকে মুসলমানরা অকারণ পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালা ভাষা বিকৃত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন—"পাণি" ও "নানী"-র আমদানীতে আমরা বিব্রত হইয়া পড়িতেছি, তাহার উপর আবার যদি বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ বিকৃতিচেষ্টা করেন, তবে বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

---

* অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্. এ., পি-এইচ্. ডি., বি. লিট্.।

বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার যখন তাঁহার "ভূমিকা"-র শেষে লিখিয়াছিলেন—"আবশ্যক হইলে ইহা (বিশ্ববিদ্যালয়কৃত নিয়ম) সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইতে পারিবে"—তখন কি তিনি মনে করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পরে অর্থাৎ কয় মাস পরেই যদি এক জন মুসলমানকে ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত করা হয়, তবে "সংশোধন ও পরিবর্ধন" কিরূপ হইবে? তখন কি তাঁহারই সৃষ্ট নজীরে ঐ "পাণি" ও "নানী"-র আবির্ভাব হইবে না? অর্থাৎ ব্যাপার কি দাঁড়াইবে না,

"তোর শিল তোরই নোড়া
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া?"

বিশ্ববিদ্যালয় কি অতঃপর বাঙ্গালায় পূর্ব্বপ্রকাশিত সব পুস্তকের "সংশোধিত" সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদিগের বানান সম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন?

আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বহু কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা যদি লোকমত অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য মনে করেন, তবে আমরা বলিব—তাঁহারা যে অত্যন্ত ভুলই করিবেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা বাঙ্গালা বানান সরল করিবার চেষ্টার পূর্ব্বে যদি আপনাদিগের প্রকাশিত পুস্তকগুলি নির্ভুল করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে বাঙ্গালীর উপকার হইত।

(২)

(৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা বানান "সংস্কার"-এর চেষ্টায় যে ব্যাপার ঘটাইতেছেন, আমরা সে সম্বন্ধে আমাদিগের মত ব্যক্ত

করিয়াছি। ইহা আমাদিগের "আবহমানকালের সনাতনী" ভাবের পরিচায়ক বলিয়া কোন সহযোগী পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। এই বানান সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই; সেই জন্য আমরা আজ কেবল সহযোগীকে বলিব—তাঁহার কথার আমরা প্রতিবাদ করিব না। যখন মিষ্টার জোসেফ চেম্বারলেন "ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স"-এর প্রচারক হইয়া বক্তৃতায় বিলাত তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন ডিউক অব ডিভনশায়ার তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে মিষ্টার চেম্বারলেন তাঁহাকে "সনাতনী" বলিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি এঞ্জিনের চাকায় গোঁজ দিয়া তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উত্তরে ডিউক বলেন, যখন এঞ্জিন-চালক প্রমত্ত হইয়া "সিগন্যাল" না মানিয়া অতি দ্রুত এঞ্জিন চালাইয়া বিপদ্ ঘটাইতে বসেন, তখন যে এঞ্জিনের গতিরোধ করে, সে অন্যায় করে না—ভালই করে। আজ যখন বিদেশী অনুকরণে আমরা সংস্কারের নামে আমাদিগের সকল বৈশিষ্ট্য বর্জন করিতে উদ্যত, তখন সনাতনী মনোভাব কি বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? সহযোগী নজীর দেখাইয়াছেন, "ইংরাজী ভাষাতেও বানান-সংস্কারের প্রস্তাব উঠিয়াছে।" ইংরেজীতে কোন প্রস্তাব হইলেই কি আমাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে? এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কথা:

> "মোক্ষমুলার বলেছেন 'আর্য্য,'
> সেই শুনে 'বধি ছেড়েছি কার্য্য,
> আমরা যে বড় করেছি ধার্য্য—
> আরামে পড়েছি শুয়ে।"

এই নজীর প্রদর্শন কোন্ মনোবৃত্তির পরিচায়ক?

(৩)

(১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)

বানান-সংহার

গল্প আছে, প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ইউক্লিডের কোন রচনা তাঁহার "ডায়মণ্ড" নামক পালিত জীব নষ্ট করিয়া ফেলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ডায়মণ্ড, তুমি কি ক্ষতি করিয়াছ, তাহা তুমি জান না", অর্থাৎ তোমার কৃত ক্ষতির পরিমাণ অসাধারণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বানান-সংস্কার-চেষ্টায় সেই গল্প মনে পড়ে।

যদি কেবল লাইনোটাইপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালার বানান-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা হয়, তবে তাহা যে কখনই সমর্থনযোগ্য হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা কেন মনে করিতেছি বিদেশী কোম্পানীর যন্ত্রনির্ম্মাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বানান-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন চেষ্টা হইতেছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারণে "সন্ধিতে ঙ স্থানে অনুস্বার" সম্বন্ধীয় মন্তব্যেই বুঝিতে পারা যাইবে:

"যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ, বিধেয়; যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, শংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন', অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর,' ইত্যাদি।

"সংস্কৃত ব্যকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্ত্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়; যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'। বাংলার সর্ব্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্ব্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, কারণ বাংলায় অনুস্বারের উচ্চারণ ঙ-র সমান।"

এইরূপ বানানে যুক্ত-অক্ষর বর্জ্জন করায় অবশ্যই লাইনো-টাইপের "কী-বোর্ড" ছোট হয়; কিন্তু ভাষার যে ক্ষতি হয় তাহা কি বিশ্ববিদ্যালয় পরিমাপ করিতে পারেন?

একেই ত আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্ররা পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পরিচয়শূন্য হইতেছে, তাহার পর যদি এইরূপ বানান চলে, তবে তাহারা শ্রমসাধ্য পুরাতন-পুস্তক-পাঠে যে আরও স্পৃহাশূন্য হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। লাইনোটাইপে এখন যাহা ছাপা হইতেছে, তাহা পাঠকদিগের পক্ষে কিরূপ হইতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

লাইনোটাইপ ব্যবহারের ফলে যে কম্পোজিটারদিগের মধ্যে বেকার-সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে এবং যেমন অক্ষর-প্রস্তুতকারীদিগের ব্যবসা লোপ পাইবে, তেমনই লক্ষ লক্ষ টাকায় বৎসর বৎসর বিদেশী-দিগের পূর্ণ ধনভাণ্ডার উপচিয়া পড়িবে। ইহাও আমরা বিবেচ্য বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক বিবেচ্য, দেশের শিক্ষার্থী-দিগের উপর ইহার ফল কি হইবে?

"শব্দকল্পদ্রুম," কালীপ্রসন্ন সিংহের "মহাভারত" হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থ যে বিশ্ববিদ্যালয় নূতন বানান-পদ্ধতিতে ছাপাইবেন এমন সম্ভাবনা অবশ্যই নাই। তাহা হইলে কি হইবে?

বাঙ্গালা বানান সংস্কৃতপদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই বা হইতেছে না, তাহা নহে। পরিবর্ত্তন যাহা হইতেছে, তাহাকে সংস্কারের নামে সংহার বলা যায় না, এবং তাহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত কোবিদদিগের ব্যবহৃত ভাষার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সহজে গৃহীত হইয়াছে—সে সব পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিতই হয় নাই।

উচ্চারণে বাধা না বাধা উচ্চারণকারীর বিদ্যার ও অভ্যাসের উপর কিরূপ নির্ভর করে, তাহা একটি গল্প বলিলে সপ্রকাশ হইবে। কোন স্কচ কৃষক তাহার কন্যাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। দুহিতা এক দিন পিতাকে বলেন, "বাবা, তুমি difference-এর উচ্চারণ deffrence কর কেন?" পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" কন্যা বুঝাইয়া দিলেন, উহার উচ্চারণ—"ডিফারেন্স"—"ডেফ্‌রেন্স" নয়। তখন পিতা উত্তর দিলেন, " 'ডেফ্‌রেন্স' আর 'ডেফ্‌রেন্স'-এ প্রভেদ কি?—What is the deffrence between deffrence and deffrence?" যাঁহারা "বক্ত" ও "রক্ত"—এতদুভয়ে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের কোন উচ্চারণই যে বাধিবে না, তাহা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি*।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে:

(১) "ইংরেজির st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়; যথা—'স্টেশন'।"

(২) z স্থানেও বিশ্ববিদ্যালয় নূতন চিহ্ন ব্যবহারের বিধান দিয়াছেন।

---

* এই মন্তব্যটির একটু ইতিহাস আছে। ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সুরধুনী কাব্যের দশম সর্গে কলিকাতার গোলদীঘীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে একস্থলে লিখিত আছে,

"দেখ মাতা গোলদীঘী বড় বক্ত জোর।
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর॥"

এই বর্ণনাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বাঙ্গালা রচনা-সংগ্রহের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বপণ্ডিত সম্পাদকগণ গোলে পড়িলেন "বক্ত" শব্দটিকে লইয়া। শব্দটি ফারসী, ইহার অর্থ "ভাগ্য"; যেমন, "কম্‌বক্ত" বা "কম্‌বখ্‌ত" মানে "দুর্ভাগ্য"। তাঁহারা কিন্তু এবিষয়ে কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না। না পারিয়া সোজাসুজি সমস্যার সমাধান করিলেন "বক্ত" শব্দটিকে "সংশোধন"-পূর্ব্বক তৎস্থলে "রক্ত" শব্দ বসাইয়া। সুতরাং গোলদীঘীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের হাতে পড়িয়া গোলদীঘীর বর্ণনা দাঁড়াইল এইরূপ:

"দেখ মাতা গোলদীঘী বড় রক্ত জোর।
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর।"

রক্তের জোর বটে!

কোন বিষয়েই কিন্তু মৌলিকতার পরিচয় নাই। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের প্রচার বিভাগ station-এর উচ্চারণ যে সটেশন করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন; আর আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্ব্বে "কাঢ়িন" বানান করিয়াছিলেন। ইংরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে এই অপূর্ব্ব মিলন যে "পিয়ালী" তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অদ্ভুত প্রচেষ্টায় সেই কথা মনে পড়ে,

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হল রথী;
মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফার্সী পড়েন তাঁতী।"

এদেশে ইংরেজ পাদরীরা ও অন্য বিদেশীরা নানারূপ অদ্ভুত বাঙ্গালার নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন; যথা—"কেন না, ঈশ্বর জগৎকে এমত প্রেম করিলেন যে, তাঁহার একজাত পুত্রকে দান করিলেন; যে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে সে মরিবে না, পরন্তু অনন্ত জীবন পাওয়ে"—আবার, "মাতা সিগলের আরোগ্যরস"—ইত্যাদি; কিন্তু তাঁহারা উচ্চারণ করিতে না পারিলেও বাঙ্গালা বানানের পরিবর্ত্তন করিতে সাহস করেন নাই। সে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমরা লাইনোটাইপ প্রবর্ত্তনের বিরোধী নহি। বাঙ্গালার প্রয়োজনে যত শীঘ্র এইরূপ শ্রম-সঙ্কোচক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় ততই ভাল। কিন্তু সে দিন যখনই কেন আসুক না, আমরা যেন এ কথা কখনও বিস্মৃত না হই, যে যন্ত্র অপেক্ষা জাতির চিরাচরিত বানানের মূল্য অধিক, এবং যদি আমরা যন্ত্রের প্রয়োজনে বানানের বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করি, তবে আমরা "অল্পস্য হেতোর্ব্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়" বলিয়াই বিবেচিত হইব।

ইংরেজীতে door (ডোর), poor (পুয়োর) চলিয়াছে। এখন কেবল মার্কিণী বানানে কাহারও কাহারও অনুরক্তি দেখা যাইতেছে। যথা Honour কেহ কেহ Honor লিখিয়া বানান উচ্চারণানুযায়ী করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনই নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি "একটা নতুন কিছু কর"—এই প্ররোচনায় আপনার শক্তি ও বাঙ্গালার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিকৃত ধরণার বশবর্ত্তী না হইয়া বাঙ্গালার শব্দগঠনপদ্ধতির অনুসন্ধান করিয়া সেই পদ্ধতির উদ্ভব-কারণ বুঝিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা আলোচ্য চেষ্টার ফলে আপনারা হাস্যাস্পদ হইতেন না এবং অসাফল্যের অপমান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কেও অব্যাহতি দিতেন।

(৪)

(১৫ই আষাঢ়, ১৩৪৪)

বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তালিকা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং বাঙ্গালা ভাষার শব্দের বানান-সংক্রান্ত সকল নিয়ম এখনও স্থির হয় নাই; সুতরাং গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ প্রাদেশিক টেক্সট-বুক কমিটির বিবেচনার জন্য ১০ই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে সকল টেক্সট-বুক পেশ করিবেন তাহাতে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতে পারেন; এইভাবে লিখিত পুস্তকের সহিত অন্যান্য পুস্তকের কোন প্রকার তারতম্য করা হইবে না। অর্থাৎ এখনও যাঁহারা বিদ্যাসাগর, ভূদেব, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সেকেলে বকেয়া অচল বানান ব্যবহার করিয়া কেতাব লিখিয়াছেন—বিশ্বপণ্ডিতদের বিধানে তাহা অচল বলিয়া গণ্য হইলেও আপাততঃ কিছুদিন তাহা গ্রাহ্য হইবে।

যাঁহারা ঐ সকল মনীষিবিরচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে কপচাইতে শিখিয়াছেন, বাঙ্গালার শিক্ষায়তনটিকে মুঠার মধ্যে পাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের তাঁহার "হাতে মাথা কাটিবার" সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের এ গুরু-মারা বিদ্যা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। ইঁহাদিগকে এক ক্ষুরে বাঙ্গালার গ্রন্থকার-দের মাথা মুড়াইতে দেখিয়া বিখ্যাত ইংরেজ লেখক মিঃ জর্জ্জ বার্ণার্ড শ-এর কথা মনে পড়িতেছে। যুদ্ধ বাধিলে শত্রু নিক্ষিপ্ত বিষবাষ্প হইতে আত্মরক্ষার জন্ত বিলাতের সকল লোককে মুখোস পরিতে হইবে; কিন্তু দাড়ি থাকিলে মুখোস ব্যবহার অসুবিধাজনক বলিয়া সকলকে দাড়ি কামাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। মিঃ শ বিষবাষ্পে বিপন্ন হইতে সম্মত, কিন্তু দাড়ি কামাইতে সম্মত নহেন। তিনি বলিয়াছেন, "কখন দাড়ি কামাই নাই। আর নূতন করিয়া উহা আরম্ভ করিতে পারিব না।" আমরাও বলি বিশ্বপণ্ডিতদের এই নূতন অত্যাচারে আমরা আর বুড়া বয়সে নূতন করিয়া কতকগুলা অশুদ্ধ বানান মুখস্থ করিতে পারিব না; তবে যাহারা দুই পয়সা উপার্জ্জনের লোভে তাঁহাদের হুকুম মানিবে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

আজাদ

(২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৪)

বাংলা বানানের নিয়ম

গত পূর্ব্ব নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সঙ্কলনের জন্ত একটা কমিটি গঠন করেন। কমিটির সিদ্ধান্তগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে "বাংলা বানানের নিয়ম" নামক একখানা পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। তাঁহাদের নির্দ্দেশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনজুরী লাভের জন্ত ঐ নিয়মগুলির অনুসরণ পাঠ্যপুস্তক লেখক ও প্রকাশকদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইবে।

আমরা যতদূর জানি, বাংলার অধিকাংশ সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র ঐ নিয়মগুলির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারেন নাই ; অনেকে প্রকাশ্যভাবে উহার প্রতিবাদও করিয়াছেন। এক দল বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মতে উহা সংস্কারের নামে একটা নূতন বিকারের সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কমিটি আরবী ও পার্সী শব্দগুলির বানান সম্বন্ধে যে সব অনাচারমূলক নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহার সমর্থন করিতে পারেন না। আমরা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম যে, আমাদের শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর বাংলার টেক্‌স্‌ট-বুক কমিটিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সব নিয়ম "যথাসম্ভব" পালন করিয়া চলিতে হইবে।

এই বিষয়টার প্রতি আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আশু মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে প্রচারিত "বাংলা বানানের নিয়ম" একটি কমিটির সিদ্ধান্ত মাত্র, ঐ সিদ্ধান্তগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা সিণ্ডিকেট কর্তৃক এযাবৎ গৃহীত হয় নাই। এই সংবাদটী প্রকৃত না হইলেও, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করিলে জানিতে পারিবেন যে বাংলার অধিকাংশ সাহিত্য ও ব্যাকরণবিশারদ পণ্ডিত ঐসব নিয়মের ঘোর বিরোধী। আরবী পার্সী শব্দ সম্বন্ধে কমিটির সদস্যগণের বিজ্ঞতা যে কিরূপ হাস্যজনক, মাননীয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের "চলন্তিকা"-ই তাহার অন্যতম প্রমাণ। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, সাধারণতঃ আরবী শব্দগুলিকে পার্সী ও পার্সী শব্দগুলিকে আরবী বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই এই পুস্তকের একটা অন্যতম বিশেষত্ব। এমন কি, "চাবুক" ও "বকরী"-র ন্যায় শব্দগুলিকে বেদুইনের জবীলে পুরিয়া দিতেও গ্রন্থকার কোন দ্বিধা করেন নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব হইতে মুক্ত করাই এই সব নূতন নিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত নিয়ম-পুস্তিকাখানি সরাসরিভাবে পড়িয়া দেখিলে জানা যাইবে যে প্রকৃত অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নূতন নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধনকে পূর্ব্বের অপেক্ষা দুঃসাধ্য আকারে কঠিন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মত অনেক লোক সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ না হইয়াও বাংলা ভাষার সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বাংলার বিশুদ্ধ বানান শিক্ষা করিয়াছেন প্রধানতঃ প্রচলিত বানান-পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম চালাইতে চাহিতেছেন, তাহার অধিকাংশ-স্থলেই কোন শব্দ লিখিতে যাওয়ার সময় লেখককে কলম তুলিয়া ভাবিয়া লইতে হইবে—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে। "কর্ত্তা"-য় দ্বিত্ব হইবে না, হইবে "কার্ত্তিক"-এর বেলায়—সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি অনুসারে। কাজেই সংস্কৃত না-জানা লোকদিগের পক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব নির্দ্দেশ অনুসারে শুদ্ধ বাংলা লেখা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। শুধু ইহাই নহে, বাংলা বানানের শুদ্ধাশুদ্ধতা সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হইতে হইলে পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালীকে পূর্ব্ব হইতে কতকটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে।

হিন্দু

(২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৪)

"মাসিক বসুমতী"-তে বাণান-সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাণান-সংস্কার সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট মত আছে

তাঁহারা পত্রগুলি পাঠ করিবেন আশা করি। আমরা শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের যুক্তিগুলি সমর্থন করি, রবীন্দ্রনাথের কোন মূল্যবান্ যুক্তি নাই। যুক্তিতর্ক যাহাতে না উঠে, এজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদিগকেই "অথরিটি" মান্য করিয়াছেন এবং অপরাপর সকলকে মান্য করিতে বলিয়াছেন—মান্য করা সম্ভব হউক আর না-ই হউক। এবিষয়ে তিনি কেমাল পাশার আবির্ভাব কামনা করেন; কালাপাহাড়কে নহে বোধ হয় এই জন্য যে, কালাপাহাড় আদিতে ছিলেন হিন্দু। আমাদের উহা পাঠ করিয়া ধারণা হইল যে বাণান-সংস্কারের চেষ্টার পশ্চাতে আছে একটা ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র; রবীন্দ্রনাথ তাহার এক এবং অদ্বিতীয় নায়ক।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	৪০	পঙ্‌ক্তি	১২	রখিয়াছি	স্থলে	রাখিয়াছি	হইবে।
পৃঃ	৭৪	,,	১৭	মাতৃস্বসা	,,	মাতৃষসা	,, ।
পৃঃ	৭৪	,,	১৭	পিতৃস্বসা	,,	পিতৃষসা	,, ।
পৃঃ	১৩৪	,,	১	টুণ্টিরাজ	,,	ঢুণ্টিরাজ	,, ।
পৃঃ	১৫৭	,,	১৬	তুমি কি সুন্দর?	,,	তুমি কী সুন্দর!	,, ।
পৃঃ	১৭৮	,,	২	মহাশয়ের পত্র	,,	পত্র	,, ।
পৃঃ	১৮২	,,	৪	১৯২৭	,,	১৯৩৭	, ।
পৃঃ	১৯১	,,	৪	২৩।৯।৩৬	,,	২৩।৯।৩৭	,, ।
পৃঃ	২৮৫	,,	২২	Chanceller	,,	Chancellor	,, ।

গ্রন্থকার প্রণীত

হিন্দু কোন্ পথে?

হিন্দুদিগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও শিক্ষাসমস্যার
সুনিপুণ বিশ্লেষণ

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র

সতের বৎসর পরে

গান্ধী-আন্দোলনের সূচনা হইতে কংগ্রেস-কর্তৃক মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ পর্য্যন্ত
সতের বৎসরের বিচিত্র কার্য্যাবলী

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

কয়েকটি অভিমত

মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত :

গান্ধী-আন্দোলনের এমন সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও নির্ভীক সমালোচনা আর পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা :

গ্রন্থকার চিন্তাশীল সুপণ্ডিত। তাঁহার নিজের মত তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যক্ত করিয়াছেন। এমন লেখা পড়িলেও মন সজাগ হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে হিন্দুরা আধুনিক যুগে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিতে লেখক তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আম্মিলনী :

প্রবন্ধগুলি বেশ সুচিন্তিত ও সুলিখিত। ভূদেব বাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ" স্বভাবতঃই মনে জাগে। গ্রন্থকার গভীর পাণ্ডিত্য ও নিপুণ বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহার মত স্থাপন এবং নির্ভীকভাবে অপরের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গড্ডলিকাপ্রবাহে হাত পা ছাড়িয়া দেন নাই। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও ওজস্বী। স্থানে স্থানে অন্তর্নিহিত শ্লেষ ভাষাকে আরও উপভোগ্য করিয়াছে।

তরুণিমা

"আধুনিকতা"-প্রমত্ত "প্রগতি"-যুগের বাঙ্গালার "তরুণ" সমাজের নিখুঁত চিত্র
—আর্টে সাহিত্যে, শিক্ষায় দীক্ষায়, বসনে ভূষণে, আচারে ব্যবহারে—
এবং তৎসহ
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার গৌরবময় আলেখ্য

প্রবন্ধগুলি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরস; নক্সাগুলি হাস্যরসে ভরপুর অথচ শিক্ষাপ্রদ

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র